



২০০১ সালে সাহিত্যে
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক
ভি. এস. নইপাল

১৯৭১ সালে বুকার পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

অনুবাদ চুনিলাল মুখোপাধ্যায়



BanglaBook.org



ইন আ ফ্রি স্টেট উপন্যাসটি বাস্তবচ্যুত মানুষদের নিয়ে লেখা। ভারত থেকে ওয়াশিংটনে আসা এক পরিচারকের জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে পুস্তকের প্রথম পর্বে। দ্বিতীয় পর্বের পটভূমি লন্ডন শহরে। হত্যার অপরাধে পশ্চিম ভারতীয় এক এশিয়ান কারারুদ্ধ হয় লন্ডন শহরে। এরপর আলোর বৃত্তে চলে আসে আফ্রিকার একটি দেশ—সেটি হতে পারে উগান্ডা, হতে পারে রোয়ান্ডা। তৃতীয় পর্বের প্রধান দুটি চরিত্রই ইংরেজ। কিছুকাল আগের থেকে তারা আফ্রিকার স্বাধীনতা লাভের ঘটনাসমূহের সাক্ষী কিন্তু বর্তমানে যেভাবে ঘটনা মোড় নিচ্ছে তাতে তারা বেশ উদ্ভিগ্ন। আদিবাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়েছে তাতে তারা নিজেদের আর নিরাপদ না ভাবতে পেরে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে। হানাহানির বাতাবরণে তাদের জীবন বিপন্ন। উপন্যাসের মধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এক কথায় তা অতৃপ্ত এবং মানব চরিত্রগুলিকে এত বুদ্ধিদীপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা সমকালীন সাহিত্যে বিরল। ডেনিস পটার-এর ভাষায় : জটিলতাকে সহজ ভাষায় এবং গভীর মানবিক কুশলী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা পাঠককে মুগ্ধ করবে।

এই উপন্যাসটি ভি. এস. নইপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি এবং এটি ১৯৭১ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করে।

টলস্টয়ের মতো শক্তিদর... তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে এত উজ্জ্বল
সাহিত্য-শিল্পী আর জন্মাননি।

—জন আপডাইক

নইপাল ইংরেজি গদ্যে সুপণ্ডিত।

—জে. এম. কোয়েটজী, নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস

ভি. এস. নইপাল একজন কমিক লেখক হিসেবে যথেষ্ট দাবী করতে
পারেন... এই ব্যঙ্গরস, সারা বইয়ে অত্যন্ত স্টাইলিশ নিঃশব্দতায়
ছড়িয়ে আছে— এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

—কিংস্লে অ্যামিস, দ্য স্পেকটেটর

মি. নইপাল একজন শিল্পীর চোখ আর কাজ নিয়ে ভ্রমণ করেন এবং
তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো তীক্ষ্ণ অস্বস্তিকর।

জীবিত এমন কোনো লেখক নেই, যিনি কেবলমাত্র মেধার প্রাচুর্যে ভি.
এস. নইপাল-কে অতিক্রম করতে পারেন। তিনি একজন বিশ্বমানের
লেখক, ভাষা এবং বোধে নিপুণ।

—দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বুক রিভিউ

ভি. এস. নইপালের গল্পগুলি আমাদের নিজেদেরকেই এবং যে বাস্তবে
আমরা বাস করি, তাকেই দেখায়। তাঁর ভাষার ব্যবহার যেমন নিখুঁত।
তেমনি সুন্দর।

—দ্য লন্ডন টাইমস্



১৭ আগস্ট ১৯৩২ সালে ত্রিনিদাদে জন্মগ্রহণ করেন ভি. এস. নইপাল। আ হাউস ফর মি. বিশ্বাস, আ বেড ইন দ্য রিভার এবং ইন আ ফ্রি স্টেটসহ চৌদ্দটি উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে- অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস এবং ইন্ডিয়া আ উনডেড সিভিলাইজেশান। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০১ সালে ভি. এস. নইপাল নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

অনুবাদক চুনিলাল মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের বেশ কিছু সেরা গল্প ও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক রচনা পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরার নানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্য, আইন ও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও পশ্চিম বাংলায় সুনাম অর্জন করেছেন।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

In A Free State

V S. Naipaul

২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

ভি. এস. নইপাল

১৯৭১ সালে বুকার পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

অনুবাদ : চুনিলাল মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



ISBN-984-70209-0079-5

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

মূল : ডি. এস. নইপাল

অনুবাদ চুনিলাল মুখোপাধ্যায়

In A Free State by V. S. Naipaul

Copyright © V. S. Naipaul 1971

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১১

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে

লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

E-mail sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭

চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মাল্লান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ

বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা

সম্প্রচার করা যাবে না।

৩০০.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম শ্রী সৌরীন নাগ-কে

সূচিপত্র

উপসংহারের আগে, একটি সাময়িক পত্রিকা থেকে: পিরিয়াসে এক ভবঘুরে ১১

অনেকের মধ্যে এক ২৩

বল, কাকে হত্যা করতে হবে? ৫৭

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ৯৫

উপসংহার, একটি সাময়িক পত্রিকা থেকে : লাক্সর-এ সার্কাস ২৩১

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

উপসংহারের আগে, একটি সাময়িক পত্রিকা থেকে

পিরিয়াসে এক ভবঘুরে

পিরিয়াস থেকে আলেকজান্দ্রিয়া তো মাত্র দু-দিনের রাস্তা। কিন্তু গ্রীস দেশের যে জাহাজটা যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে সেটার ওপর চোখ পড়তেই আমার মনটা একেবারে দমে গেল। জেটি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল জাহাজটা একেবারে যাত্রীতে ঠাসা হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন উদাস্তরা সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে যত শীঘ্র সম্ভব দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। জাহাজের ভেতর পা রাখার পরই বুঝতে পারলাম সকলের জন্য আরাম করে যাবার মতো ব্যবস্থা জাহাজে নেই।

ডেক বলতে যা বোঝায় জাহাজে তা ছিল না। মাসটা জানুয়ারি হলেও জাহাজের পানশালার দুটো দিক একেবারে খোলা, জনা তিনেক লোক ঐ পানশালার সামনে দাঁড়ালেই মনে হবে যেন একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীস দেশের লোকটা কাউন্টারে যে কফি বিক্রি করছিল তা অতি জেঘন্য এবং তার ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত কর্কশ। ইতালি থেকে আসা এক স্নাতকের যাত্রীরা ছোট ঘরটার প্রায় সব কটা চেয়ার দখল করে নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল উনিশ কুড়ি বছরের কয়েকজন আমেরিকান ছাত্র। স্কুল পড়ুয়া, তারা বিনয়ী হলেও চালচলনে খুব সপ্রতিভ। পানশালা ছাড়া আর যে ঘরটা সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখা ছিল সেটা হল পাশের ঘর। সেখানে প্রথমবার ভোজনের ব্যবস্থা যারা করছিল তারা ঐ পানশালার লোকটার মতো বদ-মেজাজী। এতদিন গ্রীক সৌজন্যের কথা শুনে এসেছিলাম। এখন মনে হল ওটা তীরভূমিতেই থেকে গিয়েছে। যারা কুঁড়ে, বেকার কিংবা গ্রামের হতাশাগ্রস্ত তারাই বুঝি সৌজন্যবোধ আঁকড়ে ধরে আছে।

আমরা যারা জাহাজের ওপরের তলার যাত্রী তারা অনেকটা ভাগ্যবান। কেবিন ও বাস্ক দুটোই ছিল আমাদের দখলে। নিচুতলার যাত্রীদের তা ছিল না। তারা ছিল ডেকের যাত্রী। তাদের যা প্রয়োজন ছিল তা হল দিনের বেলায় এবং রাতের বেলায় শুয়ে থাকবার জন্য একটা মাত্র ঘর। আমাদের নিচুতলার লোকেরা খোলা আকাশের তলায় বসেছিল কিংবা রোদ পোয়াচ্ছিল। ভূমধ্যসাগরের কালো জলের ওপর বয়ে যাওয়া বাতাসের প্রাবল্য থেকে বাঁচার

জন্য তারা জাহাজের মাস্তুল ঘোরানোর হাতল এবং কমলা রংয়ের জলরোধক বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

এই লোকগুলি ছিল ইজিপ্শিয়ান গ্রীক। ইজিপ্ট ছিল তাদের গন্তব্যস্থল। ঐ দেশে জন্ম হলেও এখন তারা ওখানে বাস করে না। তারা ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু। যারা বিজয়ী তারাও এখন ইজিপ্ট ছেড়ে গিয়েছে। অনেক অবমাননার পর দেশটাও এখন স্বাধীন হয়েছে। তবে সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন দরিদ্র গ্রীকদেরই মূল্য দিতে হয়েছে। আমাদের জাহাজটা যেমন, তেমনি সব নোংরা জাহাজে করে ঐ গরীব গ্রীকদের ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখন আমাদের পর্যটকদের দলে যেমন লেবাননের ব্যবসায়ী আছে, স্পেনের নাইট ক্লাবে নাচ করা লোক আছে, জার্মানি প্রত্যাগত স্থলদেহী ইজিপ্টের ছাত্ররা আছে, তেমনি ঐ দরিদ্র গ্রীকরাও আছে।

ঐ ভবঘুরে লোকটা যখন জেটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে দেখে কে বলবে সে ইংরেজ নয়? আসল ব্যাপারটা হল, ঐ সময় জাহাজে সত্যিকারের ইংরেজ কেউ ছিল না, তাই তুলনা করা যাচ্ছিল না। লোকটা যে একটা ভবঘুরে সেটাও প্রথমে ঠাহর করা যাচ্ছিল না। তার টুপি, পিঠে বাঁধা ব্যাগ, মোটা কাপড়ের জ্যাকেট, ধূসর রংয়ের পোশাক, এমনকি তার জুতাতে পর্যন্ত পুরোনো দিনের একটা রোমান্টিকতার ছোঁয়া ছিল। ধরে নেওয়া যায়, তার পিঠের ব্যাগে নিশ্চয়ই একটা কবিতার বই, একটা সাময়িক পত্রিকা এবং একটা উপন্যাসের প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদ আছে।

ভবঘুরে লোকটা ছিল মাঝারি উচ্চতার এবং ছিপছিপে গড়নের। লোকটা ছোট ছোট পা ফেললে কী হয়, মনে হচ্ছিল যেন পায়ে শিপ্রং লাগানো আছে। তার হাঁটার মধ্যে একটা হন্দ ছিল। লোকটা একটু কাছাকাছি এলে দেখতে পেলাম তার কাপড়-জামার অবস্থা খুব করুণ, ছিঁড়ে এসেছে বললেই ভালো হয়, টাইটা বিবর্ণ। এসব দেখে তাকে ভবঘুরে ছাড়া আর কী বলা যায়? জাহাজের সিঁড়ির মুখে এসে সে যখন মাথার টুপিটা খুলে ফেলল তখন দেখা গেল লোকটা একটা বৃদ্ধ এবং তার মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে এবং নীল চোখ দুটি শুষ্ক।

এক সময় সে মুখ তুলে তাকিয়ে আমাদের অর্থাৎ তার দর্শকদের দেখল। জাহাজে উঠবার সময় পাশের দড়িতে হাত না রেখে তড়তড় করে উঠে এল। এ কি গর্ব? তারপর টিকিট পরীক্ষকের দিকেও ভালো করে না তাকিয়ে টিকিটখানা দেখিয়ে গটগট করে এমন সাবলীল ভঙ্গিতে জাহাজের ভেতর চলে এল যেন সব কিছুই তার বহু পরিচিত। তারপর একটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বোঁ করে একপাক ঘুরে গিয়ে অন্য পা-টা দুম করে মেঝেতে মারল। যে লোকগুলো ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি পার্সারের সাথে একবার কথা বলতে চাই।' তারা উত্তর দেবার আগেই সে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে আমেরিকান পড়ুয়ারা তীরে নেমে গিয়েছে বলে আমাদের জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব হতে লাগল। এই অবস্থায় গ্রীকগুলোর উত্তমা ও বিরক্তি যেন ফেটে পড়তে লাগল। খানিক পর, ছাত্র-ছাত্রীর দল যখন খাবার-দাবার কিনে ফিরে এল তখন জাহাজের থমথমে

পরিস্থিতি দেখে তাদের মুখ শুকনো হয়ে গেল। দলে অতগুলো মেয়ে থাকলেও খিলখিল হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না মোটেই। একটু পরেই জাহাজটা নড়ে উঠল। এক বিশাল জলরাশি তীরভূমি আর আমাদের জাহাজ লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করল।

এই সময় ভবঘুরেকে আবার দেখা গেল। এখন তার মাথায় টুপি কিংবা পিঠে ব্যাগ নেই এবং তাকে দেখে আগের মতো অতটা উদ্ভিগ্ন মনে হচ্ছিল না। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা দুটো এমনভাবে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল যেন একজন বহু অভিজ্ঞ সমুদ্রযাত্রী। সে অন্য যাত্রীদের খুব ভালোভাবে নিরীক্ষণ করছিল। মনে হচ্ছিল কথা বলার জন্য সে একজন সঙ্গী খুঁজছে। কিন্তু অন্যরা যেই না তার দিকে তাকাচ্ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

শেষটায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে বুঝতে পারল ঐ লম্বা ছোকরাটার সঙ্গেই তার জমবে ভালো। যুগোস্লাভিয়া থেকে আসা লম্বা ছেলেটাকে দেখে মনে হবে সে ইতিপূর্বে কোনো দিন দেশের বাইরে পা রাখেনি। ভবঘুরের উচ্চারণ ভঙ্গি এমনই ছিল যে ছোকরার বুঝতে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। তবুও এটা বলতে হবে সে একজন ভালো শ্রোতা এবং ভবঘুরের কথায় সে মাঝে মাঝেই এমনভাবে হেসে সম্মতি জানাচ্ছিল যে ভবঘুরের কথা বলার নেশা আরো বেড়েই যাচ্ছিল।

ভবঘুরে বলছিল, ইজিস্ট তো আমি কম করে ছয় সাতবার এসেছি। বলতে পারো, সারা পৃথিবীটাই আমি বারো বার ঘুরেছি। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা কোনোটাই বাদ নেই। আমি প্রথম যে বার কানাডা যাই সেটা ছিল ১৯২৩ সালে। খুব কমপক্ষে বার আষ্টেক গিয়েছি। প্রায় আটত্রিশ বছর ধরে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এখন খুব আরামের কাজে যুক্ত। কাজটা খারাপ কিছু নয়। আচ্ছা, তুমি নিউজিল্যান্ড গিয়েছ কখনও? ১৯৩৪ সালে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। একটা কথা বলি, এটা পাঁচ কান করো না, নিউজিল্যান্ডের লোকেরা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার লোকেদের চেয়ে এক ধাপ ওপরে। অবশ্য আজকাল জাতীয়তাবাদ বলে কি আর কিছু আছে? এই আমার কথাই ধর না— সত্যি কথা বলতে কী, আমি কোনো বিশেষ দেশের নাগরিক নই, বলা চলে আমি পৃথিবীর একজন নাগরিক।

ভবঘুরের কথা বলার ভঙ্গিটাই এই রকম— প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তারিখ, স্থান ও সংখ্যার প্রাচুর্য। অন্যের জীবন থেকে এক একটা সাধারণ মতাদর্শ তুলে নেওয়া। তার কথা বলা যতই মনোমুগ্ধকর হোক কথার বিষয়বস্তু ছিল একেবারে যান্ত্রিক।

ভবঘুরের কথায় ওপাশে বসে থাকা যুগোস্লাভিয়ার লোকটা মাঝে মাঝে হাসছিল এবং নানারকম বিস্ময়সূচক মন্তব্য করছিল। অবশ্য ভবঘুরে তার দিকে না ফেরাচ্ছিল চোখ, না দিচ্ছিল তার কথায় কান। আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন হয় ভবঘুরের তা মোটেই ছিল না। অবশ্য এটা বলা যায়, প্রকৃত অর্থে সে কারো সাথে আলাপ করতেই চাইছিল না, তার কথা শুনবার জন্য শ্রোতার প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করছিল না। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রচেষ্টায়

সে এমন এক কৌশল রপ্ত করেছে যাতে নিজেই নিজেকে সব কিছু খুব দ্রুত ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে। নিজের জীবনটাকে সে কয়েকটা নাম ও সংখ্যায় সীমিত করতে পেরেছিল। নাম আর সংখ্যাগুলো বলা শেষ হওয়া মানে তার কথারও সমাপ্তি হওয়া। তারপরই তাকে ঐ যুগোস্লাভিয়ার বাসিন্দার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। যেই না জেটি আমাদের চোখের বাইরে গেল অমনি বন্ধুর সঙ্গেও তার সম্পর্কের ইতি হয়ে গেল। আসল কথা, তার কোনো বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না, ছিল বন্ধুত্বের একটা আবরণের প্রয়োজন। একটা আড়াল চাইছিল সে, নিজেও জানত সে খাপছাড়া একটা লোক।

মধ্যাহ্নভোজের সময় আমি দুজন লেবাননের বাসিন্দার সাথে গল্প করছিলাম। তারা ছিল এক রাতের যাত্রী। প্রথম আলাপেই তারা বলেছিল, অর্থীভাবের জন্য নয়, কেবল মালপত্রের প্রাচুর্যের জন্যই তারা বিমানে না গিয়ে জাহাজে চলেছে। মুখে তারা জাহাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা অনুযোগ করলেও তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তারা বেশ আনন্দেই জাহাজে ভ্রমণ করছে। তাদের কথার মধ্যে যে তিনটে ভাষার মিশ্রণ ছিল, তা হল ইংরেজি, ফরাসী, আরবি। অন্যেরা, বিশেষত লেবাননের লোকেরা যে নানা কৌশলে অর্থোপার্জন করে সেটাই ছিল তাদের আলোচনার বিষয়। তাদের দুজনেরই বয়স ছিল চল্লিশের নিচে। একজনের চেহারা ছিল গোলগাল, আটপৌরে পোশাক। বৈরুতে ছিল তার টাকা নেমদেনের ব্যবসা। অন্যজনের গায়ের রং কালো, চেহারাটা পেটানো। তার গায়ের ও চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের। তার পরনে ছিল একটা তিন-পিসের চেক সুট। কায়রোয় তার আসবাবপত্রের দোকান আছে। কথা প্রসঙ্গে লোকটা বলল ইউরোপীয়ানরা সেখান থেকে চলে যাবার পর তার ব্যবসা বেশ মার খেয়ে গিয়েছে। ইজিপ্টে এখন না আছে ব্যবসা-বাণিজ্য, না কৃষ্টি-কলা। ইজিপ্টের লোকেদের কাছে আসবাবপত্রের কোনো মূল্যই নেই, যেন ওগুলো ছাড়াই দিব্যি চলে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল, ওরা লেবাননের বাসিন্দাদের একেবারে দেখতে পারে না। তার কথার মধ্যে যে খুব একটা দুঃখবোধ ছিল তা মনে হল না। লোকটা কথা বলতে বলতেই একজন স্প্যানিশ নর্তকীর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ মটকে দিল।

ঐ ঘরের অপর প্রান্তে বসেছিল মোটাসোটা ইজিপ্টের এক ছাত্র। তার চোখে মোটা কাঁচের চশমা, জার্মান ও আরবি ভাষায় সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। ঐ টেবিলে যে জার্মান দম্পতি বসেছিল তারা ছাত্রটির কথা শুনে কেবল হাসছিল। খানিক পরে ছাত্রটি আরবি ভাষায় একটা গান শুরু করল।

বৈরুত থেকে আসা লোকটা আমেরিকান উচ্চারণের ভঙ্গিতে বলল, ‘তোমার আরো একটু আধুনিক হওয়া দরকার।’ তার কথা শুনে আসবাব-ব্যবসায়ী প্রতিবাদ করে বলল, ‘কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমাকে আগে ইজিপ্ট

ছাড়তে হবে, ওখানে কারখানাটা বন্ধ করতে হবে। আধুনিক কায়দা হল একটা বিভীষিকা।' সে যেন আরো কিছু বলত কিন্তু তা না করে গানের জন্য চিৎকার করে গায়ককে আরবি ভাষায় অভিনন্দন জানাল। কোনো রকম বিদ্বেষ ছাড়াই সে মন্তব্য করল, 'আঃ দারুণ এই আদি বাসিন্দাগুলো'— কথাটা বলে সামনে থেকে পুটটা সরিয়ে দিয়ে চেয়ারে আধশোয়া হয়ে নোংরা টেবিলরুখে ঢাকা টেবিলটা তবলার মতো বাজাতে লাগল। এবারেও সে নতকীর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল, তার গৌফটা মনে হল একটু ওপরের দিকে নেচে উঠল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টেবিল সাফ করল। খালি পুটগুলো তো নিয়েই গেল, এমনকি, আমার যে খাওয়া সমাপ্ত হয়নি বেয়ারার যেন তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

ব্যাপারখানা আসবাব-ব্যবসায়ী দেখে গলা চড়িয়ে বলল, 'আরে আপনার তো খাওয়াই হয়নি। সবার এত তাড়া থাকলে চলবে কী করে?' কথা বলা শেষ না করেই সে চোখ ঘুরিয়ে আমাদের যেন কিছু একটা দেখাতে চাইল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম ভবঘুরেটা আবার হাজির হয়েছে। দরজার মুখে সে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা পর্যবেক্ষণ করছে। এবার এক নজরেই মনে হল সে পুরো পোশাক পরে এসেছে, একটু এগিয়ে এসে আমাদের পাশের টেবিলটা সে দখল করল। চেয়ারে বসার পর মনে হল সে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। একটু এদিক ওদিক নড়াচড়ার পর সে গুছিয়ে বসল। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে হাত দুটো চেয়ারের হাতলে এমনভাবে রাখল যেন এক সর্বময় গৃহকর্তা চেয়ারে বসে বাড়ির সব ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছেন। এও মনে হচ্ছিল যেন প্রমোদ তরনীতে স্নান করা একজন যাত্রী তার খাবারের জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটা স্বাস্থ্য-ফেলল, আর চোয়াল নাড়াল, যেন দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করছে। দেখলাম তার পরনের জ্যাকেটখানার দুরবস্থা, জ্যাকেটের পকেটগুলো উঁচু হয়ে ফুলে আছে, সেফটি-পিন দিয়ে সেগুলোর মুখ আটকানো। আসবাব-ব্যবসায়ী আরবি ভাষায় কী যেন একটা বলতেই বৈরুতের লোকটা হেসে উঠল। এবার বেয়ারাদের সন্ধ্যার আমাদের উঠতে অনুরোধ করলে আমরা স্প্যানিশ মেয়েদের পেছন পেছন স্ট্রিট-বারে গিয়ে ঢুকলাম।

বিকেলের দিকে নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে আমি কেবিনের ওপরের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি তখন আবার ভবঘুরেটাকে দেখতে পেলাম। দাগ-লাগা প্যান্টের পকেটগুলো ফুলে আছে, জামার হাতাগুলোও হেঁড়া, মনে হল তার হাতে একটা প্রার্থনার ছোট বই ধরনের কিছু একটা আছে। তার ঠোঁট নড়ছিল এবং মাঝে মাঝেই সে চোখ খুলছিল ও বন্ধ করছিল। খুব মন দিয়ে সে প্রার্থনা করছিল। তার মুখ দেখে আমার খুব মায়া হল— যেন কত ঝড় বয়ে গেছে ঐ মুখের ওপর দিয়ে, শক্ত করে বাঁধা টাই-এর তলায় সরু গলা, চোখের চারপাশের চামড়া এত নরম, সে বুঝি এখন কান্নায় ভেঙে পড়বে। সে বন্ধুর খোঁজ করছিল বটে, কিন্তু নির্জনতাও চাইছিল। সে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল আবার এও চাইছিল যেন তার প্রতি কেউ নজর না দেয়। তাকে বিরক্ত করাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে

করলাম না। তার সাথে জড়িয়ে পড়তেও আমার ভয় হল। ওদিকে বাস্তবহারা গ্রীকগুলো নিচে তখনও শুয়ে ছিল কিংবা বসে গল্প করছিল।

রাতের খাওয়া শেষ হলে ইজিপ্টের মোটা লোকটা হেঁড়ে গলায় চিৎকার করতে করতে ক্যাবারে নাচ করছিল। যারা তার ভাষা বুঝত তারা তো সর্বক্ষণ হেসেই চলেছিল। এমনকি মিতভাষী আসবাব-ব্যবসায়ী পর্যন্ত মাঝে মাঝেই চিৎকার করছিল আর হাততালি দিচ্ছিল। আমেরিকান স্কুল ছাত্ররা এমনভাবে বিছানায় শুয়েছিল যেন তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। তারাও নিজেদের মধ্যে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করছিল তবে তা একেবারে নিচু গলায়।

ঐ ঘরের অন্য প্রান্তে ছিল আরব ও জার্মান দেশের বেশ কয়েকজন লোক। তারাই আসর জমিয়ে রেখেছিল। ইজিপ্টের লোকটাই মজা করছিল বেশি। একজন লম্বা জার্মান মেয়েও ছিল। হাবেভাবে সে বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমাদের দেখভালের দায়িত্ব যেন তারই। সে সকলকে চকোলেট দিল এবং প্রত্যেকের সাথে কিছু না কিছু কথা বলছিল। আমাকে সে বলল, তুমি তো খুব সুন্দর একটা ইংরেজি বই পড়ছ। পেঙ্গুইনের ইংরেজি বইগুলো বাস্তবিকই ভালো। সে হয়ত তার আরব-স্বামীর কাছে চলেছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান।

দরজার দিকে পিঠ করে বসেছিলাম বলে ভবঘুরেটা কখন ঘরে ঢুকেছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ খেয়াল হলে দেখলাম আমার সামনে খালি চেয়ারটায় সে বসে আছে। ঐ চেয়ারটা জার্মান মেয়ের চেয়ারটা থেকে খুব দূরে ছিল না, অর্থাৎ খুব কাছাকাছিও ছিল না। ঘরের অন্যত্র যে চেয়ারগুলো ছিল সেগুলোর অবস্থানও প্রায় একই রকম ছিল। ভবঘুরেটা চেয়ারে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসল। কয়েক দিকে সে সরাসরি তাকাচ্ছিল না বলে ঐ ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকেও সে তাদের দলের মধ্যে ছিল না। বলা যায়, ঐ ঘরের মধ্যে একটা ছোট স্টেজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সে।

চেয়ারে বেশ পা ফাঁক করে সে বসেছিল। তার প্যান্টের পকেটে একটা ম্যাগাজিন ভরা ছিল বলে সেটা ওরকম ফুলে ছিল। শেষ যখন তাকে দেখেছিলাম সে তখন কিছু একটা পড়ছিল। তখন মনে হয়েছিল ওটা একটা প্রার্থনার বই। এখন দেখলাম ওটা একটা ডায়েরি। সেটা এত পুরোনো যে পাতাগুলো খুলে বেরিয়ে আসছে। পকেট থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে হাটুর নিচে রাখল আর পকেট ডায়েরিটা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সে হাসছিল আবার তাকে কেউ লক্ষ করছে কিনা তাও দেখছিল। আবার একটা পাতা উল্টে সে পড়ল, আরো জোরে হাসল। তারপর জার্মান মেয়েটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি স্প্যানিশ পড়তে পার?'

মেয়েটা স্প্যানিশ পড়তে পারে না জানালে ভবঘুরে বলল, 'স্প্যানিশ জোক-গুলো ভারী মজার' কথাটা বলার পর সে আরো কয়েকটা 'জোক' পড়ল কিন্তু হাসতে পারল না।

ওদিকে ইজিপ্টের লোকটা তখনও নেচে কুঁদে চলেছে। একটু পরেই জার্মান মেয়েটা আবার একটা থালা নিয়ে সবার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল— চকোলেট চলবে নাকি?

মেয়েটা সকলকে দিতে দিতে যখন ভবঘুরের কাছে পৌঁছল তখন তার থালা খালি। তাই না দেখে ভবঘুরের সে কী রাগ! পায়ের নিচ থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে পাতাগুলো এক এক করে ছিঁড়তে লাগল। ইজিপ্টের লোকটা নাচছিল এবং ঘরের মধ্যে যথেষ্ট হৈচৈ থাকলেও পাতা ছেঁড়ার শব্দ কিন্তু সবাই বেশ ভালো মতো শুনতে পাচ্ছিল। ম্যাগাজিনের ছবির পাতাগুলো সে ছিঁড়তে শুরু করল— খেলার ছবি, মেয়েদের ছবি, বিজ্ঞাপনের ছবি কিছুই বাদ গেল না।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ইজিপ্টের লোকটা এবার নাচ থামাল, আমেরিকান স্কুল ছাত্ররা চোখ বড়-বড় করে ভবঘুরের দিকে তাকিয়ে থাকল। এবার বোধ হয় ভবঘুরের একটু হুঁশ ফিরল। ম্যাগাজিনটাকে সে এমন ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরল যেন পাতার ওদিকটা পড়া যাচ্ছে না। তারপর এক সময় সেটাকে পকেটের মধ্যে ভরে এমনভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল যেন তাকে কেউ খুব রাগিয়ে দিয়েছে।

পরের দিন সকালে নাস্তার সময় আসবাব-ব্যবসায়ী ঘোষণা করল, ‘ওকে আমি মেরেই ফেলব’।

তার পরনে ছিল থ্রি পিস্ সুট, গালের দাড়ি খোঁচা-খোঁচা, চোখের নিচে কালসিটের মতো গোল দাগ। বৈরুতের লোকটাও খুব ক্লান্ত, রাতে যে তাদের ভালো ঘুম হয়নি সে কথা তাদের চেহারা ই বলে দিচ্ছে। তাদের কেবিনে তৃতীয় বান্ধে ছিল একটা অস্ট্রিয়ার ছেলে যে ইতালি থেকে আসছিল। ছেলেটার সাথে তাদের দুজনের সুসম্পর্ক ছিল। কেবিনের চতুর্থ বান্ধে কে আছে তা অনেক পরে তারা জেনেছিল। ভবঘুরেটা ছিল সেই চতুর্থ ব্যক্তি।

বৈরুতের লোকটা মন্তব্য করল, ‘জঘন্য। বুড়োটার হাবভাব একটা বাচ্চার মতো।’ তা শুনে আসবাব-ব্যবসায়ী দরজার দিকে হাত তুলে বলল, ‘বাচ্চা? ঐ ইংরেজ গুয়ারটা এখন এলে আমি ওকে খুন করব।’ কথাটা একবার বলে তার বোধহয় তৃপ্তি হল না। সে দ্বিতীয়বার সকলকে শুনিয়ে আবার একই কথা বলল। ইজিপ্টের ছাত্রটি হেঁড়ে গলায় আরবি ভাষায় কিছু মজার কথা বোধহয় বলল কিন্তু তার কথায় আসবাব-ব্যবসায়ী মোটেই হাসল না। আঙুল দিয়ে সে টেবিল বাজিয়ে চলল কিন্তু চোখ রাখল দরজার দিকে। এই সময়টা সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল।

কারোরই মেজাজ ভালো ছিল না। জাহাজের দুলুনিতে প্রতিটি যাত্রীরই পেটের ভেতর একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসেও তাদের বিরক্তি লাগছিল।

খাবার ঘরের বাতাসটা ছিল বন্ধ, রবার পোড়ালে যেমন গন্ধ আসে বাতাসে তাই ছিল। আশেপাশে খুব একটা লোকজন না থাকলেও বেয়ারাগুলো অভ্যাসমত দৌড়াদৌড়ি করছিল।

হঠাৎ ইজিপ্টের লোকটা একটা চিৎকার করল। কী ব্যাপার? না, ভবঘুরেটা আসছে। সে এসে আমাদের পাশের টেবিলে বসল। চা-জলখাবার চাই। চেয়ারে বসে আবার দু-পাটি দাঁত ঘষে নিল। তার জন্য খাবারের থালাও এসে গেল তাড়াতাড়ি। বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল লোকটা।

ওদিকে ইজিপ্টের লোকটা আবার একবার চিৎকার করতেই ব্যবসায়ী বলল, ‘আজ রাতে ওকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেব।’ ওরা যে এত কথা বলছে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই ভবঘুরের। সে যেন কিছুই দেখছে না বা শুনছে না। সে একমনে খাবার চিবিয়ে চলেছে। শুধু কণ্ঠনালীটা উঠছে আর নামছে। মাঝে মাঝে ফুডুং করে শব্দ করে কফি পান করছে, তারপর আঃ বলে, একটা আরামসূচক শব্দ করছে। খরগোসের মতো খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে চলেছিল সে। খাওয়াটা যেন বিরাট এক পরিতৃপ্তির বিষয় তার কাছে।

এক সময় আসবাব ব্যবসায়ী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁক দিল, ‘হ্যানস’। অস্ট্রিয়ার ছেলেটার নাম ছিল হ্যানস। ডাক শুনে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটার বয়স ষোলো কি সতেরো, সুঠাম গড়ন, মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। বৈরুতের লোকটাও উঠে দাঁড়াল। তারপর তারা তিন জনে বাইরে চলে গেল। ভবঘুরেটা ওসব কোনো কিছুই খেয়াল করল না। সে যেমন খাচ্ছিল তেমনই খেয়ে চলল। এক সন্ধ্যা ঢেকুর তুলে খাওয়া শেষ করল।

পরের ঘটনা বাঘ শিকারের মতো। সেখানে ষোড়শ বাইরে রেখে শিকারি ও দর্শকরা সুরক্ষিত উঁচু জায়গায় থাকে। জাহাজে ষোড়শ হিসাবে ব্যবহার করা হল ভবঘুরের ব্যাগটাকে। সেটাকে কেবিনের বাইরে রেখে দেওয়া হল, আসবাব ব্যবসায়ী এমন ভান করল যেন খুব রেগে আছে। ভবঘুরেটার সাথে সে বাক্যালাপ পর্যন্ত করল না, কিন্তু হাসি হাসি মুখে হ্যানস ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং খেলার নিয়মকানুন কী আছে তা ধৈর্য সহকারে বারবার বুঝিয়ে বলতে লাগল।

ভবঘুরে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল না। সকালের জলখাবারের পর সে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্য উঠে গেলেও জাহাজের ডেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। যারা বাইরে আসছিল তারা বেশিক্ষণ ওখানে থাকতে পারছিল না। ব্যবসায়ী এবং বৈরুতের লোকটা ডেকের ওপর আসছিল বটে, কিন্তু একটুখানি থাকবার পর আবার খাবার ঘরের ভেতর চলে যাচ্ছিল। সেখানে জার্মান ও আরব দেশের লোকেরা এবং স্প্যানিশ মেয়েরা মাঝে মধ্যেই তাদের প্রতি সমবেদনা

জানাচ্ছিল। এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও হ্যানস কিন্তু নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। ঠাণ্ডার জন্য সে মাঝে মধ্যে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেও খোলা দরজা দিয়ে সে চোখ রেখেছিল। যারা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে তাদের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসি হাসছিল।

এক সময় খবর এল ভবঘুরেকে দেখা গিয়েছে এবং খেলার নিয়মের প্যাঁচে তাকে আটকানো গিয়েছে। আমেরিকান স্কুল ছাত্রের দল, স্প্যানিশ মেয়েদের দল এবং জার্মান মেয়েটিও সেই সময় ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্র নিরীক্ষণ করছিল। এই সময় হ্যানস কেবিনের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থাকল। তার ব্যাগটা বাইরে রাখা আছে দেখে যেই না সেটা তুলে নেবে বলে ফিতেটা স্পর্শ করেছে অমনি হ্যানস কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যবসায়ী তার ডান হাত তুলে ফরাসী ও আরবি ভাষায় চিৎকার করছিল, ওদিকে ভবঘুরে ইংরেজিতে তার অভিযোগ জানাচ্ছিল।

খাবার ঘরে ব্যবসায়ীর রাগটা আমার একটু নাটুকে মনে হয়েছিল, ভেবেছিলাম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোকেরা মোটা গৌঁফ রাখে, ওসব খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গায় একজন শান্তশিষ্ট শিকার পেয়ে তার তেজ দেখে কে! সে চিৎকার করে বলল, ‘শুয়োর, শুয়োর কোথাকার’। ভবঘুরে উপস্থিত দর্শকদের কাছে নিবেদন করল, ‘ও যা বলছে তা ঠিক নয়’। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ব্যবসায়ী পুনরায় বলল, ‘শুয়োর, নোংরা শুয়োর।’

চরম মুহূর্ত এল এবার। সুঠাম চেহারার ব্যবসায়ী ভবঘুরের মাথায় এক ঘা বসানোর জন্য বাঁ হাতটা তুলতেই ভবঘুরেটা লাটুর মতো পাক খেয়ে সরে গেল। কিন্তু তারপরই সে কাঁদতে শুরু করল। ওদিকে ব্যবসায়ীটা টান সামলাতে না পেরে রেলিংটা ধরে ফেলল। পকেট থেকে পেন ও মানিব্যাগটা হাতে না পড়ে যায় সেজন্য দু-হাত দিয়ে বুকের পকেটগুলো চেপে ধরে খানিকটা বিষাদ মেশানো, খানিকটা অনুযোগ মেশানো গলায় ‘হ্যানস হ্যানস’ বলে চিৎকার করতে লাগল।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভবঘুরেটা কেমন যেন মুষড়ে পড়ছিল, তার নীল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। তবে সে এখন আর কাঁদছিল না। ওদিকে হ্যানস দৌড়ে এসে বুড়ো ভবঘুরের গলার মাফলারটা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে লোকটা মেঝেতে পড়ে গেল। লোকটা হয়ত উঠে দাঁড়াতে পারত কিন্তু তা না করে সে কেবল উঠে বসতে পারল। একটা হাত দিয়ে তার ব্যাগের ফিতেটা ধরে রেখেছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে সকলকে শোনাচ্ছিল, ‘ও যা বলছে তা ঠিক নয়’। কিন্তু লোকটার চোখের জল হ্যানসের মনে কোনো দাগই কাটল না। আগের মতোই তার মুখে হাসি লেগে থাকল।

ওদিকে ব্যবসায়ীটা সমানে, ‘হ্যানস, হ্যানস’ বলে চিৎকার করতে থাকলেও ভবঘুরে সেদিকে আর না তাকিয়ে নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। পরের ঘটনা হল, সে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা শৌচাগারে লুকিয়ে থাকল। পরে অবশ্য বার দুয়েক আমাদের সামনে এসে হাজির হল।

এক ঘণ্টা পরে তাকে খাবার ঘরে দেখা গেল। এখন অবশ্য তার কাছে ব্যাগটা ছিল না এবং তার চেহারার মধ্যে যাতনার চিহ্নও ছিল না। তার অতিপরিচিত ভঙ্গিতে ডানদিকে, বাঁদিকে—কোনো দিকেই না তাকিয়ে বেশ সপ্রতিভ চালে সে ঘরের মধ্যে এল। ব্যবসায়ীটা তখন অবসন্ন হয়ে একটা কেদারায় চোখের ওপর হাত রেখে আধশোয়া অবস্থায় ছিল। ভবঘুরেটা একেবারে তার সামনে পড়ে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। একটু পরে ঘৃণা ও ক্রোধ তার চোখে ফুটে উঠল। সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়াতে লাগল।

ভবঘুরেকে দেখে ব্যবসায়ী কম অবাক হয়নি। একটু টান টান হয়ে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে আবার চিৎকার করল, ‘হ্যানস’ বলে। ভবঘুরে যেমন মাথা নাড়াছিল সে তেমনই করতে থাকল। ওদিকে হাতে কয়েকটা তাস নিয়ে হ্যানস তার দিকে এগিয়ে এল। তাকে দেখে ভবঘুরে এতটাই ভীত হল যে এখন মাথার সাথে সাথে তার সারা শরীরটা নড়তে লাগল। এই সময় সে গোড়ালির ওপর ভর করে বাঁই করে একটা চক্কর দিল। প্রবেশ, প্রস্থান, অগ্রসর সবই যেন একটা ছন্দেই সারা হয়ে গেল। ওদিকে আবার ব্যবসায়ীকে চিৎকার করতে শোনা গেল। তার ডাকটা মনে হল কৌতুক করার অভিপ্রায়ে। হ্যানস তার মনোভাব বুঝে হাসতে হাসতে তাস ধরা অবস্থায় নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ভবঘুরে ঐ সময় খেতে বসে গেলে ভালো করত। কিন্তু তা না করে সে আবার শৌচাগারে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। বেলা পড়লে সে যখন খেতে গেল তখন দেখল ঐ তিনজন সেখানে বসে আছে। তাদের দেখে সে মাথা নাড়তে শুরু করলে ব্যবসায়ী চিৎকার করল, ‘হ্যানস’। অগত্যা ওখান থেকে না চলে গিয়ে উপায় কী! দুপুরের খাওয়াটাও তার আর হল না। আরও খানিকপর তাকে নিচের ডেকে দেখা গেল। হাতে তার ব্যাগটি রয়েছে এবং সে বাস্তহ্যারাদের সঙ্গে গল্প করছে। সূর্য অস্ত গেলে সকলে তার কথা বিস্মৃত হল।

রাতে খাবার সময় লেবাননের বাসিন্দা নিরাসক্তভাবে টাকার কথা তুলতেই বৈরুতের লোকটি বলল মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটা অবস্থা চলছে যে ইজিপ্টের তৈরি জুতা ওখানে পাঠালেই টাকা আর টাকা। কিন্তু এই খবরটা খুব একটা বেশি লোকের জানা নেই। আসবাব-ব্যবসায়ী অবশ্য বলল বেশ কয়েক মাস আগেই খবরটা তার কানে এসেছে। এই ব্যবসাতে টাকা ঢালা যায় কিনা তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হল; জ্ঞানে যে কেউ কম যায় না তা প্রমাণ করতে তিনজনেই বিস্তর চেষ্টা চালাল। শেষমেষ দেখা গেল, তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, তারা আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

গত রাতে আমেরিকান ছাত্রদের মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল আজ তা যেন অন্য যাত্রীদেরও সংক্রমণ করেছে। বসার ঘরের আলো কমে এলে আমেরিকান ছাত্রদের

গলার জোর বাড়ছিল। তাদের মধ্যে ব্যস্ততাও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, বিশেষ করে ব্যালে নর্তকীর পোশাক পরা লম্বা মেয়েটির মধ্যে। কালো পোশাকে মেয়েটির আপাদ-মস্তক আবৃত ছিল। গত রাত্রে জার্মান মেয়েটিকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল। ওদিকে স্প্যানিশ মেয়েগুলোর আচরণ আজকে ছিল বেশ সংযত। ইজিপ্টের লোকটি জাহাজ-যাত্রার কারণে একটু অসুস্থ বোধ করলেও তাস খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে কখনও মজার মজার কথা বলছিল আবার কখনও গান গেয়ে উঠছিল। তবে তার কথা শুনে অন্যেরা মুচকি হাসলেও প্রাণ খুলে হাসছিল না। ভালো কিংবা খারাপ তাস খেলা হয়ে গেলে ব্যবসায়ী মাঝে মধ্যে দু-একটা মন্তব্য করছিল তবে সে যেভাবে ‘হ্যানস, হ্যানস’ বলে চিৎকার করেছিল সেই বলার ভঙ্গিটাই সারাদিন অন্যদের কাছে বেশ মুখরোচক হয়ে থাকল।

বৈরুতের বাসিন্দা মাঝে মধ্যে খেলা দেখার জন্য হ্যানসের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল। তারপর ব্যবসায়ীর সাথে ইংরেজিতে যে দু-চারটে কথা বলছিল তা বুঝবার ক্ষমতা অন্যদের ছিল না। এক সময় সে বলল, লোকটা তো এখন কেবিনের ভেতর আছে। অন্যরা না বুঝলেও তার কথার তাৎপর্য হ্যানসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সে ব্যবসায়ীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। ব্যবসায়ী কিন্তু খেলার সময় অন্য কিছু ভাবছিল না। খেলা শেষ হলে বৈরুতের লোকটার সাথে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে ব্যবসায়ী জানাল, ‘লোকটা বলছে কেউ যদি তার কেবিনে ঢুকবার চেষ্টা করে তাহলে সে কেবিনে আগুন লাগিয়ে দেবে’ তার কাছে প্রচুর কাগজপত্র আছে আর আছে কয়েক বাস্তু দেশলাই। মুখে যা বলছে শেষ পর্যন্ত তা আবার করে না বসে।’ এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে বৈরুতের লোকটার দুশ্চিন্তা যেন বেড়ে গেল। রাত্রে ঠিক কোথায় শুয়ে থাকলে আগুনের হাত থেকে সে বাঁচবে এটাই তার চিন্তা হল। শেষে ঠিক হল, সকালে মিলে খাবার ঘরটায় ঘুমোবে। একটু রাত হলে ভবঘুরের কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি দরজার ওপর কান রেখে ভেতরের পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম ভেতরের লোকটাও জেগে আছে এবং কান খাড়া করে বাইরের লোকেদের গতিবিধি, হাঁটা চলার শব্দ টের পাবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে কাগজ ছিঁড়ে ভয় দেখাচ্ছে। সে যেন চাইছে তাকে বিরক্ত করা হোক, তার দরজায় ধাক্কা দেওয়া হোক। হ্যানস যদি জোর করে তার কেবিনে ঢুকতে চেষ্টা করে তা হলে নিজের স্বপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি সে পেয়ে যাবে। কিন্তু তার অপেক্ষা করাই সার হল। কেউ তাকে কিছুই বলল না।

পরের দিন সকালে তাকে আবার বাস্তুহারাদের দলে দেখা গেল। তার মাথায় টুপিটা রয়েছে। কেবিনের মধ্যেই সেটা খুঁজে পেয়েছে সে।

ঐ তো দিগন্তের কাছে আলেকজান্দ্রিয়ার উজ্জ্বল তটরেখা দেখা যাচ্ছে, সারি সারি রূপালি রংয়ের তেলের ট্যাংক ও বালির রেখা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। মাথার

ওপর আকাশটা মেঘে ঢাকা, সবুজ সমুদ্রটা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মধ্যেই আমরা বন্দরে এসে পৌঁছলাম।

একটু পরেই আমাদের নথিপত্র পরীক্ষার জন্য শুদ্ধ ও পাসপোর্ট অফিসের লোকেরা আসছে শুনে আমরা সারি বেঁধে দাঁড়লাম। জার্মানরা আরবদের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র দাঁড়াল। হ্যানস লেবাননের লোকদের থেকে এবং লেবাননের লোকেরা স্প্যানিশ মেয়েগুলোর থেকে খানিকটা তফাতে সরে দাঁড়িয়ে থাকল। নিচ তলার ডেক থেকে বাস্তুহারার দল তাদের বাক্স-পেঁটরা নিয়ে উঠে এল, লোকগুলোর চেহারাই বলে দিচ্ছিল যে তারা নিম্নশ্রেণীর। অফিসারদের কাছে প্রথমে কে কাগজপত্র দেখাতে যাবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল।

মাথায় টুপি, পিঠে ব্যাগ নিয়ে ভবঘুরেকেও দেখা গেল। তার চালচলন আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর, তবে তার চোখের দৃষ্টিতে একটা ভীতির ছোঁয়া লেগে ছিল। সেও এসে লাইনে দাঁড়াল এবং লাইনটা এত দীর্ঘ হওয়ায় একটু অবাক হবার ভান করল। মাঝে মাঝে সে নিজের পা ওঠাচ্ছিল ও নামাচ্ছিল। তা দিয়ে সে যেন বোঝাতে চাইছিল কাগজপত্র পরীক্ষার নামে এত বিলম্বে সে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে অথবা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে বলে একটু নড়াচড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। পিঠে একটা টাউশ ব্যাগ নিয়ে হ্যানস তার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু তাকে যে চেনে তা প্রকাশ করল না। আগুনের আশংকায় খাবার ঘরে রাত কাটানো লেবাননের লোকটা সুন্দর করে দাড়ি কেটে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। হাবভাবে সে বুঝিয়ে দিল ভবঘুরেকে সেও চেনে না। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাতের ঘটনার স্মৃতি ফিকে হয়ে গেল।

BanglaBook.org

অনেকের মধ্যে এক

বর্তমানে আমি একজন আমেরিকার নাগরিক এবং যাকে পৃথিবীর রাজধানী শহর বলা চলে সেই ওয়াশিংটনে থাকি। এখানে কিংবা ভারতের দুই দেশের লোকই আমাকে বলে আমি নাকি যথার্থ কাজই করেছি। কিন্তু।

বোম্বাই শহরে আমি বেশ সুখেই ছিলাম। আমার সামাজিক অবস্থানের জন্যে লোকে আমাকে সম্মান জানাত কারণ আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অধীনে কাজ করতাম। ঐ দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী একবার আমাদের ডেরায় এসেছিলেন এবং আমার তৈরি রান্না খেয়ে ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন। সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির নিচতলায় আমার বন্ধুরা এসে জুটত। আমার বন্ধুটি দর্জির দোকানে কাজ করত। সে আর আমি দুজনেই রাস্তায় থাকতাম বলা যায়। অন্য কয়েকজনের সেখানে আগমন হত তবে কেবল রাত্রিতে শোবার জন্য। আমরা যেহেতু সম্মানীয় লোক ছিলাম তাই অন্যের সাথে লড়াই ঝগড়া একেবারেই হত না।

সন্ধ্যার সময়টা খুব মনোরম বা শীতল হাওয়া বইত। দু-চারজন পথ চলতি লোক আর দু-চারটে দোতলা বাস কিংবা ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তায় অন্য যানবাহন বিশেষ দেখা যেত না। ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে পরে জল ছিটানো হত ফুটপাথে। তারপর দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখা বিছানাপত্র বের করে আনা হত। অন্ধকার কাটানোর জন্য তেলের বাতিও জ্বলানো হত। রাস্তার পাশে যে বাড়িগুলো ছিল সেখানকার ওপরতলা থেকে শ্রমিকজনের কথাবার্তা ভেসে আসত, হাসির আওয়াজ শোনা যেত। আর আধিরা ফুটপাথে বসে সকালের খবরের কাগজ পড়তাম, তাস খেলতাম, গল্প করতাম বা বিড়ি-সিগারেট খেতাম। গাঁজার কলকেটা এক বন্ধুর হাত থেকে অন্য বন্ধুর হাতে চলে যেত। এইভাবে যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ এই সব করতাম। বৃষ্টি বাদলের দিনে আমরা কোনো বাড়ির গাড়ি-বারান্দার তলায় আশ্রয় নিতাম। সেখানে সিঁড়ির পাশের জায়গাটি আমার জন্য একেবারে আলাদা করে রাখা থাকত।

ফাঁকা জায়গায় শোবার একটা ভালো দিক আছে। তা হল, সূর্যোদয়ের আগে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে, ঝাড়ুদার আসবার অনেক আগেই। কাকভোরে কখন রাস্তার আলো নিভে যায় তা দেখার সুযোগও হয়। এরপর চলে বিছানা বেঁধে তুলে রাখার পালা। এ সময়টা পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বিশেষ একটা হয় না।

হাত মুখ ধোবার পর আমার হাতে আধঘণ্টা মতো সময় থাকে পায়চারি করার জন্য। আরব সাগরের তীরে সূর্যোদয় দেখার জন্য আমি একটু অপেক্ষা করি। ঐ সময়টাতে শহর ও সমুদ্রকে সোনার মতো ঝলমলে মনে হয়। মুখের ওপর বাতাসের ঝাপটা, সমুদ্রের আকস্মিক ঔজ্জ্বল্য, পাড়ের দোকানের এক কাপ গরম চা কিংবা একটা সিগারেট— প্রাতঃভ্রমণের এই ভালো লাগাটাই আমার কাছে এখন একটা স্মৃতি।

অদৃষ্টের কী লীলা! আমার নিয়োগকর্তার নামডাকের জন্য আমার পাওনা খানিকটা বেশি হয়ে গিয়েছে। এই গুরুত্বটাই আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

আমার যিনি ওপরওয়ালা তার চাকরিসূত্রে ওয়াশিংটন যাবার প্রয়োজন পড়ল। তার কথা ভেবে আমার আনন্দ হলেও নিজের কথা ভেবে খানিকটা হতাশ হলাম। তিনি তো বেশ কয়েকটা বছর ওদেশে থাকবেন কিন্তু আমি কার কাছে যাব? আমাদের সংস্থা যদি আমাকে বরখাস্ত করে দেয় তো এই বয়সে আমি কী কাজ করে পেট চালাব? বোম্বাই শহরে কে আমাকে চাকরি দেবে? তাহলে তো আমাকে সেই গ্রামেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে আবার কুলির কাজ নিতে হবে। সে কাজও কি আরামের? একটা বাস এলেই পঞ্চাশ-ষাট জন কুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে বাসের কাছে পৌঁছতে হবে। তারপর ‘কুলি চাই, কুলি’ বলে চেষ্টাতে চেষ্টাতে যদি কাউকে পাওয়া যায় তো ভাগ্য। তার ওপর সে হবে একজন ভারতীয় যাত্রী। আমেরিকান যাত্রী হলে আলাদা কথা। তাদের মালপত্র এত ভারী হয় না। ভারতীয় যাত্রী মানেই সাথে লোহার ট্রান্স।

ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই আমার চোখে জল আসত। আমি তো সেই আগের মতো কষ্টসহিষ্ণু নেই আর যুবকও নেই। এখন আমার কিছু পয়সা কড়ি আছে। অন্যদের তুলনায় কিছুটা আরামে থাকি। আমি কি আবার কুলির কাজ করতে পারব? আমার ওপরওয়ালা বলতেন, ‘ওয়াশিংটন আর বোম্বের মধ্যে অনেক ফারাক। ঐ দেশে থাকতে হলে প্রচুর টাকা চাই। যদি কোনো রকমে আমি তোমার যাবার ভাড়ার ব্যবস্থা করতে পারি কিন্তু তুমি কী করে ওখানে থাকবে? তোমার অত টাকা কোথায়, সন্তোষ?’

তাহলে কি বোম্বের পর আবার সেই পাহাড়ি শহর? সেই খালি পায়ের কুলি? কী জ্বালা, কী লজ্জা! ভবিষ্যতের কথা ভেবে বন্ধুদের সাথে দেখা করা কমিয়ে দিলাম, ফুটপাথে শোয়া বন্ধ করলাম, সিঁড়ির ধারে খুপরি ঘরে যতটা সম্ভব সময় কাটাতে শুরু করলাম।

আমার ওপরওয়ালা একদিন আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলে আমি বললাম, ‘সাহেব, নিজের জন্য আমি চিন্তা করি না। আমি শুধু ভাবি, ওয়াশিংটনে আপনি থাকবেন কীভাবে?’

সাহেব বললেন, ‘ওদের দেশে খানসামাকে নিয়ে চলাফেরা করে না কেউ। ওতে ওদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়।’ কয়েকদিন পর তিনি আবার ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে

বললেন, ‘দেখ সন্তোষ, এটা শুধু যে খরচের ব্যাপার তা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন। আগে ভারতীয় টাকার যা দাম ছিল এখন তা নেই।’

আমি উত্তর দিলাম, ‘ওসব ভাবলে তো চলবে না, কাজ মানে কাজ।’

এক পক্ষকাল বাদে আমি যখন আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছি এমন সময় তিনি একদিন বললেন, ‘সন্তোষ, সরকারের অনুমতি পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে ওদেশে যেতে পারবে। তোমার থাকার ব্যবস্থাও সরকার করবে। তবে ভাড়াটা তোমাকে দিতে হবে। খুব শিগ্গিরই তোমার পাসপোর্ট এসে যাবে। তবে কী জান, ওয়াশিংটন আর বোম্বে এক নয়। একথা তোমাকে মনে রাখতে হবে।’

ঐ রাতে বিছানা নিয়ে ফুটপাথে গেলে দর্জির দোকানে কাজ করা লোকটা প্রশ্ন করল, ‘সাদা চামড়ার সাহেবরা কি সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসবে বলে মনে হয় তোমার? নাকি, তোমার সঙ্গে খানাপিনা করবে? তোমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে তারা কি সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াবে ভাবছ?’

আমার ভবিষ্যতকে কেউ হিংসা করতে পারে ভেবে আমার বেশ গর্ব বোধ হতে লাগল। বোম্বের শেষ কয়েকটা দিন বেশ ভালোই কাটল।

আমার ওপরওয়ালার দুটো সুটকেশ গোছানো হল। আমার যা জিনিসপত্র সেগুলোকে লেপের মধ্যে ভরে লেপটাকে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলাম। বিমান বন্দরে তা নিয়ে জল ঘোলা হল বিস্তর। ঐ মোড়া জিনিস অন্য মালপত্রের সঙ্গে নিয়ে যেতে ওরা কিছুতেই রাজি নয়। শেষটায় ওগুলো নিয়ে এরোপ্লেনের মধ্যে বসবার অনুমতি পাওয়া গেল। এরোপ্লেনে ঢোকান মুখে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক যাত্রীকে হেসে হেসে স্বাগত জানাচ্ছিল। আমাকে ঐ-রকম মালপত্র নিয়ে ঢুকতে দেখে মেয়েটার হাসি ঝুটকে গেল। কোনো রকম অভ্যর্থনা না জানিয়েই আমাকে একেবারে পেছনের সিটে গিয়ে বসতে বলল। পেছনের দিকটা খালি ছিল বলে আমারও সুবিধা হল। আমি তো মালপত্র খুলে বেশ আরাম করে বসলাম।

এরোপ্লেনের বাইরে রোদ ঝলমল করছিল এবং বেশ গরম লাগছিল কিন্তু ভেতরটা ছিল ঠাণ্ডা। এক সময় এরোপ্লেনটা ছুটতে শুরু করল। তারপর ওপরে উঠল। বোম্বাই শহর ও সমুদ্র একবার এদিকে, একবার ওদিকে যেন টাল খেতে লাগল। কী মনোরম অভিজ্ঞতা! প্লেনটা যখন বেশ উঁচুতে উঠে একইভাবে চলতে লাগল তখন আমি নিজের চারপাশটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। যাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় আছে, বিদেশী আছে কিন্তু আমার মতো গৃহ-পরিচারক শ্রেণীর কেউ নেই। তাদের সকলের পোশাক দেখে মনে হবে যেন বিয়ে বাড়িতে চলেছে। এদিকে আমার পরনে ছিল একেবারে বোম্বাইমার্কা পোশাক, একটা লম্বা জামা আর

চওড়া কোমরের গ্যালিশি লাগানো প্যান্ট। এ হল একেবারে বাড়ির ভূতের পোশাক। বোম্বাই শহরে এই পোশাকের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না কিন্তু পুনের মধ্যে আমি যখনই দাঁড়াছিলাম অন্যান্য সহযাত্রীরা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিচ্ছিল।

হয়ত আমি খানিকটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। জুতার এমন অবস্থা যে ফিতে না বেঁধেও খুব টাইট হয়ে পায়ে লাগছিল। তাই জুতা খুলে সিটের ওপর পা তুলে বসলাম। এতে অবশ্য আরাম বোধ করলাম। মুখে একটু সুপারি ফেলতে আরো বেশি আরাম লাগল। সুপারি খাওয়ার অর্ধেক মজা হল চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে মুখে জমা রস ফেলতে হবে। সেই রস তো টোক গিলে খাওয়া ভালো নয়। এদিকে সুপারি চিবোতে চিবোতে আমার মুখ যখন জলে ভরে গেছে এমন সময় বিমান-সেবিকা দেখতে পেয়ে আমার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে খুব ধমকাল। তারপর কী বুঝল কে জানে ওপাশে গিয়ে একটা লোককে ডেকে নিয়ে এল। উর্দি পরা লোকটা একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমি পা নামিয়ে জুতা পরলাম। এক সময় হতবুদ্ধি হয়ে মুখের মধ্যে জমে থাকা জল টোক গিলে পেটে চালান করে দিলাম। এতে আমার শারীরিক অস্বস্তি খুব বেড়ে গেল।

ঐ লোকটা আর মেয়েটা বোতল ভর্তি একটা ছোট ট্রলি টানতে টানতে পুনের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেল। যেতে যেতে লোকটা জানতে চাইল আমার বোতলের প্রয়োজন আছে কিনা। লোকটাকে খুব একটা খারাপ মনে হল না। কোন্ বোতলে কী আছে তা ভালো করে না জেনেই আমি একটা বোতলের দিকে নির্দেশ করলাম। ঐ বোতলের মধ্যে ছিল সোডা। খুব ঝাঁজালো হলেও খেতে ভালো ছিল পানীয়টা। তবে ঐ ভালো লাগাটা ছিল শুরুতে কিন্তু পরে তার স্বাদ পালটে গেল যখন মেয়েটা জানাল যে, বোতলের দাম বাবদ আমাকে পাঁচ শিলিং অথবা আমেরিকান মুদ্রায় ষাট সেন্ট দিতে হবে। তার কথা শুনে আমার তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়, আমার পকেটে শিলিং বা সেন্ট কিছুই নেই। ভারতীয় মুদ্রা কয়েকটা পড়ে আছে মাত্র। আমি সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাহেব মানে যার অধীনে কাজ করি তাকে দেখাতে চাইলাম কারণ দাম দিলে তিনিই দেবেন। কিন্তু আমার হাবভাব মেয়েটা বুঝতে না পেরে মেঝেতে সজোরে পা ঠুকে বিরক্তি প্রকাশ করল।

ঠিক এই সময় আমার সাহেবকে আসতে দেখলাম। তিনি শৌচাগারে যাচ্ছেন। হাঁটতে হাঁটতেই তিনি জানতে চাইলেন, ‘কি সন্তোষ, শ্যামপেন চলবে নাকি?’ পরে তিনি যখন আবার নিজের সীটে ফিরে যাচ্ছেন তখন আবার বললেন, ‘বৈদেশিক মুদ্রা, সন্তোষ, বৈদেশিক মুদ্রাই হল সব চেয়ে বড়।’ আমার মনে হল, সাহেবও আমার মতোই দুঃখী।

আকাশ যাত্রা আমার কাছে বেশ কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। মদ, সুপারির রস, বিমানের গর্জন, দুলুনি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে আমার জিনিস পত্রের ওপর আমি হড়হড় করে বমি করে ফেললাম, ঐ বিমান সেবিকা কী ভাববে বা বলবে তা নিয়ে চিন্তা

করার মতো শারীরিক অবস্থা আমার ছিল না। একটু পরে এমন পেট কামড়ানো শুরু হল যে আমি দৌড়ে শৌচাগারে গেলাম। বিমানের পেছনের দিকে ঐ ছোট ঘরটিতে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শৌচাগারের আয়নায় নিজের মুখ দেখে মনে হল এ যেন মড়ার মুখ— চোখ দুটো যেন জোর করে খুলে রেখেছি। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ওখান থেকে বেরিয়ে আমার নিজের সিটে এসে বসলাম। ঐ সময় আমাকে কেউ দেখে ফেলুক তা আমি মোটেই চাইছিলাম না। প্লেনের ভেতর মৃদু আলো জ্বলছিল, যাত্রীরা কোট জ্যাকেট খুলে ঘুমোচ্ছিল। আমি মনে মনে চাইছিলাম, কারোর যেন ঘুম আর না ভাঙে, বিমানটা যেন একেবারে ধবংস হয়ে যায়।

মেয়েটাই আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে ওঠাল। পর মুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, আরে তুমি! মেয়েটা এমনভাবে জামা ধরে টানছিল যেন জামাটাই ছিঁড়ে ফেলবে। আমিও শরীরটাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে রেখেছিলাম এবং জানালার সঙ্গে শক্ত করে মাথাটাকে লাগিয়ে রেখেছিলাম। আমার সঙ্গে দৈহিক শক্তিতে পেরে উঠতে না পেরে মেয়েটার চোখে জল এসে গেল। আমাকে কাবু করার জন্য সে উর্দি-পরা ছেলোটাকে ডেকে আনবে বলে এমনভাবে ছুটতে শুরু করল যে আরেকটু হলেই শাড়িতে পা জড়িয়ে পড়ে যেত।

এ সব হল দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্নের শেষ প্রান্তে রয়েছে ওয়াশিংটন শহর। আমি চাইছিলাম পথ চলা শেষ হোক তাড়াতাড়ি, যদিও ঐ শহরকে আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ শহর সম্বন্ধে আমার আশংকাই ছিল বেশি। আসলে ঐ বিমান যাত্রা আর ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলাম মুক্ত আকাশের তলায়, শক্ত জমির ওপর দাঁড়াতে, বুক ভরে নিশ্বাস নিতে এবং ক'টা বাজে তা বুঝে নিতে।

অবশেষে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। আবার সেই বোঁচকা-বুঁচকির ভার ঘাড়ে নিয়ে চলা। এবারের দৃশ্য: বেশ কয়েকটা বন্ধু ঘর, তবে আলোকিত। টেবিলের ওপাশে বসে থাকা সরকারি অফিসাররা প্রশ্ন করল—

- ও কি দূতবাসের কর্মী?
- না, ও আমার ব্যক্তিগত কর্মী। আমার সাহেব উত্তর দিলেন।
- ওটা কি ওরই জিনিসপত্র? ওর পকেটে ওসব কী আছে?

প্রশ্নটা শুনে আমি যথেষ্ট লজ্জা পেলেও পকেটে রাখা জিনিসগুলো বের করে দেখাতে শুরু করলাম। কী ছিল না পকেটে? গোলমরিচ, নুন, মিষ্টি, হাত মোছার রুমাল, যাত্রাপথে যা কিছু আমাকে খেতে দিয়েছিল বা ব্যবহার করতে দিয়েছিল আমি সে সব জমিয়ে রেখেছিলাম। সাহেব যখন আমার পরিচয় দিলেন তাঁর রাঁধুনি হিসাবে তখন একজন অফিসার পাঁটা প্রশ্ন করল, ও কি বিমান যাত্রাতেও এসব নিয়ে চলাফেরা করে?

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে ওঠার পর সাহেব আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন, 'দেখ সন্তোষ, এভাবে চলাফেরা করলে বোম্বাই-তে কেউ কিছু মনে

করবে না। কিন্তু এদেশে তুমি হলে ভারতের প্রতিনিধি, শুধু তাই নয়, এখানে তুমি হলে আমার লোক।' তাঁর কথায় আমি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলাম।

গাড়িতে উঠে ঠিক বুঝতে পারলাম না এটা বিকেল, না সন্ধ্যার আগের মুহূর্ত। ঘড়ির সময় আর রাস্তার আলোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। বোম্বাইতে অবশ্য এই সমস্যা ছিল না। যাই হোক, যেতে যেতে চোখে পড়ল সবুজ মাঠ, চওড়া রাস্তা, বড় বড় পার্ক, বাজার এলাকা, সামনে বাগান কিন্তু পাঁচিল-বিহীন ছোট ছোট বাড়ি। বাড়িগুলোর সামনে হাবসী পাহারাদাররা হয় বসেছিল, নয় কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। নানা গল্পে আমি হাবসীদের কথা পড়েছিলাম, বোম্বাই শহরে তাদের দু-একজনকে দেখেও থাকব। কিন্তু ওয়াশিংটন শহরে তাদের সংখ্যাটা এত বেশি হবে বলে আমার কোনো ধারণা ছিল না। অধিকন্তু তাদের ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিল। হয় প্রভু, শেষে কোন্ দেশে এসে পড়লাম?

একটু আগেই বলেছি নিশ্বাস নেবার জন্য, সব কিছু মনের মধ্যে ভালো করে গেঁথে নেবার জন্য আমি চাইছিলাম একটুখানি ফাঁকা জায়গা। কিন্তু প্লেন থেকে নামার পর বিমান বন্দর, গাড়ি, থাকবার পাড়া, লিফট এবং পরে বাড়ির ভেতরে পর্যন্ত কোথাও নিস্তব্ধতা পেলাম না। সর্বত্র আওয়াজ, সর্বত্র শীতাতপ যন্ত্রের হিসহিস করা আওয়াজ।

যে ফ্ল্যাটে থাকব এবার সেটাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। এটা কি আবাস স্থল বলা যায়? না, এটা হল একটা থাকবার জায়গা, শান্তির নীড় নয়। ঘরে ঢুকেই আমার সাহেব তো সোজা বিছানায় জামা কাপড় পরা অবস্থায় শুয়ে পড়লেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন বলে মুহূর্তে তাঁর ঘুম এসে গেল। আমি চারিদিক তাকালাম। কোথায় শোব? বোম্বাই-তে যেমন চাদর কাঁথা পেতে শুতাম সেই ভাবেই শুয়ে পড়ব ঠিক করে ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে যে করিডর আছে সেখানে বিছানা পাতলাম। করিডরটা খুব লম্বা-এক নজরেই দরজার পর দরজা দেখা যায়। মাথার ওপরের ছাদটাও সুন্দর আলো দিয়ে সাজানো, নানা আকৃতির তারা আঁকা আছে। বিভিন্ন তারার বিভিন্ন রঙ- কোনোটা নীল, কোনোটা ধূসর আবার কোনোটা সোনালি। নকল আকাশের তলায় শুয়ে আমার অনুভূতি হল যে আমি এক বন্দী জীবনে প্রবেশ করেছি।

ঘুম ভাঙার পর কড়ি বরগার দিকে চোখ পড়তেই মনে হল আমি তো বোম্বাই-তে আছি, ফুটপাথে শুয়ে রয়েছে, মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ। অবশ্য একটু পরেই মনে পড়ল আমি কী হারিয়েছি। এখন দিন না রাত্রি বা কতটা সময় আমি শুয়ে থেকেছি কিছুই বোধগম্য হল না। তবে কয়েকটা ফ্ল্যাটের দরজায় খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখে খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হল যে আমি যখন নিঃসঙ্গ ও অরক্ষিত অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলাম তখন এক কিংবা একাধিক অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে দেখে গিয়েছে।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম আমি তা বাইরে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছি। আমার সাহেবকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বিরক্ত করতে মন চাইল না। তার চেয়ে খানিকটা সময় একেবারে রাস্তায় নেমে হেঁটে আসতে পারি। লিফট কোথায় তা মনে পড়তেই আমি সেখানে গেলাম এবং লিফটের ভেতরে গিয়ে বোতাম টিপলাম। সাঁ সাঁ করে লিফট নিচে নামতে লাগল। আমি যেন এখনও এরোপ্লেনে আছি এমন একটা অনুভূতি হল। নিচে থামবার পর লিফটের নীল রংয়ের দরজা দুপাশে সরে গেলে আমি আবার সিমেন্টের করিডর ও লম্বা দেওয়াল দেখতে পেলাম, কী আওয়াজ সেখানে! আসলে সেটা ছিল ‘বেসমেন্ট’ বা মাটির তলার ঘর। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে গেলাম বাড়ির ওপরের তলাটা খুব উঁচু নয়। এবার আমি ভাবলাম, যথেষ্ট হয়েছে, আমার আর ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন নেই। আমি আবার নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে যাই। কিন্তু মুশকিল হল, কত তলায় আমাদের ফ্ল্যাট বা তার নম্বরটাই বা কত সে সব তো আগে দেখে নিইনি, নিজের বোকামির জন্য আমার চোখে জল এসে গেল। ফের লিফটের মধ্যে ঢুকে সেখানে মেঝেতে অসহায়ভাবে আমি বসে পড়লাম। ওদিকে লিফটের দরজা বন্ধ হল এবং আবার সাঁ সাঁ করে লিফট ওপরে উঠতে লাগল।

এক সময় লিফট থামল এবং দরজা খুলে গেল। সামনে দেখি আমার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথার চুল আঁচড়ানো নেই, পোশাক অবিন্যস্ত, দৃষ্টি উদভ্রান্ত। আমাকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কী হল সন্তোষ, সাত সকালে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার পায়ে জুতা নেই কেন?’

প্রার্থিত জনকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেলে মনের যা অবস্থা হয় আমারও তাই হল। আমি চাইলাম সাহেবকে একবার জড়িয়ে ধরতে কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদপত্রের স্তূপ পার হয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলেন। আমার কাঁথা-চাদরের পোঁটলাটা তুলে নিয়ে আমি তাঁর পেছনে পেছনে ফ্ল্যাটে এলাম। চওড়া জানালার মধ্যে দিয়ে প্রভাতের আকাশ দেখা গেল, গাছ দেখা গেল একটা সুবিশাল শহর। এত উঁচুতে আমাদের ফ্ল্যাট! যেন মনে হচ্ছে গাছের ডালে চড়ে আমরা নিচের পৃথিবীটাকে দেখছি।

সাহেবকে বুঝিয়ে বললাম যে কোথায় শোব তা ঠিক করতে না পেরে দরজার বাইরে করিডরে আমি বিছানা পেতেছিলাম। সাহেব বললেন, ‘না, তা হতে পারে না। এখানে সরকার আমাকে জানিয়েছে থাকবার জন্য আমাকে যে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে তাতে আমার কাজের লোকও থাকতে পারবে।’

এরপর শুরু হল, নিজেদের ফ্ল্যাটটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা। এ দরজা ও দরজা সবই খোলা হল। এদিকে রান্নাঘর, ওদিকে শৌচাগার, এটা মালঘর, এটা বসবার ঘর সবই পাওয়া গেল, বোঝা গেল। কিন্তু থাকবার ঘর কোথায়? শেষে আরেকটা দরজা খুলতেই দেখা গেল বিরাট বড় একটা আলমারি। সেটার আবার দুটো দরজা। একটা দরজা দিয়ে ওপাশের করিডরে যাওয়া যায়, অন্যটা দিয়ে

রান্নাঘরে । আলমারিটা চওড়ায় প্রায় ছ' ফুট । বলা যেতে পারে রান্নাঘরের সমান এবং অন্য ঘরগুলোর মতোই উঁচু । আলমারির তাকগুলো ভেতরের দিকে তিন ফুট ঢোকানো ।

আলমারিটা দেখে আমি সাহেবকে বললাম, 'এটাই হল কাজের লোকের ঘর । আমি এখানেই থাকব । পাখা, লাইট, কার্পেট সব কিছুই ওখানে রয়েছে । ছাদটাও এত উঁচু যে আমার মাথায় লাগবে না । বোম্বাইতে তো আমি একফালি ঘরে থাকতাম । তার তুলনায় এ তো স্বর্গ ।'

সাহেব বললেন, 'বোম্বাই-এর কথা ভুলে যাও । এখানে যদি আলমারির মধ্যে থাকো, তো লোকে কী ভাববে? তারা ধরে নেবে ভারতীয়রা আলমারির মধ্যেই বাস করে ।'

সাহেবকে বুঝিয়ে বললাম যে এখানে থাকতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা নেই । আমার কথা শুনে সাহেব বললেন, 'সন্তোষ, তুমি সত্যিই ভালো লোক । তোমার যদি কোনো কষ্ট না হয় তা হলে আমি খুশিই হব ।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে আলমারির মধ্যে আমি কাঁথা চাদর পেতে বেশ আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম । সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে নেমে এল ঘুম ।

সকাল বেলায় আমার সাহেব বললেন, 'সন্তোষ, আমার মনে হয় টাকা পয়সার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটু কথা বলে নেওয়া দরকার । তোমাকে আমি মাসে একশো টাকা দিই । তবে বোম্বাই আর ওয়াশিংটন তো এক নয় । এখানে খরচ একটু বেশি হবেই । আমি আজ থেকে মহার্ঘ ভাত হিসাবে তোমাকে আরো পঞ্চাশ টাকা বেশি দেব ।'

সাহেব আরো বললেন, 'পনেরো দিনের বেতনটাও তোমাকে আমি অগ্রিম দিচ্ছি । ডলারে দেব এই বেতনটা । ভারতীয় এক টাকা মানে এখানকার দশ সেন্ট । তাহলে পঁচাত্তর টাকা মানে হল সাতশো পঞ্চাশ সেন্ট । বুঝলে সন্তোষ, সাতশো পঞ্চাশ সেন্ট । বিকেলে যাও, রাস্তায় একটু হেঁটে এস । তবে একটা কথা মনে রেখ, এরা কিন্তু আমাদের বন্ধু নয় ।'

বিকেল বেলায় পকেটে সাড়ে সাতশো সেন্ট নিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম । এই শহরকে নিয়ে শুরুতে আমার মনে যে ভীতি ছিল তা অবশ্যই এখন আর নেই । এ পাড়ার সব বাড়িগুলোই যে দৈত্যাকার তা নয়, রাস্তাগুলোও সেইরকম ব্যস্ত নয় । রাস্তার পাশের গাছগুলোও সুন্দর । পথ চলতে চলতে আমি কয়েকটা 'হাবসি' কে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম । তাদের চেহারা ভয়ানক, মাথার চুল অদ্ভুতভাবে বাঁধা এবং চোখে চশমা । এটা ঠিক যে ওদের ক্ষতি না করলে ওরা কারোর ক্ষতি করে না । আমার মতো কাজের লোকেরা যেখানে চা-কফি খেতে যায় আমি সেইরকম একটা

দোকানের খোঁজে ছিলাম। ওরকম কাউকে পেলে বেশ খানিক সময় কাটত। শেষে গুটি গুটি পায়ে একটা দোকানে ঢুকে খাবারের অর্ডার দেব বলে অপেক্ষা করছি এমন সময় মেয়ে-বেয়ারাটা আমার কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি নিরক্ষর? দেখছ না, আমরা লিখে দিয়েছি এখানে হিপীদের এবং খালি-পা লোকেদের জন্য কোনো জায়গা নেই।'

হায় ঈশ্বর! আমি তো জুতা পরতেই ভুলে গিয়েছি। এ কোন দেশে এসে পড়লাম রে বাবা, যেখানে বাড়ি থেকে অল্প দূরে গেলেও সর্বোত্তম পোশাকটি চড়িয়ে যেতে হবে। কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই সব সময় জুতা আর ভালো পোশাক পরতে হবে? এরা ভাবে কি যে সব সময় অন্যেরা ওদের দেখছে?

কফির দোকান থেকে বের হয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে এসে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা ফোয়ারা আর গাছের সারি। সবচেয়ে যা ভালো লাগল তা হল, ওখানে আমার মতো কিছু লোক বসে আছে। ওদের দেখে আমার এত ভালো লাগল যে প্যান্টটাকে শক্ত করে বেঁধে, জামাটাকে অল্প গুটিয়ে নিয়ে এক ছুটে রাস্তা পার হয়ে ঐ পার্কে পৌঁছে গেলাম।

ওখানে কয়েকটা হাবসী নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। তাদের চেহারা একটা খুশির ছাপ ছিল। কয়েকটা আমেরিকানও ছিল। তারা ঘাসের ওপর বসেছিল। তাদের কয়েকজনের পোশাক ছিল খুবই নিম্নমানের, কয়েকজনের পায়ে আবার জুতাও ছিল না। আমার মনে হতে লাগল সব কিছু না জেনে বুঝেই বড্ড তাড়াতাড়ি আমি ওদের সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করে বসে আছি। অবশ্য এটা ঠিক যে এই লোকগুলোর জন্য যে আমি এই পার্কে এসেছি তা নয়, আমি দূর থেকে কিছু ছেলে মেয়েকে নাচ করতে দেখেছিলাম। দাড়িওয়ালা লোকগুলোর পরনে ছিল গেরুয়া রংয়ের কাপড়, পা ছিল নগ্ন। মেয়েগুলো শাড়ি পরেছিল, তাদের পায়ে ক্যানভাসের জুতা ছিল। কখনও মাথা তুলে, কখনও নামিয়ে, গাইতে গাইতে তারা বৃত্তাকারে নাচছিল। তাদের নাচের হৃদে গুলো উড়ছিল। নাচটা এমন খাশ কিছু নয়— ওরকম নাচ সিনেমাতে দেখা যায়। তবে মজার ব্যাপার হল তারা সংস্কৃত ভাষায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগান করছিল।

প্রথমটা আমার বেশ একটা সুখানুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু পরে পীড়াদায়ক একটা চিন্তা মাথায় এল। লোকগুলোর অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ এবং তাদের চেহারা বিজাতীয় ছাপ দেখে আমার মনে হল এদের পূর্বপুরুষদের হয়ত ক্রীতদাস হিসাবে একসময় আনা হয়েছিল। তারপর আমাদের দেশের ভবঘুরেদের মতোই এদের অবস্থা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে তারা সব কিছু বিস্মৃত হয়ে এই দেশেই থেকে গিয়েছে। এরা এই দেশের লোকও নয় আবার নিজের দেশকেও চোখে দেখেনি কখনও। এদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এবার ভালো কিছু ঘটতে চলেছে আশা করছি, কিন্তু ঘটল আরেক রকম। এ যেন দূর থেকে দেখা একটা সুস্থ, সবল মানুষ কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম সে একজন বিকলাঙ্গ কিংবা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত।

ওখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগল না। পার্ক ছেড়ে আমি একটা কফির দোকানে ঢুকলাম। সেখানে অবশ্য অনেক খালি-পা লোক ঢুকছে। দোকানে বসে আমি কফি ও কেক খেলাম। পরে এক প্যাকেট সিগারেট নিলাম। সিগারেটের সাথে বিনামূল্যে একটা দেশলাই বাক্স পাওয়া গেল। ওখানে বসে থাকতে থাকতেই একটা খালি-পা দাড়িওয়ালা লোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরো দুজন কাছাকাছি এসে গেল। তারাও যেন কিছু বলতে চাইছিল। ওদের ভাবসাব দেখে আমি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু ওদের মধ্যে দু-একজন বেশ কিছুটা পথ আমার পেছন পেছন এল। বলছি না যে তাদের কোনো বদ মতলব ছিল তবে আমার ভালো লাগেনি। ওখান থেকে কিছুটা হাঁটবার পর একটা সিনেমা হল পেয়ে সেখানে ঢুকে গেলাম। বোম্বাইতে আমি সপ্তাহে একটা সিনেমা দেখতাম।

হলে তখন সিনেমা শুরু হয়ে গিয়েছে। ছবিটা ছিল ইংরেজি। আমার পক্ষে ইংরেজি বোঝা সম্ভব নয়, তবে এই অবকাশে আমি চিন্তা করার সুযোগ পেলাম। হলের অন্ধকারে আমার মনে হল আমি কি পয়সা ওড়াচ্ছি? সিনেমার টিকিট এমন বেশি কিছু নয়, মাত্র তিন সেন্ট, দেড়শো সেন্ট কফির দোকানে। ভারতীয় মুদ্রায় আমি খরচের হিসাব করতে গিয়ে দেখলাম কয়েক ঘণ্টায় আমি ন’ দিনের খরচ করে ফেলেছি। ডলার খরচ করতে গিয়ে তার দাম ভারতীয় টাকায় হিসাব করলে তো মন খারাপ হবেই।

এরপর কি সিনেমা দেখতে ভালো লাগে? হল থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ির কাছাকাছি কয়েকটা ‘হাবসি’-কে দেখলাম। বোধ হয় একটু আগে ওরা মারামারি করেছে— রাস্তায় জল পড়ে আছে আর এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা কাঁচের টুকরো। ফ্ল্যাটে ফিরে বিছানা দেখতে আমি শুয়ে পড়লাম। রান্না করবার ইচ্ছাও থাকল না।

ফিরে এসে সাহেব ডাকতেই আমি বললাম, ‘আমি বাড়ি ফিরে যাব।’

সাহেব বললেন, ‘তোমাকে এখানে আসতে আমার খরচ কত হয়েছে জান? পাঁচ হাজার। তুমি যদি দেশে ফিরে যাও তাহলে তোমাকে কমপক্ষে ছ’ সাত বছর বিনা বেতনে আমার কাছে কাজ করে ঋণ শোধ করতে হবে, তা যেন খেয়াল থাকে।’

তাঁর কথা শুনে আমি কাঁদতে শুরু করলাম।

সাহেব বললেন, ‘সন্তোষ, কী হয়েছে আমাকে খুলে বল তো।’ সাহেবকে জানালাম যে একটা সিনেমা দেখতে গিয়ে এবং কফি-কেক খেতে গিয়ে আমার অর্ধেক পয়সা বেরিয়ে গিয়েছে।

আমার উত্তর শুনে সাহেব চুপচাপ কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, ‘তোমাকে আগেই বলেছি এখানে জিনিসের দাম খুব বেশি।’

আমি যে পরাধীন তা বুঝে গেলাম, নতুন এই জীবনে মানিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই ভেবে আমি চুপচাপ হয়ে গেলাম। আগের চেয়ে শান্ত হয়ে ঐ ফ্ল্যাটে আমি বাস করতে লাগলাম।

সাহেবের সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করতে হয়। পত্র-পত্রিকায় আমরা যেমন সাজানো ফ্ল্যাটের ছবি দেখি তেমনি ভাবে তিনি নিজের ফ্ল্যাটকে সাজালেন। বাজার থেকে নানা ধরনের বই, ব্রোঞ্জের তৈরি ছোট ছোট মূর্তি, ভারতীয় হাতের কাজ ও ছবি কিনে এনে ঘরের ভেতরটা সাজালেন। এক নজর দেখলে ফ্ল্যাটের সৌন্দর্য ভালোই লাগবে। আমার অবশ্য এসব জিনিসকে কোনোদিন ভালো লাগেনি। আমার সব সময় মনে হয়েছে ফ্ল্যাটই তো কৃত্রিম। যেমন বেতের চেয়ার দিয়ে বোম্বাই-এর ঘরটা সাজানো ছিল। আসলে এ সব বাড়ির সাথে আমার হৃদয়ের যোগ কোনোদিন হয়নি।

সাহেবের বন্ধুরা রাতের দিকে এলে আমি আমার কাজ করে যেতাম। যথাসময়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে আমি এমন ভান করতাম যেন আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে রাস্তায় হাঁটতে বের হচ্ছি। আসলে আমি তা করতাম না। আমি সাহেবের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে আমার কুঠুরির মধ্যে ঢুকে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করতাম। রাস্তায় বের হতে চাইলে আমাকে বাধা দেবার কেউ ছিল না, তবে আমার নিজের তা ভালো লাগত না। এমন কী, ঐ বাড়িটার নিচতলায় কাপড় কাচার যে লব্ধি ছিল, সেখানেও যেতে পছন্দ করতাম না।

সপ্তাহে এক কিংবা দু-বার আমি এখানকার সবচেয়ে বড় বাজারে যেতাম। রাস্তায় হাবসি সম্প্রদায়ের কিছু লোক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হত। তাদের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলেও তা পেরে ওঠা সহজ ছিল না। তারা রাস্তায় বসে থাকত, বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকত, লাল ইটের বাড়ির পাশে ঝোপের মধ্যে থাকত। দেখে মনে হত, তারা মুক্ত বাতাসের প্রাণী এবং তাদের হাতে কাজকর্ম বড় একটা নেই। খুব সকালেই তাদের কয়েকজন একটু নেশা-ভাঙা করে নিত।

হাবসিদের পাড়ায় তাদের বাড়িগুলোর মতো পুরোনো আরো কয়েকটা বাড়ি ছিল। তবে ওগুলোর একটা বিশেষত্ব ছিল যে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ির দরজায় একটা গ্যাসের আলো জ্বলত। এই বাড়িগুলো ছিল আমেরিকানদের। হাবসিদের মতো তারা কিন্তু রাস্তার ওপর দল বেঁধে বসে থাকত না। বাড়িতে সারাক্ষণ আলো জ্বালিয়ে তারা যেন বলতে চাইত যে বাড়িটা বাইরে থেকে জীর্ণ মনে হলেও ভেতরটা কিন্তু সুন্দর এবং আরামদায়ক। আমার মনে হত, এই পার্থক্যটুকু তুলে ধরে তারা যেন হাবসিদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে—সাবধান, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসবে না তোমরা।

বড় বাজারে সব সময় বন্দুকধারী এক পুলিশকে দেখা যেত। বাজারের ভেতর কয়েকটা হাবসি পাহারাদারও ছিল। দোকানের ক্যাশবাক্সের কাছাকাছি তারা থাকত। বাজারে হাবসি সম্প্রদায়ের ভিক্ষুকও ছিল। এ ছাড়া সুঠামদেহী কয়েকজন

হাবসি যুবকও ছিল যারা লোকের মালপত্র বয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকত; যেম-
কিনা আমিও সেই পাহাড়ি শহরে পর্যটকদের মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি
থাকতাম।

বড় বাজারে যাওয়াটাই ছিল আমার বেড়ানো, তবে ঘরে ফিরে এলে আমার
ভালোই লাগত। বাড়িতে কাজও খুব কম ছিল। বেশিরভাগ সময় আমি টেলিভিশন
দেখতাম এবং এই কয়েক মাসের মধ্যে ইংরেজিটাও ভালো রপ্ত করতে
পেরেছিলাম। কয়েকটা অনুষ্ঠান থেকে আমেরিকানদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমি
অনেক বেশি জানতে পারলাম। সত্যিকারের জীবন থেকে আমি কেবল জেনেছিলাম
তারা বাড়িতে সারাক্ষণ গ্যাস-বাতি জ্বালিয়ে রাখে। আমাদের বাড়ির উঁচুতলা থেকে
তাকালে চারিদিকে বাড়ির সাদা সাদা চূড়া, নানা আকৃতির বহুতল বাড়ি এবং বেশ
কিছুটা সবুজ মাঠ দেখতে পেতাম। কয়েকজন আমেরিকানের বাড়িও আমি
গিয়েছি। যেটা বারবার আমার চোখে পড়েছে তা হল, আমেরিকানরা নিজেদের
ঘরদোর, মেঝে, বাসনপত্র খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। তারা যেমন নতুন কাপড়
জামা কেনে, তেমনি সে সব পরিষ্কার করে রাখে। তারা নতুন মোটর গাড়ি কেনে
সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার, ঝকঝকে রাখে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা
জন্য আমেরিকানদের খুব নাম ডাক আছে।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আমার ওপর বেশ মজার একটা প্রভাব ফেলেছিল।
রাস্তায়-ঘাটে যখনই কোনো আমেরিকান দেখতাম আমি তাকে টেলিভিশন
অনুষ্ঠানের একজন কুশীলব বলে মনে করতাম। আমি ধরেই নিতাম, অনুষ্ঠানের এব-
ফাঁকে সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলাটি বাইরে এসেছে, এখুনি আবার
স্টুডিওতে ফিরে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমেরিকানরা যে আমাদের মতে
মানুষ তা কখনই মেনে নিতে পারতাম না।

অন্যদিকে কোনো হাবসিকে যদি টিভি-র পর্দায় কাচাকাচি কিংবা ধোয়া-মোছার
কাজ করতে দেখতাম তখন মনে হত হাবসিটা পয়সার জন্য অভিনয় করছে
অনুষ্ঠান শেষ হলেই আবার সে অলসভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় অতিবাহিত করবে
টি. ভি. অনুষ্ঠানে যে কাজ সে করছে দেখানো হচ্ছে তার সাথে বাস্তবের কোনো
সম্পর্ক নেই।

একদিন বড় বাজারের ভেতরে হাবসি মেয়েটা আমার কাছ থেকে কোনো একট
বাহানায় কিছু টাকা নিয়ে সেগুলোর গন্ধ গুঁকে বলল, 'তোমার শরীরের গন্ধটা বেশ
মিষ্টি।'

মেয়েটার সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাই গন্ধের রহস্যটা তাবে
খুলে বলা উচিত বলে মনে করলাম। আমি বললাম, 'আমার দেশ মানে ভারত
থেকে আমি দুটো জিনিস নিয়ে এসেছি। আমার ধারণা এই দুটোর জন্মস্থান হল

ভারত । একটা হল, আমি এক বিশেষ লতা শুকিয়ে নিয়ে এসেছি । ওটাকে আমি পাইপে ভরে ধূমপান করি । দ্বিতীয়টা হল, দাড়ি কাটার ব্লেড ।’ আমার এই দুটি সম্পদের একটা অংশ মেয়েটিকে দিলে পরিবর্তে সে আমাকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শিখিয়ে দিল । প্রথম যে বাক্যটি সে আমাকে শিখিয়েছিল তা হল, ‘আমি কালো সেইসঙ্গে ভালো ।’ অন্য বাক্যটি সে বন্দুকধারী পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল ‘ওটা একটা শুয়োর ।’

আমাদের বিল্ডিং-এর একই তলায় অন্য একটি ফ্ল্যাটে যে হাবসি মেয়েটি গৃহ-পরিচারিকার কাজ করত সে আমার ইংরেজি বিদ্যাকে আরো একটু সমৃদ্ধ করেছিল । আমার শরীরের গন্ধে সে আমার প্রতি দুর্বলতা দেখালেও আমি খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম আমার শারীরিক ক্ষুদ্রতা ও ভিনদেশের নাগরিকত্ব তার কৌতুহল বাড়িয়ে তুলেছিল । মেয়েটি ছিল বিশালকায়, তার চোখ ও ঠোঁট ছিল বেশ মোটা মোটা কিন্তু ঝুলে পড়েছে এমন নয় । তার স্থূলতা দেখে আমি বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম, তাই শুধু তার মুখের দিকে তাকাতাম, এর পরিণাম হল সাংঘাতিক । মেয়েটা আমাকে ভুল বুঝে রুঢ়ভাবে আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করত । দৈহিক শক্তিতে তার সঙ্গে পেরে উঠব না বলে তামাশার বদলে তামাশা করতে পারতাম না । তবুও কেন জানি না, মেয়েটাকে আমার খুব মনে ধরেছিল । যে আতর সে ব্যবহার করত সেটার গন্ধে যেন আমার মাথা ঘুরে যেত ।

আমি হয়ত একমনে টেলিভিশনে আমেরিকানদের দেখছি এমন সময় মেয়েটা আমার বাসায় প্রায়ই চলে আসত । এই রকম একটা মুহূর্তে আমার আগমন মানে আমার বিনোদনে বিঘ্ন । তাই আমার ভালো লাগত না । আমার বাসা থেকে বেরিয়ে যাবার পরও ঘরের ভেতরের বাতাসটা তার ব্যবহৃত আতরের গন্ধে বেশ ভারি হয়ে থাকত । আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকটা ব্রোঞ্জের দেবতার মূর্তি ছিল । হাবসি মেয়েটা এলে আমি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন মেয়েটা আমাকে খারাপ না করতে পারে । ‘খারাপ হওয়া’ ওদেশে অবশ্য একেবারেই অপরিচিত একটা শব্দ । যে দেশের লোকেরা হাবসিদের প্রশংসা পাশি থাকতে দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই হাবসিদের কিছুটা সম্মানও করে । আমাদের দেশে মানে ভারতে অবশ্য হাবসিদের নিয়ে বড় একটা মাতামাতি করে না কেউ । ধর্মগ্রন্থ হোক না হোক, আমাদের সব বইতে লেখা আছে যে হাবসি মেয়েদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । তা না করলে পরজনে বিড়াল কিংবা বাঁদর অথবা হাবসি হয়েই জন্মাতে হবে ।

কিন্তু সব জেনে বুঝেও মেয়েটার জন্য আমি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম । এ কি কল্পনার বিলাসিতা না একাকীত্ব? আমার মধ্যে মেয়েটা কী দেখেছে? তা হলে কি আমি সুপুরুষ? মাঝে মধ্যে বাথরুমে গিয়ে আমি নিজের চেহারা দেখতাম । বোম্বাইতে থাকবার সময় সপ্তাহে কিংবা মাসে একবারও আয়নার সামনে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতাম না । নিজের চেহারা দেখবার জন্য তো নয়ই, আয়নার সামনে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল একেবারে মামুলি । শুধু দেখে নেওয়া,

নাপিতে মাথার চুল খুব ছোট করে কেটে দিয়েছে কিনা কিংবা মুখের ওপর কোনো ফোড়া পেকে গেছে কিনা। কিন্তু এদেশে এসে আমি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আমার মনে হল, আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আমারও আছে। এরকম অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। আগে আমার ধারণা ছিল আমার চেহারার কোনো মূল্যই নেই; মানুষ চেনার জন্য একটা চেহারা চাই, সেই জন্যই আমার চেহারাটা আছে।

নিজের চেহারাতে আমি যেমন নতুনত্ব খুঁজে পেলাম, তেমনি পেলাম মানসিক অস্থিরতা। এখন আমি নিজের চেহারাকেই ভালোবেসে ফেললাম। কখন নিজের চেহারা দেখব তা ভেবেই সময় কাটাতাম। এক ধরনের অসুস্থতা বললেই ভালো হয়। আমি হয়ত টিভি দেখছি। আমার হঠাৎ মনে হল টিভির ঐ লোকটা কি আমার চেয়েও সুপুরুষ দেখতে? সঙ্গে সঙ্গে আমি বাথরুমে ছুটে যেতাম নিজেকে আরেকবার দেখবার জন্য।

পুরোনো সেই সব দিনের কথা আমার মনে পড়ে যখন আমার শারীরিক সৌন্দর্যের কোনো মূল্যই আমার কাছে ছিল না। আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই ঐ তো হেঁড়া ময়লা, সস্তা দামের জামা কাপড় পরে আমি এরোপ্লেনে বসে আছি, ঐ তো প্লেন থেকে বিমান বন্দরে নামলাম, ঐ তো খালি পায়ে কফির দোকানে ঢুকলাম। কেউ যদি ঐ ধরনের পোশাক পরে থাকে তাহলে তার যে কী পরিচয় তা আর অন্যকে খুলে বলতে হবে না, এক নজরেই লোকে বুঝে যাবে যে ভৃত্য স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া ঐ পোশাক কেউ পরে না। এ সব ভাবলে লজ্জায় আমি কঁকড়ে যাই। তবে ওয়াশিংটনের বাসিন্দাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে ঐ হেঁড়া কাপড় পরা লোকটাকেও তারা মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

একদিন ছিল যখন আমি লুকিয়ে থাকবার জন্য একটা জায়গা চেয়েছিলাম, যখন আমি নিজেকে একজন কয়েদী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। আমি ওয়াশিংটন শহরের একটা টুকরো পেয়েই খুশি ছিলাম। আমাদের বাসাবাড়ি, আমার শোবার জন্য আলমারি, আমার টি. ভি. সেট, আমার সাহেব, আমার হাবসি বান্ধবী নিয়েই ছিল আমার জগৎ। আমার অজান্তেই একটা দিন এল যখন দেখলাম আমি তো আর বোম্বাই ফিরে যেতে চাই না। আবার এই ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকেও বুঝতে পারলাম না আমি কী করতে চাই।

নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও করবার মতো উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল না। তাই কালো জুতার একটা ফিতে, মোজা আর একটা বেল্ট কিনে ফেললাম। আমার কাছে খানিকটা গাঁজা রাখা ছিল। বুঝতে পারলাম হাবসি মেয়েটার কাছে কিংবা খালি পায়ে লোকটার কাছে যদি গাঁজাটা বিক্রি করে দিই তাহলে হাতে কিছু পয়সা এসে যাবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, হাবসি মেয়েটার হাত দিয়ে গাঁজা পাঠিয়ে

দিলাম বড় বাজারে। মেয়েটা ফিরে এসে আমার হাতে দুটো ডলার তুলে দিল। গাঁজা বিক্রি করতে আমার যে পরিমাণ আগ্রহ ছিল সেই আগ্রহ নিয়ে আমি বেশ ভালো ভালো কাপড় জামা কিনে আনলাম।

সেগুলোর মধ্যে ছিল একটা সবুজ টুপি এবং একটা সবুজ রংয়ের স্যুট। ঐ দিন সকালে আমি যা কিনেছিলাম এখনও সেই সব জিনিসগুলো আমার কাছে রাখা আছে। সেদিন আমি অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিলাম ঠিকই, কিন্তু কী ঘটতে চলেছে তা আগেভাগে বুঝে নেবার ক্ষমতাও ছিল। দোকানের ছেলেটা নানা কথা বলে আমাকে তার পছন্দের জিনিসটা গছাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি শুনলে তো তার কথা! সে তো নিজের চাকরি বজায় রাখবে বলে এসব করছিল। যে স্যুটটা সে সর্বপ্রথম আমাকে দেখিয়েছিল আমি সেটা নিয়ে 'ট্রায়াল রুমে' ঢুকে গিয়ে একেবারে পরেই ফেললাম। সেটা আমার মাপে হল কিনা কিংবা ঐ পোশাকে আমাকে কেমন মানিয়েছে সে সব চিন্তা আমার মনে এল না। খানিকপর খেয়াল হল যে আমি একটা অত্যন্ত সাধারণ লোক এবং অতি সাধারণ মানের পোশাক হলেই আমার চলে যাবে। যেই না আমি এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পারলাম আমি আবার ট্রায়াল রুমে ঢুকে ঐ পোশাকটা ছেড়ে ফেলে সবুজ রংয়ের স্যুটটা কিনতে চাইলাম। দোকানের ছেলেটা আমাকে অন্য একটা স্যুট নেবার জন্য বহু কথা বলতে শুরু করলে আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে আমার জন্য একটা টুপি আনতে বললাম। এতসব করার পর আমি এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে বাড়ি ফিরেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

স্যুটটা আমার এত প্রিয় ছিল যে সেটাকে কোনোদিন বুলিয়ে রাখিনি। দোকানে অমূল্য ডলারগুলি যখন গুনে দিছিলাম তখনও জানতাম যে সেটাকে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে রেখে দেওয়াটা উচিত নয়। বাড়িতে মাঝে মধ্যে স্যুটটা পরে আমি বেশ জুত করে চেয়ারে বসেছি, পায়ের ওপর পা তুলে বসেছি, চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়েছি। কিন্তু ওটা পরে আমি কখনও রাস্তায় পা রাখিনি। পরবর্তীকালে আমি প্যান্টটা পরলেও কোটখানা গায়ে চড়াতে মন কোনোদিন সায় দেয়নি। তার মানে এই নয় যে ওটা বাদে আমি অন্য স্যুট কিনেছি। ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর থেকে আমি এক রংয়ের প্যান্ট ও ভিন্ন রংয়ের জ্যাকেট পরছি। আজও তাই পরে আছি।

একটা সময় ছিল যখন আমার আর আমার মালিকের মধ্যে খুব খোলাখুলি সম্পর্ক ছিল। আসলে আমার নিজস্ব গোপনীয় বলে কিছুই ছিল না তাই সব বিষয় সাহেবের সাথে আলোচনা করতাম। কিন্তু এখন থেকে মনে হতে লাগল আমার নিজস্ব কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত নয়। যেমন, আমার জমানো কয়েকটা ডলার। সবুজ রংয়ের এই স্যুট ও আমার ইংরেজির জ্ঞান।

একটা সময় ছিল যখন আমার জীবনে সাহেবই ছিল সব কিছু। তাঁর কাছে আমি ছিলাম একটা ধূলিকণা মাত্র। আমাদের দেশে অবশ্য সৌজন্য প্রকাশ করতে এই ধরণের তুলনা করা হয়। আমার জন্যই তিনি এই বিশাল দুনিয়াতে পা রেখেছেন আবার তাঁর মাধ্যমেই আমি এই দুনিয়াকে জানতে পেরেছি। বোম্বাই-তে আমি

বন্ধুদের সাথে ফুটপাথে যখন রাত কাটাতাম তখন সাহেব ও তার বন্ধুদের দু-চারটে টুকরো কথা বা হাসির আওয়াজ শুনতে পেতাম। সেই জীবনে আমি বেশ সুখী ছিলাম। গভীর রাতে সাহেবের বন্ধুরা যখন নিজেদের বাড়ি ফিরে যেত তখন তাদের কেউ কেউ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসলে আমি আরো বেশি খুশি হতাম।

আজকাল ঐ সব জিনিসে আমি আর খুশি হতে পারি না। আগে সাহেবের অস্তিত্বের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে বলে মনে করতাম। এখন তা করি না। বাইরের লোকেরা যে চোখে তাঁকে দেখে আমিও সেই দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখি। এখন মনে হয়, ঐ লোকটা তো আমারই বয়সি। দুজনেরই বয়স পঁয়ত্রিশের আশে পাশে। লোকটা একটু গোলগাল, ব্যায়াম করলে ওর শরীরটা আরো একটু ঝরঝরে হত। লোকটার চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে, ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটে। কথা বলার সময় দাঁত দিয়ে মুখে ঢুকে যাওয়া গৌফের প্রান্তটাকে কুটকুট করে চিবোতে থাকে কিংবা ওপরের ঠোঁটের ভেতর দিকটা মাঝে মাঝে কামড়ে ধরে। ঐ লোকটাও মাঝে মধ্যে নিজের কাজের চাপের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করে, নিজের বাড়িতেই তাঁর অফিসের লোকদের কাছ থেকে ঠিকমত কাজ না করার জন্য দু-চারটে আজেবাজে কথাও তাকে শুনতে হয়। আমিও যেমন সদা সর্বদা খুব সাবধানে থাকি ঐ লোকটাও তেমনি সারাক্ষণ সঁটিয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই-তে থাকার সময় আমার কখনও মনে হয় নি যে আমরা দুজনে সমকক্ষ।

একবার একজন আমেরিকান আমাদের বাড়িতে এল। রাষ্ট্রের খাবারের জন্য তার নিমন্ত্রণ ছিল। আমাদের বাড়িতে আসবাবপত্র, শিল্প সংগ্রহ ইত্যাদি দেখে সে জানাল ভারতের কোনো এক মন্দির থেকে বিগ্রহের পুরো মাথাটাই সে কেটে আনতে পেরেছে। সাহেব তাকে বললেন, এ তো একেবারে বে-আইনি কাজ। সাহেবের কথা শুনে লোকটা হেসে উত্তর দিল, 'তো কি খালি হাতে হয়েছে? পাক্কা দু ডলার নিয়েছে গাইডটা। লোকটাকে যদি এক বোতল মদ দিতে পারতাম তা হলে বোধ হয় পুরো মন্দিরটা ভেঙে আমার হাতে তুলে দিত।' কথাটা শুনে সাহেবের মন ভেঙে গেল। ভদ্রলোক যতক্ষণ আমাদের বাড়িতে ছিলেন সাহেব ততক্ষণ তার সাথে মৌখিক ভদ্রতা করে গেলেও আমি বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর মনটা ভারী হয়ে আছে। তাঁর জন্য আমারও বেশ খারাপ লাগছিল।

আমেরিকান অতিথিটি চলে গেলে সাহেব আমার কামরার দরজায় টোকা দিতেই আমি বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। ঐ সময় আমার পরিধানে উপযুক্ত পোশাক না থাকলেও তাঁর সামনে যেতে আমার কোনো সংকোচ হচ্ছিল না। সাহেব প্রথমে মুখ খুললেন, 'সন্তোষ, ঐ লোকটা কী বলে গেল শুনলে তো?'

আমি এমন ভান করলাম যেন কিছু বুঝতে পারছি না। পরে উনি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে আমি মন্তব্য করলাম, 'সাহেব আমরা তো জানিই এরা কতখানি স্পষ্টবাদী এবং সেই সঙ্গে কতটা অসভ্য।'।

আমার উত্তর শুনে সাহেব বললেন, ‘দেখ সন্তোষ, এদের ধারণা গরীব দেশের মানুষরা সকলেই একই রকম। আমাদের দেশের সরকারি অফিসার ও অতি দরিদ্র একজন গাইডের মানসিকতা একই পর্যায়ে বলে এরা মনে করে।’

মনে হল সাহেব লোকটার কথাগুলোকে একেবারে ব্যক্তিগত অবমাননা বলে মনে করছেন। আমার মনে হল, সাহেব সেই মন্দিরের কথাও চিন্তা করছেন।

কয়েকদিন পর সেই দুঃসাহসের ঘটনা ঘটল। হাবসি মেয়েটা আমাদের ফ্ল্যাটে এল। তার শরীরের গন্ধে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইলাম। সে আমাকে টেনে নিয়ে সোফাতে শুইয়ে দিল। তার কাণ্ড কারখানা দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে বুঝি মা কালী। দেবীর মতোই সে কৃষ্ণবর্ণা, লাল-জিহবা, সবল বাহু এবং ধবংস ও মৃত্যুর নিয়ন্তা। ভেবেছিলাম আমার সান্নিধ্যে সে বন্য হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি বোধহয় শারীরিক শক্তিতে তার সমকক্ষ নই বলে সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। এতে আমি বেশ অপমানিত বোধ করলাম। যাইহোক, সবশেষে আমার মনে হল, ভয়ানক কিছু একটা আমি করে বসে আছি।

সবকিছু শেষ হয়ে গেলে আমি তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম, নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম সে এই ফ্ল্যাট থেকে অবিলম্বে চলে যাক। কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হল সে যেন এই ফ্ল্যাটের মালিক এবং যাবার জন্য সে এখানে আসেনি। বাড়ির ভেতরের আববাবপত্র, শিল্প কলা ইত্যাদি দেখে সাহেবের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই ফ্ল্যাট তো তাঁরই। কিন্তু তিনি এখন কোথায়? হয়ত নিজের অফিসে বসে পরদেশে থাকার মাসিক যন্ত্রণা অনুভব করে চলেছেন।

শরীরে প্রচুর জল ঢেলেও আমি শান্তি পেলাম না। মনে হচ্ছিল আমার সারা শরীরে মেয়েটার মাথার তেলের গন্ধ যেন লেপটে আছে। একটা লেবু কেটে নিয়ে গায়ে মাখলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না। আমি বাথরুমের মেঝেয় শুয়ে থাকলাম, বসবার ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকলাম কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলাম না। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে আমার চোখে জল এল।

আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে শীতাতপ যন্ত্রটা সারাক্ষণ চলত বলে ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। গরমকালে আমাদের দেশের পাহাড়ি শহর যেমন গরম হয়, এই শহরটার তাপমান সেই রকম ছিল। আমাদের দেশে ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করার সময় আমাদের যে ধরনের কাপড় পরার ইচ্ছা হয় আজও সেই রকম ইচ্ছা হল। আমার প্যান্টলার মধ্যে প্রায় একটা ধুতির সমান সুতির জামার কাপড় ছিল। আমি সেটা পরে মাটিতে পদ্মাসনে বসে, একটা ধূপ জ্বালিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করতে শুরু করলাম। ধানিকপের আমার খিদে পেল। এতে আমি আনন্দ পেলেও উপবাস করব বলে স্থির করলাম।

আমি তখনও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছি এমন সময় সাহেব অফিস থেকে ফিরে এলেন, এত তাড়াতাড়ি ফেরাটা একটু অপ্রত্যাশিত। আমার ভাগ্য ভালো যে উনি এই সময় ফিরলেন। খানিক আগে ফিরলে আমি তো হাবসি মেয়েটার সাথে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতাম। তবে ধরা যখন পড়িনি এবং একটা পুণ্য কাজে রত আছি সাহেব এটা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। এত ভালো একটা কাজ করছি ভেবে আমিও গর্বিত বোধ করলাম।

সাহেব জানতে চাইলেন, ‘সন্তোষ, এসব কী?’

আমি বুক ফুলিয়ে জবাব দিলাম, ‘সাহেব, ধ্যান তো আমি মাঝে মধ্যেই করে থাকি।’

সাহেবের দৃষ্টিতে কিন্তু আমার কাজের প্রশংসা দেখতে পেলাম না। তিনি নিজের জ্যাকেট খুলে সোফায় ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ফ্রিজ খুলে বোতল বের করে দুগ্লাস কমলা লেবুর রস খেলেন। এই সময় তাকে উদাস দৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। এক সময় তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘সন্তোষ, আমরা এই দেশে কী করতে এসেছি?’

এর উত্তর আমি আর কী দেব? আমিও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ঘোলাটে-নীল আকাশ, গগনচুম্বী বাড়ির সারি দেখতে পেলাম। কতকগুলো বাড়ির ছাদে শনিবার ও রবিবার লোকে রৌদ্র স্নান করে। নিচে যে রাস্তাটা ধরে আমি সুপার মার্কেটে যাই— সেটাও দেখা যাচ্ছে।

সাহেব ঘর ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটা সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলে ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। একটু পরে বাইরে থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। জানালার কাঁচটা একপাশে ঠেলে দিতেই দেখতে পেলাম সুপার মার্কেটের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা থেকে গুগোল ভেসে আসছে। জানালার কাঁচটা আবার বন্ধ করতেই ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা, বাইরের আওয়াজ কানে না এলেও দেখতে পাচ্ছিলাম কালো ধোঁয়ার দৈত্যাকার এক কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠছে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে যাবার পর তার রং আর কালো থাকছে না। এত ধোঁয়া মানে বিধবংসী আগুন সাহেবের মুখে শুনলাম হাবসিরা উন্মত্ত হয়ে গোটা ওয়াশিংটন শহরটাই বোধ হয় পুড়িয়ে দেবে।

একটু আগেই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। তবুও এই ধবংসের সংবাদে আমি আনন্দ পেলাম। সেদিন বিকেলে ও সন্ধ্যায় যতবার এই সংবাদ শুনলাম ততবারই বেশ খুশি হলাম। অগ্নিসংযোগের ঘটনা টিভিতে আমি বারবার দেখে মজা পেলাম। পরের দিন সকালেও এই ঘটনা আবার দেখলাম। একটা বিখ্যাত শহর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল আমি শুনেছিলাম। আমি মনপ্রাণে চাইছিলাম আগুন ছড়িয়ে পড়ুক, আরো ছড়িয়ে পড়ুক যাতে শহরের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি লোক, এমন কী আমি নিজেও পুড়ে মারা যাই। চাইছিলাম, পালাবার সমস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাক, পালাতো তো দূরের কথা সেই চিন্তাও উদ্ভট

হয়ে যাক । যখনই আগুন নিভে যাবার এতটুকু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই আমার মন অবসাদে ভরে গিয়েছে ।

চারদিন আমরা বাড়ির বাইরে যেতে পারলাম না । বাড়িতে বসে বসেই আমরা অগ্ন্যুৎসব দেখলাম । আমাদের ফ্ল্যাটের জানালা সরালেই যে দৃশ্য দেখা যেত ও গণ্ডগোলের যে আওয়াজ শোনা যেত, টিভি-তে সেই সব দৃশ্য বারবার দেখাতে লাগল, এক সময় এর পরিসমাপ্তি ঘটলেও জানালা দিয়ে আমরা যে সব গগনচুম্বী বাড়ি দেখতাম বা গাছ দেখতাম— সেগুলো আগের মতোই ছিল । কিন্তু আমি আজ প্রথম বুঝলাম যে বন্দীদশা থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে ।

সুপার মার্কেট ছাড়িয়েও ধবংসের পদচিহ্ন দেখা গেল । আগে অবশ্য আমি ওপাশটায় যাইনি । এত কাণ্ডের পর ঐ রাস্তায় প্রথমবার পা রাখতেই আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল । চওড়া রাস্তা যেমন ছিল, তেমনই আছে । রাস্তার দু পাশের গাছ, বাড়ি, দোকান, বিজ্ঞাপন সব কিছুই আছে কিন্তু কিছুটা আগুনে পুড়ে অথবা ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে । কোথাও দোকানঘরগুলো ভেঙে গিয়েছে কিংবা কালো হয়ে গিয়েছে, কোথাও আগুনের শিখা একেবারে জানালা ফাটিয়ে বের হয়ে লাল ইটকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে । মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য । মাঝে মধ্যে হাবসিরা দল বেঁধে বসেছিল । আমি যেন খুব ব্যস্ত, কোনোদিকে তাকাবার সময় নেই এমন ভাব দেখিয়ে হাঁটছিলাম । কিন্তু হাবসিগুলোকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে আমিও হেসেছিলাম । মনের সুখে ধবংসলীলা চালাতে পেরেছে বলে হাবসিগুলোকে বেশ উৎফুল্ল লাগছিল । তারা যে এত কিছু করতে পারে এবং তাদের যে এত অগাধ ক্ষমতা আছে তা ভেবে তারা যেন বেশ গর্ব বোধ করছিল । খুঁটির দিনে মানুষের চেহারা য় যে খুশির ভাব ফুটে ওঠে হাবসিগুলোর চেহারা তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল । তাদের আনন্দে আমারও আনন্দ হচ্ছিল ।

যখনই আমি বন্দী দশার কথা ভেবেছি তখনই গোটা ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হয়েছে । ওয়াশিংটন থেকে চলে যাও, আবার বোম্বাইতে আগের জীবনে প্রবেশ কর । একটু ভাবলেই গোটা ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হয়েছে । আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি— ওয়াশিংটনে এতদিন থাকবার পর তুমি কি আবার বোম্বাই এর ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটাতে পারবে? আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছি— না তা আর সম্ভব নয় । বোম্বাই-এর দিনগুলি যেন আমার বাল্যকালের সুখের দিন । সেই সব দিন ফিরে আসুক আমি তা চাই না ।

আগুন লাগার ঘটনার পর আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল পায়ে হেঁটে বহুদূর পর্যন্ত চলে যাওয়া । আজকাল আমি আর এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবি না । একদিন এই রকম হাঁটছি এমন সময় দেখলাম আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন লোক একটা বাড়িতে বিরাট একটা সাইনবোর্ড লাগাবার চেষ্টা করছে ।

যে লোকটা এ কাজের তদারকি করছে তাকে দোকানের মালিক বলেই মনে হল। ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু বসত বাড়ি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিবর্তিত হয়েছে। সাইনবোর্ড পড়ে বুঝলাম ওখানে একটা খাবারের দোকান বা রেস্তোঁরা হতে চলেছে। দোকানের মালিকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। এখানে এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। দেখেছি, একজন ভারতীয় অন্য একজন ভারতীয়কে দেখলে না চেনার ভান করে, কারণ তারা চায় না তাদের দেশ থেকে আরো একজন প্রতিবেশী এদেশে চলে আসুক এবং তাদেরকে শক্ত শক্ত প্রশ্ন করুক।

সুন্দর সাইনবোর্ডের জন্য দোকানদারকে অভিনন্দন জানালাম এবং তাঁর দোকানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলাম। ভদ্রলোকের ছোটখাটো চেহারা এবং পঞ্চাশের কাছাকাছি তাঁর বয়স। তাঁর পরনে ছিল স্যুট এবং তাঁর চোখের নিচে ছিল কালি। দেখে মনে হচ্ছিল সম্প্রতি তিনি বেশ খানিকটা রোগা হয়েছেন। ভদ্রলোকের চেহারা বা চালচলন দেখে এটাই মনে হবে যে আমাদের দেশে ঐ ধরনের লোক রেস্তোঁরা-ব্যবসায়ে নামেন না। কেন জানি না, ভদ্রলোককে আমার ভালো লাগল। তিনি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার ব্যবসায়ের জায়গাটি আমাকে ঘুরে দেখার জন্য অনুরোধ করলেন। ভদ্রলোকের নাম প্রিয়।

গ্যালারির পাশের কামরাটির মতো সুন্দর ও মহার্ঘ বস্তু দিয়ে সাজানো ঘর আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। ওয়াল পেপার তো নয় যেন মখমল। ঐ রকম ওয়াল পেপারের ওপর একবার হাত না বুলিয়ে আমি থাকতে পারলাম না। ঘরের ছাদ থেকে পেতলের বাতিদানের ওপর যে কারুকার্য আছে তা এক কথায় অনুপম। বাতিদানের সাথে লাগানো বাবুগুলিও ছিল নানা রংয়ের। আমি যে সব বস্তুর ওপর চোখ রাখছিলাম, প্রিয়র চোখও সেই সব বস্তুর ওপর পড়ছিল। আমার দৃষ্টিতে অত্যধিক প্রশংসার ছোঁয়া দেখে সে বোধ হয় নিজের অমিতব্যয়িতার কথা ভেবে উদ্ভিগ্ন হল। রেস্তোঁরাটি তখন পর্যন্ত সাধারণের জন্য খোলা হয়নি। ঘরের এক কোণে তাকের ওপর কয়েকটা সৌভাগ্যসূচক জিনিস দেখতে পেলাম। এগুলোর মধ্যে ছিল পেতলের রেকাবি-তে রাখা কিছু কাঁচা ছল যা আনতে পারে সমৃদ্ধি, একটা ছোট খাতা ও পেন্সিল ছিল যা হিসাবের খাতায় সৌভাগ্যের ছোঁয়া আনতে পারে। এছাড়া সর্ব সাধারণের মঙ্গলের জন্য রাখা ছিল একটা মাটির প্রদীপ।

দোকান ঠিকমত চলবে কিনা সে সম্বন্ধে আমার কী ধারণা ভদ্রলোক তা জানতে চাইলে আমি উত্তর দিলাম, ভালো চলা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার যে শত্রুর অভাব নেই, সন্তোষ, আসলে আমি নগদ ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বন্ধক রেখে টাকা নিতে চাই না। সেই জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমাকে একদম পছন্দ করে না।’

তাঁর কথায় বুঝতে পারলাম প্রিয় নিশ্চয়ই ঐ রেস্তোঁরাটি বন্ধক রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফল মনোরথ হতে পারেননি। ভদ্রলোক এবার জানতে চাইলেন বোম্বাইতে আমি সরকারি চাকরি করতাম কিনা। আমি হ্যাঁ বলায় ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, ‘এখানে

একটা প্রবাদ বাক্য খুব চালু আছে। সেটা হল, যদি অপরকে পরাজিত করতে না পার, গাহলে তাদের সঙ্গে থেকে যাও। আমি তো ওদের দলেই ছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে হাফ করতে পারল না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতদুটো উপরের দিকে তুলে তিনি ললেন, 'বলতে পার, লোকে এমন করে কেন? মানুষের উচিত সব কিছুর মায়া কাটিয়ে দীর্ঘতীরে বসে তপস্যা করা। সবই মায়া, সবই মায়া।'

ভদ্রলোকের কথা মানেটা আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে এই প্রসঙ্গে আমার বোম্বাই-এর জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। এই সময় ভদ্রলোকের খেয়াল হল যে, আমাকে চা বা কফি কিছু খাওয়ানো হয়নি। আমি খেতে সম্মত আছি শুনে তিনি কর্কশ গলায় এক অপরিচিত ভাষাতে রান্না ঘরের পেছনে থাকা কোনো একটা লোককে ডাকলেন।

লোকটা একটু পরেই হাতে একটা ট্রে নিয়ে আমাদের কাছে এল। প্রথমটায় তাকে আমি দেশোয়ালি ভাই মনে করেছিলাম। কিন্তু তার দিকে ভালো করে তাকাতেই বুঝলাম সে ভিনদেশীয়। লোকটা আবার রান্নাঘরে ফিরে যেতেই প্রিয় বলে উঠলেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, ও ভারতীয় নয়। ও হল মেক্সিকোর লোক। তবে আমার কী করবার আছে? তুমি দেশ থেকে লোক আনবে, তার কাগজপত্র তৈরি করে দেবে, তাকে গ্রীন কার্ড পাইয়ে দেবে। তারপর? সে একদিন সবকিছু অস্বীকার করে অন্যত্র পালাবে। এদিকেও শয়তান আছে, ওদিকেও আছে। তবে কী জান সন্তোষ? আগে আমার কাপড়ের ব্যবসা ছিল। ওদেশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় কিনে এনে এদেশে পঞ্চাশ ডলারে বিক্রি করতাম। ব্যাপারটা খুবই সাজে।'

'কিন্তু সবাই চায় নিজের পাওনা। আমি প্রত্যেক লোককে আশ্বস্ত করতাম যে তার পাওনা আমি চুকিয়ে দেব। কিন্তু 'দেব' বললে শুনছেটা কে? আগে দাও পরে কাজ। ভারতের ব্যাপার-স্বাপার তো জান। দেরি করিয়ে দিতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। একবার তো ছাড়পত্র হাতে পেতে বছর খুঁজে গেল। ততক্ষণে খরিদারের রুচি বদলে গিয়েছে। আসলে ক্রেতাদের নিয়ে আমরা গবেষণা বা সংবাদ সংগ্রহ কমই করি। দূতাবাসের লোকেরা আমাকে তাই বলেছিল। এখানে একটা কথা, ক্রেতাদের নিয়ে গবেষণা করলে আমি ব্যবসাটা করব কখন? আসল ব্যাপার হচ্ছে, ব্যবসা করাটা আমার ধাতে নেই। বলতে পার, ব্যবসা করাটা আমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কাজ। আমি যখন কাপড়ের ব্যবসা করতাম তখন দোকানে ক্রেতা এলে আমি লজ্জায় পড়তাম। মাঝে মাঝে আমি এমন ভান করতাম যেন আমিই দোকানে এসেছি জিনিস কিনতে। হুঁ, ক্রেতা গবেষণা! এ দেশের লোকেরা আমাদের নাচায়, বুঝলে সন্তোষ। চল না, আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি পটোম্যাক নদীর ধারে বসে তপস্যা করি।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার খুব পছন্দ হল, বোম্বাই ছাড়বার পর এত মিষ্টি কথা আমি শুনিনি। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি চাইলে আমি আপনার রাঁধুনির কাজে লেগে যেতে পারি।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোকের সে কী আনন্দ। তিনি বললেন, ‘মনে হচ্ছে সন্তোষ তুমি আমার কত দিনের চেনা। তুমি যেন আমার সংসারের একজন তোমাকে আমি থাকবার জায়গা দেব, যা জুটবে তাই খেতে দেব আর হাত খরচের জন্য অল্প কিছু টাকাও দেব।’

শোবার জায়গাটা দেখতে চাইলে তিনি আমাকে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম আমাকে যে ঘরে থাকতে দেওয়া হবে তা চাকর-বাকরের থাকবার মতোই একটা হবে। কিন্তু না, থাকবার ঘরটা সত্যিই ভালো বলা যায়, সাহেব যে রকম ঘরে থাকেন প্রায় সেই রকম বড়। ঘরের মধ্যে বড় সড় আলমারিও ছিল। আলমারি মানেই আমাদের মতো লোকের শোবার জায়গা। আমি তাই প্রথমেই আলমারির পাল্লা দুটো খুলে ভেতরটা দেখতে চাইলাম। ভেতরের অবস্থা দেখে আমি বললাম, ‘প্রিয়, এর তাকগুলো জিনিসপত্র রাখবার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু আমি যে হাত পা ছড়িয়ে এর ভেতর শুতে পারব তা কিন্তু মনে হয় না।’ আমার কথা শুনে প্রিয় একেবারে হেসে খুন। সে মন্তব্য করল, ‘সন্তোষ, তুমি বেশ হাসাতে পারো তো। জোকায়ও হার মানবে তোমার কাছে।’

পরে আমি যখন শুনলাম যে কেবল মাত্র আলমারিটাই নয়, গোটা ঘরটাই আমাকে দেওয়া হবে তখন আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমি আলমারির মধ্যে শুয়ে রাত কাটাই জেনে প্রিয় আরো অবাক হল। তার গর্তে বসা চোখ দুটো যেন নিশ্প্রভ মনে হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, ‘এইভাবে এরা আমাদের নাচায়। তোমরা থাকবার জায়গা বলে মনে নিচ্ছো বাধ্য হও, ওরা ধরে নেয় এর বেশি পাবার যোগ্য তোমরা নও।’

বেশ খানিকক্ষণ আমরা দুজন কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে থেকে এই দেশের লোকদের ব্যবহার সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম।

এই সময় নিচ থেকে কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকল। ডাকটা শুনে সে সচেতন হয়ে বর্তমান জগতে ফিরে এল। তারপর এ দেশের উচ্চারণ ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘হাই বব!’

আমিও প্রিয়র সাথে, নিচে গেলাম। আমেরিকান ভদ্রলোক বলল, ‘তোমার জন্য মেনুগুলো নিয়ে এসেছি দেখ।’

আমেরিকান ভদ্রলোকের পরনে ছিল চামড়ার জ্যাকেট, জিনসের প্যান্ট, রবার-সোলের জুতা। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে এখুনি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামবে। মেনু বইটা ছিল বেশ মোটা। বইটার মলাটে ছিল গৌফওয়ালা একটা মোটা লোকের ছবি। লোকটার মাথায় ছিল পালক লাগানো একটা টুপি। ছবিটা দেখে বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে যায়।

মেনুর বইটা হাতে নিয়ে প্রিয় সেটার খুব প্রশংসা করল। বব জানাল এই বইতে যে সব খাবারের কথা লেখা আছে সবগুলিই তার খুব প্রিয়।

আলমারির অতবড় একটা তাক নজরে পড়তেই বব জানতে চাইল ‘তাকের ওপর ওসব কী রাখা আছে? সেখানে খানিকটা চাল, পেতলের একটা থালা, একটা টির প্রদীপ রাখা ছিল। এবার খেয়াল হলে ভালো করে দেখলাম তাকটা বেশ সখসে। তাকের দিকে চোখ ফিরিয়ে প্রিয় যেন একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। ওখানে রাখা জিনিসগুলো সে সরিয়ে ফেলতে চাইল না। বব মন্তব্য করল, ‘দেখ ঠায়ে, তোমার মধ্যে আমি প্রাচ্যের ছোঁয়া খুঁজে পাই।’

ববকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রিয় অতি দ্রুত বলতে শুরু করল, ‘টাকা, শুধু টাকার খেলা।’ সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন একটা বাচ্চা ভোলাচ্ছে। ‘কিন্তু আমার কাছে তুমি টাকা চাইতে পারো না। লোকে তোমার কথা শুনলে ভাববে আমি ঝি এই রেস্টুরাঁর মালিক। কিন্তু আসল মালিক তো তুমি।’

আমাদের দেশে এই ভাবে কথা বলা হয় ভদ্রতা প্রকাশের জন্য। কিন্তু এতখানি সৌজন্য বোধ ববের সহ্য হল না। সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

দেখলাম, বৈরাগ্যের কথা বলে, ব্যবসায়ে অসফলতার কথা বলে, বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলে কী সুন্দরভাবে ওয়াশিংটন শহরে প্রিয়-র মতো লোক জাঁকিয়ে বসেছে। আর এই শক্তি দেখে আমি অতিভূত হলাম, তার বাচনভঙ্গির পটুত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তার কথার একশো ভাগ বিশ্বাসযোগ্য নয় বুঝেও লোকটিকে আমার ভালো লাগল, তার বলা কথাগুলি নিয়ে আমি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলাম, তার ব্যক্তিত্বে ঘরহস্যের কুয়াশা ছিল তা নিয়ে চিন্তা করলাম। লোকটার মধ্যে যে গুণ আমাকে আকৃষ্ট করল তা হল তার দৃঢ়তা। সাহেবের ফ্ল্যাট, আমার সবুজ রঙের স্যুট, হাবসি মেয়েটা, চারদিন ধরে শহরে আগুন জ্বলতে থাকা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যেও আমার কমন যেন মনে হল তার সান্নিধ্যে আমি অনেক বেশি নিরাপদ। ওয়াশিংটনে আসবার পর এই প্রথম নিজের মধ্যে একটা নিরাপত্তা বোধ অনুভব করলাম।

আমি যে তার ঘরে আশ্রয় নিলাম তা নয়, বলা যায় আমি ওখানেই থাকতে ইলায়াম। সাহেবের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে আমার জিনিসপত্রগুলো যে নিয়ে আসব তা তার মন চাইল না। ভয় হল, ওখানে ফিরে গেলে এমন কিছু একটা ঘটবে যে আমি ত্রিদিন কয়েদি হয়েই থাকব। সাহেব হয়ত তার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা চেয়ে সবেন, হাবসি মেয়েটা আমার সঙ্গে কোনোদিন ছাড়বে না আর আমাকেও হয়ত ঐ হাবসিদের সমাজের একজন হয়ে যেতে হবে। সাহেবের ফ্ল্যাটে কোনো মূল্যবান সম্পত্তি তো রেখে আসিনি। ঐ সবুজ স্যুটটা অবশ্য থেকেই যাবে। কিন্তু ...

ঠায়ে আমাকে সপ্তাহে চল্লিশ ডলার দিত। এছাড়াও তিন ডলার পঁচাত্তর সেন্ট। আমার প্রয়োজনের তুলনায় এ তো অনেক টাকা। অবশ্য খরচ বা প্রয়োজন আমার বাকি একটা ছিল না। আমি খুব ভালোভাবে জানতাম যে সাহেব, মানে আমার আগের মালিক এবং ঐ হাবসি মেয়েটা আমার অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনায় বেশ আশ্চর্য

হবেন। তবে কিছুদিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না সে কথা ভালোভাবে বুঝেছিলাম। প্রিয়র রেস্টোরাঁর কাজ খুব কঠিন ছিল না। তাছাড়া সারা দিন ব্যথাকলেও আমার মনের ফুর্তি ছিল যথেষ্ট।

শুরু থেকেই রেস্টোরাঁটা ভালো চলছিল। এ ব্যাপারে প্রিয়র উৎসাহ ছিল খুব হাতে বড় একটা মেনু বই নিয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ঢুকে ভুল ইংরেজিতে বলা ‘সন্তোষ, এ হল খুব সম্মানের চাকরি, সম্মানের।’ তার কথায় আমি বড় একটা কদিতাম না। আমি জানতাম যে কাজের মাধ্যমেই আমি আমার স্বাধীনতা অর্জন করছি। যদিও আমি লুকিয়ে ছিলাম বলা যায়, এবং সারাদিন তো বটেই, মারাত্তির পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হত তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে আমি নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের রেস্টোরাঁর অধিকাংশ বেয়ারাই ছিল মেক্সিকো দেশের লোক। তাদের মাথায় বেয়ারার টুপি লাগিয়ে দিলে তাদের ভালোই লাগত। তাদের হাঁচলা সবই ছিল ভারতীয় কর্মচারীদের মতো। আমি কিন্তু তাদের পছন্দ করতাম খুব একটা। আমার মনে হত তারা খুব ভীতু এবং একে অন্যের ভালো দেখা পাবে না। সবচেয়ে বড় দোষ হল এরা মোটেই বিশ্বাসভাজন নয়। খদ্দেরের টেবিল নিয়মাবলী ও গ্রীন কার্ডের গল্পই বেশি হত। কে গ্রীন কার্ড পেয়েছে, কে পোঁচলেছে, গ্রীন কার্ড পেতে গিয়ে কে প্রতারণা করেছে এসবই ছিল তাদের আলোচনা বিষয়বস্তু। প্রথম প্রথম আমি ওদের আলোচনার মাথামুণ্ড বুঝতাম না, পরে যখন বুঝলাম তখন আমি বেশ দমে গিয়েছিলাম কারণ আমি আমার মালিকের হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছি বলেই আমেরিকাতে বসবাস করছি আমার পক্ষে বে-আইনি যে কোনো সময় পুলিশ আমাকে ধরতে পারে, জেল খাটতে পারে, অসম্মান করতে পারে, এমনকি আমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত করতে পারে। এ তো এ বিরাট ঝামেলা, আমার গ্রীন কার্ড নেই, কীভাবে কার্ড পাওয়া যায় তাও জানা নেই এ বিষয়ে কার সাথে কথা বলব তাও জানা নেই।

এক সময় আমার কোনো গোপনীয় ব্যাপার বলে কিছু ছিল না। এখন অবস্থা তা নয়। বেশ কয়েকটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমি কারো সাথে কথা বলতে পারি না, যেমন, আমার কোনো গ্রীন কার্ড নেই অথবা আমি আগের মালিকের আস্থা ভঙ্গ করে এখানে এসেছি অথবা সেই হাবসি মেয়েটির সঙ্গে মেলামেলামে করে নিজেকে কলুষিত করেছি। কিংবা প্রতিশোধের ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। প্রিয়র আমি বলতে পারব না যে, কোনো ভারতীয়কে দেখলে আমি এক অজানা ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখি এবং কোনোমতেই এই রেস্টোরাঁ ছেড়ে আমি অন্যত্র যেতে পারব না। প্রিয়র সাথে প্রথম যেদিন পরিচয় হয়েছিল সেদিন থেকেই আমি ভাব করে আসছি যে আমি খুব শক্ত মনের লোক। প্রিয়র যখন দুর্বল হয়ে দার্শনিক কথাবার্তা বলে তখন আমি বুঝতে পারি আমার ভেতরটাও অশক্ত হয়ে আসছে এ যেন আত্মার অসুখ।

ফ্ল্যাটে থাকার চেয়ে রেস্টোরাঁ-তে থাকা অনেক বেশি কষ্টকর কারণ এখানে আমিই হলাম সর্বসর্বা। সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর আছে। এটা অবশ্য ঠিক যে এক সময় আমি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম এবং নিজের জন্য যা প্রয়োজন তা করতে চেয়েছিলাম। আগুন লাগার দিনগুলিতে আমার মনে আনন্দ হয়েছিল বলে আমার এখন অনুতাপ হতে লাগল, সাহেবের কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে চেয়েছিলাম বলে আমার এখন খারাপ লাগতে লাগল।

সময় গড়িয়ে চলল। শীত এল— তুষার পড়ল, তুষার গলল। তবুও রেস্টোরাঁ-র বাইরে যাবার সাহস আমার হল না। আমি দেখলাম ভবিষ্যৎ মানে হল একটা বিরাট গর্ত যার ভেতর আমি পড়ে যাচ্ছি। রাত্ৰিতে ঘুমোতে ঘুমোতে আমার শরীর এত গরম হয়ে যেত যে, ঘামে সারা বিছানা ভিজে যেত।

আমি সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিলাম প্রিয়-র ওপর। বাস্তবের সঙ্গে প্রিয়ই ছিল আমার সম্পর্ক-সূত্র। এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে এসে নানা গল্প শোনাত আমাকে। মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রেস্টোরাঁগুলোতে খেতেও যেত সে।

প্রিয় বলত, ‘জানো সন্তোষ, আগে জানতাম না যে খাবারের দোকান চালানোও ঈশ্বরের একটা সেবা। আজকাল আমার মনে হয়, বৈরাগ্যের পথে আমি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি।’ প্রিয়র এই ধরনের কথাবার্তা আমাকে আরো আকর্ষণ করত। রেস্টোরাঁ-র যে সব রাঁধুনি ছিল তাদের সাথে আমার ব্যবধান বাড়তে লাগল। তারা যখন গ্রীণ-কার্ড কিংবা অন্য চাকরির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করত তখন আমার মনে হত তাদের একটাই প্রশ্ন করি— কেন? কেন?

নিত্যকার উদ্বেগ ও ব্যায়ামের অভাবে আমার চেহারাও—যে জৌলুস ছিল তা হারিয়ে যেতে লাগল। আমার মুখে এমন কালো কালো ছোপ পড়ল যে কে বলবে আমি এক সময় সুন্দর ছিলাম। হারিয়ে যাওয়া সুন্দরির জন্য আমার কাঁদতে ইচ্ছা করত। এ যেন আমার গর্বের শাস্তি। যেদিন আমি সবুজ স্যুট কিনেছিলাম সেদিনই আমি এই শাস্তিকে ভয় পেয়েছি।

আমার চেহারা দেখে প্রিয় বলেছিল, ‘সন্তোষ, রোজ তোমার ব্যায়াম করা উচিত। তুমি এত শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? বোম্বাই-এর কথা মনে পড়ে বুঝি? না কি, পাহাড়ি অঞ্চলে রেখে আসা তোমার পরিবারের জন্য?’ মনে মনে তো আমি স্বীকার করি, কী বোম্বাই, কী পাহাড়ি অঞ্চল, ওসব তো আমার কাছে এখন অপরিচিত স্থান। আর একদিন প্রিয় বলল, ‘সন্তোষ চল, একটা হিন্দী সিনেমা দেখে আসি। আজ ওখানে ভারতীয়রাই যাবে। চাকর-বাকর থেকে শুরু করে অন্যেরা সকলে যাবে।’ প্রিয়র কথা শুনে আমি তো আঁতকে উঠলাম। আমি যাব বাইরে! না যাবার কারণটা তাকে আমি বলতে পারছি না আর সেও ছাড়ছে না। তার সঙ্গে যখন গাড়িতে উঠে বসলাম তখন আমার বুকের অস্থিরতা অসম্ভব বেড়েছে। একটু পরেই এমন রাস্তায় পড়লাম যেখানে কোনো বাড়ির দুয়ারে গ্যাস প্রদীপ জ্বলছে না। রাস্তার দুপাশে পোড়া বাড়িগুলো ছিল, জায়গায় জায়গায় ইট পাথর জমা করে রাখা ছিল,

পুড়ে যাওয়া সাইনবোর্ড গুলো স্তূপ করে রাখা ছিল। আবার ওপাশের চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছিল তীব্র বেগে। জীবনের পদচিহ্ন কেবল গাড়ি চলার মধ্যেই ছিল। সব কিছু দেখে আমার বমি উঠে আসতে লাগল। আমি প্রিয়কে বললাম, 'সাহেব, আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

তাকে সাহেব বলে সম্বোধন করে আজ আবার একটা ভুল শব্দ ব্যবহার করে ফেললাম। আগে এই শব্দটা সারাদিন অসংখ্যবার বলতাম কারণ তখন মালিকের সামনে আমার অস্তিত্ব ছিল খুবই নগণ্য। তবে তার মানে এই নয় যে আমি তার দাসত্ব করতাম, নিয়োগ কর্তাকে সম্মান দেখানোর জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করা হত। তার সাথে কর্মচারির সুসম্পর্কটাও বোঝানো হত এ শব্দের মাধ্যমে। তবে প্রিয়র সাথে এতদিন আমার সেই সম্পর্ক ছিল না। আমি তাকে নাম ধরেই ডাকতাম যেমন আমেরিকানরা একজন অন্যজনকে সম্বোধন করে। আজ 'সাহেব' বলে সম্বোধন করায় প্রিয় তার প্রত্যুত্তর দিল তার মানে, প্রিয়র কাছে কথাটার তাৎপর্য অন্যরকম। কথাটাকে সে দাসত্বের সমার্থক বলে মনে করে। আমার অনুরোধে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রেস্তোরাঁ-তে ফিরে এল। এর পর থেকে আমি কখনও তার নাম ধরে ডাকিনি।

আমার চেহারার সৌন্দর্য হারিয়ে গেলেও আমি সুপুরুষ ছিলাম, আমার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেও আমি মুক্ত পুরুষ হয়ে থাকলাম।

একদিন সন্ধ্যার বেশ খানিক পর রেস্তোরাঁর একজন বেয়ারা রান্নাঘরে আমার কাছে এসে বলল, 'বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি প্রশ্নান পাচকের সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। বেয়ারার কথা শুনে প্রিয় উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, তিনি কি আমেরিকান? শব্দদের জ্বালায় আর পারি না। ঐ বদমাসদের কাজ এটা। কেবল পরিচ্ছন্নতা আর স্বাস্থ্য। ওরা এসে যে কোনো সময় আমার রান্নাঘর পরিদর্শন করতে পারে।'

যিনি এসেছেন তিনি একজন ভারতীয় শুনে আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। তা হলে আমার আগের সাহেব এলেন। এরকম নিঃশব্দে চলে আসা তার এক স্বভাব। প্রিয় ভাবল তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে তার দোকানে খেয়ে দোকানের অন্তর মহলের খবর সংগ্রহ করতে। প্রিয় যদিও অন্য রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রায়ই খেয়ে আসে কিন্তু অন্য কোনো রেস্তোরাঁর মালিক তার দোকানে খেতে আসুক এটা সে চায় না। যাই হোক আমরা দুজনেই কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে ভদ্রলোককে দেখবার চেষ্টা করলাম।

প্রিয়র প্রশ্নের জবাবে আমি জানালাম যে ভদ্রলোককে আমি চিনি। উনি আমার পূর্বতন মালিকের বন্ধু, সরকারি অফিসে খুব উঁচু পদে কাজ করেন। ভদ্রলোক একাই বসেছিলেন এবং হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সম্প্রতি ওয়াশিংটনে

এসেছেন। তার মাথার চুলে, পোশাকে বোম্বাই-এর ছাপ খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল। তাঁর পরনে নীল রংয়ের একটা জামা ছিল। অবশ্য দোকানে নানা রংয়ের আলোতে সাদা জিনিসকেও নীল দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি এই দোকানে খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন। মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে আধ বোঁজা চোখে তিনি দাঁত খুঁটে চলেছিলেন। তাঁকে দেখে প্রিয় বলল, 'লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না এতটুকুও। তবে বড় সরকারি অফিসার কিনা, যাও একবার কথা বলে এস। তবে হ্যাঁ, তার আগে পাচকের নির্ধারিত পোশাক পরে নাও কারণ এতে আমাদের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।'

আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে প্রিয় ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বলল যে প্রধান পাচক একটু পরেই আসছে। আমি নিজের কামরায় গিয়ে চুলে তেল লাগিয়ে মাথা আঁচড়ে নিলাম। তারপর আমার সবচেয়ে ভালো প্যান্ট জামা পরে, পালিশ করা জুতা পায়ে গলিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখলে মনে হবে আমি এই শহরের একজন বাসিন্দা, এখানের পাচক মোটেই নই।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে তো আশ্চর্য হলেন। আমি অবশ্য আগের মতোই তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি অবশ্য কোনো কঠিন প্রশ্ন আমাকে করলেন না আর আমিও কথা বলতে খুব বেশি আগ্রহ দেখালাম না। আমি হাসতে ভদ্রলোকও হাসলেন। ওপাশ থেকে প্রিয়ও একটু মুচকি হাসল। ভদ্রলোকের অনুরোধে প্রিয় ওখান থেকে দূরে চলে গেল। এবার আমি নিশ্চিত যে আগের মালিক সম্বন্ধে উনি আমাকে প্রশ্ন করবেন।

কিন্তু না, উনি সে সব কোনো প্রশ্নই করলেন না। ক্রমাগতই নিজেদের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় করেই গেলাম। আমি ভালো আছি। তিনি ভালো আছেন। আমরা সকলে ভালো আছি এই সব তথ্য বিনিময় করেই সময় কাটল কিছুটা। তিনি যে কী বলতে চেয়েছিলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। শেষে আমার হাতে এক ডলার মানের দশটা টাকা বখশিস হিসাবে গুঁজে দিলেন। এ তো বখশিস নয়, পুরোনো দিনের স্মৃতির মাধুর্য। আগে এই পরিমাণ টাকা আমার কাছে খুব বড় ছিল কিন্তু আজকাল আর তা নয়। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিরোধিতা আশংকা করছিলাম তখন তিনি এত ভালো ব্যবহার করলেন যে আমার অস্বস্তি হতে লাগল।

রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয় আমাদের ওপর নজর রাখছিল। ভদ্রলোক যে আমার হাতে ডলার গুঁজে দিয়েছিল তা কিন্তু প্রিয়র চোখ এড়ায়নি। একটু পরেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে ও বলতে লাগলেন, 'সন্তোষ ছেলেটি নির্ভরযোগ্য। ওর এখানে থাকবার জন্য আমি একটা পুরো কামরা ওকে দিয়েছি। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে আমি একশো ডলার মানের এক হাজার টাকা দিই মাইনে হিসাবে।'

প্রিয়র কথা শুনে আমি তো অবাক। যারা সরকারি চাকরি করে তারাও এত টাকা মাইনে পায় না। বোম্বাই থেকে আগত ভদ্রলোকও এই কথা শুনে কম অবাক হলেন

না। তাঁর মূল্যবান একটি ডলার এইভাবে বেকার খরচ হয়ে গেল বলে তাঁর বোধহয় অনুতাপ হতে লাগল।

সন্ধ্যার পর রেস্টোরাঁ বন্ধ করে প্রিয় আমাকে বলল, ‘জানো সন্তোষ, ঐ মিথ্যা কথাটা কেন বললাম তখন? লোকটাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল ও আমার ক্ষতি করতে এসেছে। যাই হোক, এ বছর বড়দিন উৎসব পার হয়ে গেলেই তোমার মাইনে বাড়িয়ে পঁচাত্তর ডলার করে দেব সপ্তাহে। আসলে কিছু বাঁধা খরচ তো থাকেই। সেই সব মিটিয়ে লাভ করে তো তোমাদের মাইনে বাড়ানোর কথা ভাবতে হয় আমাকে। তবে মিথ্যা যখন বলেই ফেলেছি তার কিছুটা তো বাস্তবে পালন করা উচিত। আমি এখন থেকে তোমাকে সপ্তাহে ষাট ডলার করে দেব।

প্রিয়র কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দেখ প্রিয়, পঁচাত্তর বা ষাট ডলার যাই বল না কেন, তুমি যদি আমাকে একশো পঁচিশ ডলার না দাও তাহলে আমাকে অন্যত্র যেতেই হবে।’

আমার কথা শুনে প্রিয়র মুখটা কালো হয়ে গেলেও কোনো রকমে হেসে সে বলল, ‘না, না, তার কোনো প্রয়োজন নেই।’ এই সপ্তাহের শেষে আমি পুরো একশো ডলার পেলাম। প্রিয়র স্বভাব এত ভালো ছিল যে এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার আর কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

এ হল আমার জয়। জয়লাভের পর মনে হল বিজয়ী না হলে আমার কপালে দুঃখ ছিল। স্বাধীনতা লাভ করে আমার এতদিন মনে হয়েছিল মৃত্যু যে আমার দুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে, তা নয়। মৃত্যু আমার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এবার মনে হল, আমি নতুন জীবন লাভ করলাম। আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি সবগুলো আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এতদিন আমি ভয়ে বাড়ি থেকে বের হইনি, রাস্তায় পা রাখিনি, কোনো বন্ধুর সাথে মন খুলে কথা পর্যন্ত বলিনি। আমি নতুন কাপড় জামা কিনতে পারতাম কিন্তু তখন কে দেখত? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে দেখা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। রাস্তার লোকেদের তো আর চিৎকার করে ডেকে জামা দেখাতে পারি না। যাই হোক, নিজেকে নিয়েই ছিল আমার পৃথিবী।

রেস্টোরাঁর কয়েকটা বাড়ি পরেই একটা কেকের দোকান ছিল। দোকানটা যে চালাত সেই মেয়েটা জাতিতে জার্মান কিংবা সুইস ছিল। আমাদের রান্নাঘরে ফিলিপাইনসের একটা মেয়ে কাজ করত। এই মেয়েটার সাথে আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েদের সাদৃশ্য ছিল। মেয়ে দুটোর কোনোটাই চোখে পড়ার মতো নয়। তবুও আমার মাঝে মধ্যে মনে হত ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে বেশ ভালো হয়। পর মুহূর্তে আমি সাবধান হয়ে যেতাম। জার্মান মেয়েটা যদি এক চড় মারে তো আমার পিঠ ভেঙে যাবে। যাই হোক বন্ধুত্ব করতে যাওয়া মানেই দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া। আমি একটা জিনিস শিখেছিলাম, মেয়েরা খেলার সাথী মোটেই নয়।

তাদের ওজন একশো পাউন্ডের ঢের ঢের বেশি এবং একবার যদি ঘাড়ে চাপে তো এই ওজন বয়েই বেড়াতে হবে ।

যাই হোক, বেতনের ব্যাপারে জয়লাভ তো হল । কিন্তু যে কোনো জয়ের স্বাদ দিন দুয়েক থাকে । আমার বেলায় ঠিক তাই হল । জয়ের উন্মাদনা কেটে যেতেই আমার সেই পুরোনো ভীতি ফিরে এল— অবৈধ প্রবেশের ভীতি, প্রাক্তন মালিকের ভীতি এবং সেই হাবসি মেয়েটার ভীতি । অনুভব করলাম, আমি যে এতদিন কঠোর পরিশ্রম করেছি তা কিন্তু এই সামান্য বেতন বৃদ্ধির জন্য নয় । যা আমি চেয়েছিলাম তা হল সৌভাগ্য । কিন্তু অদৃষ্টে না থাকলে সৌভাগ্য আসে না । আবার সৌভাগ্য হল মায়া, বিভ্রম ।

তবুও আমি এই মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম । ভেবে দেখলাম, অদৃষ্ট নিজের থেকে যদি আমাকে কিছু না দিয়ে থাকে তাহলে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়ে সৌভাগ্য আমাকে পেতেই হবে । প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঠিক করলাম এইভাবে আত্মগোপন করে থাকলে চলবে না । পরদিন থেকে আমি রাস্তায় নামলাম, খানিকটা পথ হাঁটলাম । পরের দিন আরো একটু দূরে গেলাম । এইভাবে আমি একদিন সেই সবুজে ঘেরা গোল পার্ক পর্যন্ত যাব বলে ঠিক করলাম । ওয়াশিংটনে এসে প্রথম দিন আমি তো ঐখানেই একটা ফোয়ারা দেখেছিলাম, আর কিছু লোককে দেখেছিলাম যারা হিন্দুদের মতো পোশাক পরেছিল, সংস্কৃত ভাষায় দুর্বোধ্য কী সব যেন বলছিল এবং রেড ইন্ডিয়ানদের ভঙ্গিতে নাচ করছিল ।

একদিন সত্যি সত্যিই আমি রাস্তা পার হয়ে ঐ পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসলাম । ওখানে কয়েকজন হাবসি বসেছিল, শাড়ি পরা । পার্কের খালি পা কিছু নর্তক-নর্তকী ছিল । দিনটা ছিল বেশ গরম । আমি বিকেলের দিকে যখন পার্কে পৌঁছলাম, তখন মনে হল সব লোকই যেন অলস হয়ে পড়েছে । ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করার মতো মানসিক অবস্থা কারো নেই । প্রথম দিন ঐ পার্কটাকে কী রকম রহস্যময়, দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল । আজ মনে হল সেটা খুব সাধারণ এবং অলস লোকদের বিশ্রামের স্থান । রাস্তার মোটরগাড়ি, দোকান, গাছ, পুলিশের লোক— সবকিছুই মনে হল যেন অকেজো, অপ্রয়োজনীয় । আমার মনে হল, বিশ্ব সংসারের সব লোকজন কোথা থেকে এসেছে অথবা ঐ শত শত মোটরগাড়ি কোথায় চলেছে তা আমার জানা । আরো মনে হল, আমি যেমন এত কিছু জানি, পৃথিবীর অন্য লোকেরাও তা জানে । এই চিন্তাটা আমার মনে এত স্বস্তি আনল যে আমি রোজ দুপুরের পর ওখানে যেতাম এবং সন্ধ্যার অনেক পর প্রিয়র কাছে ফিরে আসতাম ।

একদিন বিকেলে এই রকম বসে আছি । হাবসিরা আছে, খালি পা নর্তক-নর্তকীরা আছে, গায়ক-গায়িকারা আছে, পুলিশ আছে, এমন সময় আমি সেই হাবসি মেয়েটাকে দেখলাম । ঠিক করলাম, যেমন বসে আছি, তেমন থাকব । সেই সময় তার চোখ পড়ল আমার ওপর । আমাকে দেখে সে একটু হাসল । পর মুহূর্তে

আমাকে চিনতে পেরে তার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। পুরোনো রাগে তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তার বিশাল বপু পরনে আঁটোসাঁটো প্যান্ট। সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাকে দেখে আমার মনে হল ধ্বংস ও মৃত্যুর দেবী বহুভূজা মা কালী এগিয়ে আসছেন। আমি আর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম। পেছন ফিরে এক বারের জন্যও ফিরে না তাকিয়ে কেবল ছুটলাম। অবশেষে প্রিয়র রেস্টোরাঁ-য় এসে দম নিলাম।

প্রিয় তখন ব্যবসায়ের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। যখন সে একমনে হিসাব করে তখন তাকে বয়স্ক মনে হয়। তবে এর অন্য একটা দিকও আছে। কোনো বিষয়েই তার দুর্ভাবনা নেই, জীবন তার জন্য নতুন কোনো চমক আনতে পারে না, কারণ তার তো সব দেখা হয়ে গিয়েছে। এর জন্যই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

আমি এসেছি বুঝতে পেরে সে মুখ তুলে বলল, ‘সন্তোষ, তোমার এক বন্ধু তোমার জন্য একটা প্যাকেট রেখে গিয়েছে’।

বাদামি রংয়ের কাগজে মোড়া বড় একটা প্যাকেট প্রিয় আমার হাতে তুলে দিয়ে আবার হিসাবের কাজে মনোনিবেশ করল। সংখ্যা, অংক ইত্যাদি পেনে লোকটা কেমন যেন একটা শান্তি লাভ করে মনে হল। এইভাবে সে দিনের পর দিন খাতা ভরিয়ে তোলে, একটা খাতা শেষ হলে আবার নতুন একটা খুলে ফেলে।

আমার ঘরে গিয়ে প্যাকেটটা খুলতে শুরু করলাম। বাদামি রংয়ের কাগজের তলায় কাগজের শক্ত বাক্স ছিল। সেটা খুলে ফেলার পর নরম কাগজের একটা প্যাকেট বের হল। সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই যা বেরিয়ে এল তা হল, একটা সবুজ রংয়ের স্যুট।

আমার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। তবে সুখের কথা যে রান্নাঘরে আমার যা কাজ আছে তাতে গভীর রাত পর্যন্ত অন্য কিছু ভাববার অবকাশ নেই। আমি দৌড়ে নিচে গেলাম। অবশ্য একটু পরে আবার ওপরে উঠে এলাম। এখন তো আমি একা। দুর্ভাবনার হাত থেকে এখন মুক্তি পাই কী করে? আমি তো পালাতে পারিনি, আমি তো স্বাধীন হতে পারিনি, আমি তো পরিত্যক্ত, আমি নগণ্য, আমিই নিজেকে তুচ্ছ করে তুলেছি। তবে আমার ফিরে যাবার রাস্তাও খোলা নেই।

সকালে আমার সাথে দেখা হলে প্রিয় বলল, ‘সন্তোষ, তোমার শরীর ভালো নেই মনে হচ্ছে।’ এই হচ্ছে মুশকিল। প্রিয় একমাত্র লোক যার সঙ্গে আমি কথা বলি। আমার সম্বন্ধে তার এত চিন্তা দেখে আমি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলাম। মনে হল, আমি কেঁদে ফেলব। এই সময়ে আমি চাইছিলাম সারা পৃথিবীটাই একেবারে গলে চোখের জলে রূপান্তরিত হয়ে যাক। কোনোমতে আমি বললাম, ‘সাহেব, তোমার কাছে আমার আর থাকা হবে না।’

কথাগুলো যে আমার অন্তরের তা নয়। ওগুলো হল মুখের কথা, বেদনার ও অশ্রুর ভাষা। আমার কথা প্রিয়র মনে কোনো দাগ কাটল বলে মনে হল না, কোনো রকম বিস্ময় প্রকাশ না করে সে জানতে চাইল এরপর আমি কোথায় যাব। অন্য জায়গা ভালো হবে বলে আমার মনে হয় কিনা সে জানতে চাইলে আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারলাম, ‘এখানে আমার অনেক শত্রু আছে।’

আমার কথা শুনে প্রিয় হাসতে লাগল। সে বলল, ‘সন্তোষ, তুমি একটা জোকার। তোমার মতো লোকের আবার শত্রু থাকতে পারে নাকি? তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে তাদের কী লাভ? শত্রু তো থাকবে আমার মতো লোকের। তোমার বৈরিতা করবার কেউ নেই বলেই তুমি সুখী। আর সেই জন্যই ছোট, ছোট, ছুটতে থাকো।’ কথাগুলো বলার সময় সে হাতের মুঠি দিয়ে ছুটবার ভঙ্গি ব্যক্ত করল।

আমার মনে হল সব কিছু খুলে বললে বুকটা হালকা হবে। আগে যার কাছে চাকরি করতাম তার কথা, আমার পালিয়ে যাবার কথা, সবুজ স্যুটের কথা সবই তাকে বললাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বলল, ‘এসব তো আমি আগেই জানতাম।’ হাবসি মেয়েটার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বললে প্রিয় অত্যন্ত সরল মনে প্রশ্ন করল, ‘তা হলে সমস্যাটা কোথায়? তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করলেই তো সব গোল মিটে যায়। তখন তুমি আইন অনুযায়ী এদেশের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে, স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পেয়ে যাবে।’

আমি তার কাছ থেকে এরকম একটা আশ্বাস পাব ভাবিনি। সে কি ধরে নিয়েছে সারাটা জীবন আমি নিজের কথা ভেবেই কাটাব? আমি বললাম, ‘কী করে হয়? দেশে আমার স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে।’

প্রিয় মোটেই দমবার পাত্র নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘সে তো থাকতেই পারে। সে প্রসঙ্গ উঠছে কেন? এটাই এখন তোমার দেশ, তোমার বাড়ি। তোমার যাতে মজল হয় তাই করা ভালো নয় কি? এসব হাবসি টাবসি নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না। অবশ্য তোমার যদি তাকে মনে ধরে। এটা বোম্বাই নয়। এখানে তুমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও কেউ তোমার দিকে তাকায় না। তুমি কী কর, তা নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই।’

কথাটা সঠিক বলেছে প্রিয়। এখানে আমি নিজেই নিজের মালিক, আমার যা মনে আসবে আমি তা করতে পারি। আমি পুরোনো মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। আমি পুলিশের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিতে পারি যে আমি বে-আইনিভাবে এদেশে এসেছি, আমাকে বোম্বাইতে ফেরত পাঠানো হোক। আমি পালাতে পারি, আত্মগোপন করতে পারি, গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরতে পারি, দোষ স্বীকার করতে পারি, আত্মসমর্পণ করতে পারি। এখানে আমি সঙ্গীহীন, তাই যা খুশি তাই করতে পারি। কিন্তু কী করব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। আমার বোধ শক্তি ফিরে আসছিল, আমি জীবনটাকে উপভোগ করতে চাইছিলাম, কিন্তু দেখলাম উপভোগ করার মতো কিছুই নেই। খালি হওয়া মানেই মন ভারী

হওয়া নয়। বলা যায়, মন শান্ত হওয়া। খালি হওয়া মানে পরিত্যাগ করা। আমার কথা শুনে প্রিয় আর কথা বাড়াল না। সকালের দিকটায় ওর খুব কাজ থাকে। আমি আমার কামরায় গেলাম। কামরাতে মালপত্র আগেও বিশেষ ছিল না, এখনও নেই। আমি ছেড়ে চলে গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘরে অন্য কেউ আসবে। অবশ্য আমি ঘরটাকে আপন বলে কখনও ভাবিনি। এই ঘরের দেওয়ালগুলো খুব পরিষ্কার ছিল, আমিও পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করেছি হয়ত এই মুহূর্তের কথা ভেবে।

ঐ খানেই দাঁড়িয়ে আমি আমার জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। কোন্ সেই মুহূর্ত, কোন্ সেই বিশেষ কাজ যা আমাকে এই কামরায় এনে হাজির করেছিল? হাবসি মেয়েটার সাথে যখন আমি অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, নাকি সেই আমেরিকানটা যে রাতের খাবার খেতে এসে আমার আগের সাহেবকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করেছিল? সেই মুহূর্ত থেকেই আমার আগমনের সূত্রপাত হয়েছিল? পুরোনো সাহেবের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার মুহূর্ত, নাকি— প্রিয়র সাথে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্ত, নাকি— আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সবুজ রংয়ের স্যুট কেনার মুহূর্ত— কোন মুহূর্তটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল আমার এখানে আসার বীজটি? হয়ত আমি যখন বোম্বাইতে ছিলাম কিংবা পাহাড়ি শহরে কুলির কাজ করতাম তখনই আমার আমেরিকা আগমনের সূত্রপাত ঘটেছিল। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত যে এই কৃতিত্বের দাবি করতে পারে, তা নয়। অসংখ্য কাজের ফলাফলে আমি এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। এখন আর নতুন পথে এগিয়ে যাওয়া নয়, এবার থামবার পালা। কিছু করব না ঠিক করে যখন ছাদের দিকে আর খেলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি এমন সময় আমার ঘরে যে ব্যক্তিটি এল তার নাম প্রিয়। সে আমাকে দেখে বলে উঠল, 'আমি তোমার কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আর কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবে? গোটা ঘরটা ও বাথরুমটা ভালো করে দেখে নিয়ে সে জানতে চাইল আমার শারীরিক কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

এরপর সে আমার বিছানার এক প্রান্তে এসে বসলে আমিও বুঝতে পারলাম লোকটিকে আমার ভালো লাগে। একটু পরেই তার উদ্বেগ নিয়ে আমি মজা করলাম। আরো খানিকপর দেখলাম আমরা দুজনেই হাসছি।

এক সময় তাকে বললাম, 'ভাবছি, আজ সকালটা আমি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটব'। প্রিয় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই, হাঁটলে তোমার খিদেটা চাঙ্গা হবে, তোমার এই ক্লান্তিভাবটাও কেটে যাবে।'

রাস্তায় হাঁটা এখন আমার কাছে খুব সোজা একটা কাজ। পথ চলতে চলতে আমি ভাবলাম, হিন্দুদের মতো পোশাক পরা লোকগুলো যদি সত্যিকারের হত! তা হলে আমি ওদের দলেই ভিড়ে যেতাম। কী মজা হত তখন! রাস্তাই হত আমাদের জীবন, দুপুরে হয়ত কোনো একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতাম, বেলা পড়ে এলে আকাশটা যখন সোনালি রং ছড়াত, তখন হয়ত আমরা কোনো গ্রামে

পৌঁছতাম। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত আন্তরিক আপ্যায়ন, বিশ্রাম আর সুস্বাদু খাবার। রাতে আমরা আগুনের পাশে সব গোল হয়ে বসতাম। কিন্তু এসব আমি কী ভাবছি? এসব তো অন্য জন্মের কাহিনী। পার্কে যে লোকগুলোকে দেখেছিলাম তারা সব শহুরে, টেলিভিশন ছাড়া ওদের এক দণ্ডও চলে না, ওরা আবার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ফকিরের মতো জীবন যাপন করতে পারে নাকি? আমার কথা আলাদা। টেলিভিশনের কৃত্রিম দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো টান নেই। আমি তো এই শহরে একেবারে একা, কোনো সঙ্গী-সাথী আমার নেই। আমি কী করলাম, না করলাম তাতে কারো কিছু যায় আসে না।

ফোয়ারা আছে যে পার্কটাতে সেটা আমার কাছে যেমন রহস্যময় ছিল তেমন ছিল আমাদের বিশাল অট্টালিকাটা যার মধ্যে একটা ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম। কিন্তু এখন সেটার মধ্যে আমি কোনো জাদু টান খুঁজে পাই না। মনে হয়, এ বাড়িটা কী এমন অসাধারণ? কাঁচের দরজা, সাদা মার্বেল, মার্বেলের সিঁড়ি, কার্পেট, গদি-আঁটা চেয়ার, নিচু টেবিল, কাগজের ফুল, নীল দরজা, চলমান সিঁড়ি এসব কি মানুষের মনে জাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারে? চোখ অভ্যস্ত হলেই এ সব হল মামুলি। প্রতি নিয়ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার মতো কিছু নয় এসব। আমি এখন পা চালালাম একটি বিশেষ বাড়ির দিকে। বাড়ির বারান্দায় ছাদটাতে একটা কৃত্রিম আকাশ তৈরি করে ছোট ছোট তারার আলো দিয়ে সেটাকে সাজানো হয়েছিল। নকল আকাশে ছিল লাল, ধূসর ও সোনালি রংয়ের ছড়াছড়ি। ঐ তো এসে গিয়েছি আমার প্রার্থিত জায়গায়। একটা ফ্ল্যাটের দরজায় হাত রেখে আমি ঘন্টা বাজালুম। হাবসি মেয়েটা দরজা খুলল। সে এই বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। ভেবেছিলাম এই ফ্ল্যাটটা আমার সাহেবের ফ্ল্যাটের মতোই হবে। কিন্তু এক নজরেই বুঝে গেলাম এখানে একেবারে টেলিভিশন জীবন। ভেবেছিলাম মেয়েটা আমার ওপর খেপে আছে। তাকে অবশ্য তা মনে হল না, বরং আমাকে দেখে সে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এজন্য অবশ্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। সে প্রশ্ন করবার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?’

ব্যস, আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

প্রিয়কে সব কিছু বলতে সে মন্তব্য করল, ‘সন্তোষ তুমি ভালোই করেছ। এখন থেকে তুমি একজন স্বাধীন নাগরিক হয়ে গেলে। নাগরিক কম কথা! তুমি এখন কত কিছু করতে পারবে, কেউ নিষেধ করবে না।’ প্রিয় খুশি হয়েছে জেনে আমিও খুশি হলাম।

আমি এখন এদেশের নাগরিক, এ দেশে আমার বসবাস বৈধ। ওয়াশিংটনেই আমি থাকি এবং প্রিয়র কাছেই আছি। তবে আগে আমাদের দুজনের মধ্যে যে গল্প হত আজকাল তা আর হয় না। রেস্টোরাঁ এক জগত, পার্ক ও সবুজ রাস্তা হল অন্য এক

জগত । পুড়ে যাওয়া ইটের বাড়ি, ভেঙে যাওয়া পাঁচিল, আগাছা ভর্তি বাগান, হাবসি ছেলেমেয়েরা কোনোদিন যায় না এমন শিশু উদ্যান আর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি বাড়ি সেখানে আমি থাকি— এই হল আমার তৃতীয় জগত ।

এ বাড়িটার গন্ধ অদ্ভুত । সব কিছুই বিচিত্র । কিন্তু আমি এদের স্বজাতি নই বলেই রক্ষা । ইংরেজি ভাষা, রেডিও, টেলিভিশনের ওপর আমার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে । দেওয়ালে ঝোলানো হাবসি খেলোয়াড়, দৌড়বীর, গায়ক, গায়িকার ছবির দিকেও আমি আজকাল তাকাই না । আমি আজকাল আর কিছু বুঝতেও চাই না, শিখতেও চাই না ।

আমি এক অতি সাধারণ লোক যে নিজের চোখে সব কিছু দেখতে চায়, নিজের হাতে সব কিছু করতে চায়, এখন মনে হচ্ছে, আমি অনেক জন্ম পার হয়ে এসেছি, আর নতুন জন্ম চাই না । এখনও মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে ঐ ফোয়ারাওয়ালা পার্কে যাই কিন্তু নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে যেন একটা কাঁচের দেওয়ালের দূরত্ব আছে মনে হয় । একদিন আবার আগুন লাগার গুজব শোনা গেল এবং আমাদের বাড়িতে সাদা রং দিয়ে কেউ লিখে দিয়ে গেল— ‘ভাই আত্মা ।’ ভাই কার ভাই, কীসের ভাই? আগে আমি নিজেকে প্রবাহের অংশ মনে করতাম । এখন আয়নায় নিজেকে দেখে স্বাধীন হবার ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । এই স্বাধীনতা-বোধ আমাকে বুঝিয়ে দিল আমার একটা শরীর আছে, আর আছে একটা মুখ । শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য খাদ্য ও বস্ত্র লাগে । কিন্তু ঐ মাত্র কয়েকটা বছর । তারপর তো সব শেষ ।

BanglaBook.org

বল, কাকে হত্যা করতে হবে?

আমার ভাই বোধ হয় এক বাজে দিন দেখে বিয়ে করল। সকাল থেকেই দিনটা ছিল ঠাণ্ডা ও স্যাঁত-সেঁতে। গ্রামগুলো সেদিন সবুজ না হয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল কারণ কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল। ছোট নদীগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন দুধের প্রবাহ। নদীর দুধে অবশ্য নানা আবর্জনা ভেসে যাচ্ছিল। যে দিকে তাকাও শুধু বৃষ্টির জমা জল, সূর্যও কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। সূর্যের আলো পড়লে রাস্তায় জমা জল শুকিয়ে যেত অনেক আগেই।

ট্রেনের ভেতরটা গরম কিন্তু বন্ধ জানালার ওপর দিয়ে বৃষ্টির ধারা নামছে। যাত্রীদের শরীর থেকে এবং পোশাক থেকে একটা বাজে গন্ধ বের হচ্ছে। আমি যে স্যুটখানা পরে আছি সেটার থেকেও একটা বাস্তব পচা গন্ধ বের হচ্ছে। স্যুট বলতে তো আমার এই একটাই। বহুদিনের পুরোনো স্যুট। বলা যায়, যখন থেকে টাকার চল শুরু হয়েছে ততদিনের পুরোনো। ট্রেন ছুটে চলেছে। গ্রামগুলো আসছে আর চলে যাচ্ছে। কখনও দূরে সঙ্গীহীন একটা বাড়ি। ভাবি, যদি ঐ বাড়িটা আমার হত! ওখানে বসে বসে বৃষ্টি দেখতে আর ছুটে যাওয়া ট্রেন দেখতে কী ভালোই না লাগত! বাড়িটা চকো পেল দৃষ্টির বাইরে। এবার চোখের সামনে দৌড়ে এল একটা আস্ত বিরাট গৃহ। সেখানে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। সব কিছুই বাদামি রংয়ের। সর্বত্র ইট, প্লাস্টা আর ঢালাই এর ছড়াছড়ি দেখে আমার মনটা একেবারে দমে গেল।

ফ্রাংক লম্বা ও ছিপছিপে, মাথায় তার টাক পড়তে শুরু করেছে। কী সুন্দর টুইডের একটা জ্যাকেট পরে সে আমাকে দেখছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার সাহচর্যে থাকলে ফ্রাংককে বেশ খুশি দেখায়। আমাদের দুজনকে লোকে যখন একসঙ্গে দেখে তখনও ফ্রাংক খুশি হয়। ফ্রাংক লোকটি ভালো। সে আমার বন্ধু হলেও বলতে কুণ্ঠা নেই ভেতরে ভেতরে সে বেশ অহংকারী। আমার সঙ্গে তার আচরণ এত বিনম্র যে আমার উপস্থিতিতে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র বলে জাহির করে। সে প্রাণখুলে হাসতে পারে না। এর কারণ হয়ত সে খুব জ্ঞানী এবং সুখী। তার পায়ের জুতা পুরোনো হলেও বেশ চকচকে। মানুষ যেমন প্রার্থনা করে আনন্দ পায়, সেও তেমনি প্রতি সন্ধ্যায় জুতা পালিশ করে। তার উপস্থিতিতে আবার নিজেকে ছোট মনে করে দুঃখ পাই কারণ আমি কোনোদিন তার মতো জ্ঞানী কিংবা

সুখী হতে পারব না। তবুও সারা পৃথিবীকে ছাড়লেও ফ্রাংককে ছাড়া আমার চলবে না। সেই তো আমার একমাত্র বন্ধু।

ভেজা জানালার ওপর আঙুল দিয়ে একটা ছোট ছেলে কিছু একটা লিখছে। লেখাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাচ্ছে। ছেলেটার সাথে তার মা আছে বলে সে খুব নিশ্চিত। ট্রেন থামলে তারা কোথায় যাবে তা ছেলেটা জানে। ট্রেন থেমে যাবার মুহূর্তটা আমার একেবারে ভালো লাগে না। ট্রেন স্টেশনে ঢুকলেই হল, সবাই নামবার জন্য ব্যস্ত। জাহাজের বেলায় সেই একই চিত্র। জেটি আসছে দেখলেই হল সবাই নিজ নিজ মালপত্র পিঠে তুলে নিচ্ছে। প্রত্যেকের কাছে মালপত্রের ব্যাগ আছে, আবার প্রতিটি ব্যাগ দেখতে আলাদা। ট্রেন বা জাহাজ থেকে নামবার আগে সকলেই এত ব্যস্ত যে অন্যের সাথে কথা বলবার অবকাশ নেই। তার একটাই কারণ তারা তাদের গন্তব্যস্থল জানে। এই দেশে আসার পর থেকে আমি এই কাজটা এখনও রপ্ত করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, আমি জানি না আমি কোথায় যাব। আমি কোথায় যাব তা একেবারেই অনিশ্চিত।

আমি চলেছি আমার ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কিন্তু আমি জানি না স্টেশনে পৌঁছলে কোনো বাস ধরতে হবে, নাকি আর একটা ট্রেন ধরতে হবে। কোন্ রাস্তা ধরে কোন্ তোরণের তলা দিয়ে আমরা যাব। কোন্ দরজা খুলে কোন্ কামরায় ঢুকব তাও জানা নেই আমার।

আমার ভাইয়ের কথা বলতেই ঠিক এমনি একটা বৃষ্টি হেঁচকি কিন্তু গ্রীষ্মের দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও আকাশটা ছিল কালো, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি আসছিল। দিনের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজ আসছিল, ঠিকানা বৃষ্টির জল পড়ে মাটিটা কেমন হলুদ রংয়ের মনে হচ্ছিল, সবকিছু সাদাসেঁতে, চটচটে লাগছিল। গরুর গাড়িটা বাড়ির কোণে পড়েছিল, গাধাটা বাড়ির পেছনের গোয়ালে বাঁধা ছিল, গোয়ালেও জল আর কাদা। নতুন কাটা আখ, পুরোনো শুকনো ঘাস সব গোবর মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। এত কিছুর মধ্যে গাধাটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা রান্নাঘরে কিছু একটা বানাচ্ছে কিন্তু ভিজে কাঠ বলে খাবারে ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে যাবে। এমন একটা দিনে কি খাই-খাই করা ভালো লাগে? কাদা, গরম আর ধোঁয়ায় খাবার ইচ্ছাটাই চলে যায়। বাবা তো দোতলায় আছেন। নিচে এত ধোঁয়া হলেও ওপরে কিন্তু বেশ মশা আছে। বাবার গায়ে যে মশাগুলো বসছে তিনি তা হাত দিয়ে তাড়াচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে খুব গম্ভীর কোনো বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন না। বারান্দায় রাখা দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে কালো আকাশ আর আখের খেত দেখে চলেছেন। অন্য একটা ঘরে আমার ভাই মেঝেতে শুয়ে আছে।

যে ঘরটায় আমার ভাইটি শুয়ে আছে, সেটাতে আসবাব বা জিনিসপত্র কিছুই নেই। তুমি একটা ঘর বানিয়েছ কিন্তু ঘরে রাখবার মতো কিছু নেই। কী রকম

একটা বিশী অবস্থা সেটা! ঘরের মধ্যে রয়েছে সামান্য কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু পেরেক আর একটা ক্যালেন্ডার। চিনির একটা খালি বস্তার ওপর ময়দার একটা খালি বস্তা পেতে ভাইটি আমার শুয়ে আছে। তার ছোট মুখখানিতে অসুস্থতার ছাপ একেবারে স্পষ্ট। ম্যালেরিয়াতে সে ভুগছে। এখন কাঁপ চলছে, ঘাম এখনও আসেনি। আমরা কী বলছি সে বুঝতে পারছে না। সে যা বলছে তা আমাদের কাছে অর্থবহ নয়। তবে সে একটা কথা বলছে যে, খুব ভারী অথচ মসৃণ কিছু একটা তার শরীরে ঘটে চলেছে।

মনে হয় তার জীবন শেষ হয়ে আসছে। তবে বয়সে এত ছোট, এত নিষ্পাপ একজন কষ্ট পাবে আর আমাদের মতো লোকেরা সুস্থ সবল থাকবে এটা উচিত নয়। সে কত সুন্দর। যদি সে বড় হয় তাহলে সে নাম করা চিত্রতারকার মতোই দেখতে হবে। ঐ ঘরটার সৌন্দর্য আমার চোখে আলাদা যদিও খালি ঘর, দরজা-জানালায় ফাঁক দিয়ে জোলা বাতাসের আগমন, উঠানের কালো কাদা, ধোঁয়ার গন্ধ, মা এবং আসন্ন রাত্রি কোনোটাই আমার পছন্দ নয়।

আমার ভাইটি বড় হয়ে যাবার পরেও আমি কিন্তু ঐ দিনের ছবিটা ভুলতে পারিনি। পরবর্তীকালে আমরা গরুর গাড়িটা বিক্রি করে লরি কিনেছি, পুরোনো বাড়ি ধূলিসাৎ করে সুন্দর রং-করা নতুন বাড়ি বানিয়েছি। আমার এই ভাইটিকে আজও আমি সেই চোখেই দেখি— ছোট, অসুস্থ, কিন্তু সুন্দর। আমার জন্যই তো ভাই এত কষ্ট পেয়েছে। যদি তাকে কেউ কষ্ট দেয় তাকে আমি এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পিছ-পা হব না। আমি নিজের জন্য ভাবি না, আমার নিজের জীবন বলতে কিছু নেই।

যতদূর মনে পড়ে সালটা ছিল ১৯৫৪ কিংবা ১৯৫৫, অন্য একটা বছরের মতোই ছিল সেটা। ঐ সালেই আমার ভাই অসুস্থ হয়েছিলেন। আবহাওয়া যে রকম ছিল তাতে মনে হয় মাসটা ছিল হয় ডিসেম্বর, নয় জানুয়ারি।

ভাবলে মনে হয় কতকাল আগেকার কথা। সঠিক সময় যেমন বলতে পারছি না, সঠিক স্থানও বলতে পারছি না। তবে ঐ সময়ের অবস্থানটা নির্ভুলভাবে আমি চিনতে পারব। একটা ট্যাক্সি নিয়ে মোড়ের মাথায় নামব তারপর সাতানা সড়ক ধরে একটু এগিয়ে গেলেই তো আমাদের ছোটবেলার সেই বাড়িটা। রাস্তাটা আমার খুব চেনা। যে কোনো ঋতুতে আমি সঠিক রাস্তায় হেঁটে যেতে পারব। আমার মন থেকে সব স্মৃতি মুছে যেতে পারে কিন্তু ঐ ছবিটা মুছবে না। সেই যে বৃষ্টি পড়ছে, উঠানে কাদা ভর্তি, বাবা দোতলায়, রান্না ঘর থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে আর আমার ভাইটি মাটিতে শুয়ে আছে।

বলা যায়, আমরা যে জিনিসকে ভয় করি সেটাই আমাদের জীবনে ঘটে যায়। বিপদের ভয় সব সময় আমাদের মনের মধ্যে থাকে তাই বোধ হয় মাঝে মধ্যে বিপদ নিজের চেহারা দেখিয়ে দেয়। এটা যেন স্বপ্নের মতো। লরেন্স অলিভার ও জোয়ান মাউন্টেন অভিনীত ‘রেবেকা’ সিনেমাতে যেমন হয়েছিল আমার এই প্রাচীন

বাড়িতে বাস করাটাও সেই রকম। আমি আর ভাই দুজনে এই বাড়ির দোতলায় থাকি। বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের কাছে আমরা একেবারে পরদেশীর মতো। আমার ভাই সেই সময় এই ইংল্যাণ্ড শহরে পড়াশোনা করত— স্কুলে কিংবা কলেজে, মনে নেই।

তৎকালীন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিটি এই বাড়িতে থাকত। এক সময় ভাই তার সঙ্গে থাকবে বলে এই বাড়িতেই উঠেছিল। তারপর একদিনের ঘটনা। বারান্দায় দুই বন্ধুর মধ্যে কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। মনে হল খেলার ছলে তারা ওসব করছে। তারপরেই বের হল একটা ছোরা। সেটা ঢুকে গেল তার বন্ধুর শরীরে। বন্ধুর চোখে বিস্ময়, অবিশ্বাসের ছায়া। ছেলেটা মাটিতে পড়ে গেল। কোনো রক্ত নেই, আমি তাকে দেখবার জন্য এতটুকু ঝুঁকলাম না। ভাই চিৎকার করতে চাইল কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হল না। ফাঁসির দড়ি দেখতে পেলাম। না, না, এ তো হত্যা নয়, এ যে দুর্ঘটনা। যে ভালোবাসা আর ভয়কে আমি এতকাল বয়ে বেড়িয়েছি আজ তা মূর্ত হয়ে সামনে দাঁড়াল। আমার জীবনের সব আশা ভরসার সমাপ্তি। আমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার।

এখানেই শেষ নয়। আরো কষ্ট বাকি ছিল। মৃত ছেলেটার মা বাবার সঙ্গে বসে আমাদের খেতে হবে। তাঁরা তো জানেন না কী সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে। আমাকে খেতে হবে, আমার ভাইকেও খেতে হবে তাঁদের সঙ্গে। মৃতদেহটা তো এখন একটা সিন্দুকে ভরা আছে— ‘রোপ’ সিনেমার মতো। গুরুতে এটা আছে, ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকবে। বাকি যা ঘটছে তা তো তামাশা। আমরা খেলাম। ভাইয়ের হাত কাঁপছে দেখলাম। তার অভিনয় দক্ষতা খুবই কম। যাদের সঙ্গে খাচ্ছি তাঁরা দেখতে কেমন আমি জানি না কারণ আমি তো তাঁদের দিকে তাকাতেই পারছি না। তারা আর দশজন ট্রেনের সহযাত্রী শ্বেতাঙ্গদের মতোই আমার সাথে থাকা সেই ছোট ছেলেটা, যে ভেজা জানালার ওপরে লিখছিল আমার লেখাগুলো পর মুহূর্তে মুছে যাচ্ছিল, ঐরা তাদের মতোই।

আমি এখন পরের জন্য কিছুই করতে পারি না, আমার জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি চাইছি ট্রেনটা কোনোদিন না থামুক। বাইরে তাকালেই দেখছি দূরের ছোট বাড়িটা ছুটে এসে বড় হয়ে গেল, তারপর অন্যান্য বাড়িগুলোর কাছাকাছি চলে এল। ট্রেন থেকেই বাড়িগুলোর অন্দরমহল দেখা যাচ্ছে। ঐ তো হাত ধোবার জায়গা, ঐ তো রান্নাঘরের জিনিসপত্র ভেজা জানালার পাশে ঝুলছে। ঐ তো লন্ডন শহর। আমি একা হলে হয়ত একটু চিন্তা করতাম। কিন্তু আমার সাথে ফ্রাংক রয়েছে। ট্রেন থামলে সেই আমার সব রকম দায় দায়িত্ব নেবে। সেই আমাকে বিয়ের অনুষ্ঠানের জায়গায় নিয়ে যাবে। আর এদিকে আমার মনের ভেতর যেন জ্বলন্ত সীসার হেঁকা অনুভব করছি।

ট্রেন থামলে আমরা অন্যদের নেমে যাবার জন্য রাস্তা করে দিলাম। আমার দৃষ্টিস্তা খানিকটা কাটল। এখন বৃষ্টি তো বন্ধই হয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে সূর্যটা যেন আকাশ চিরে ফেলবে। ফ্রাংক জানাল হাতে সময় আছে, সে খানিকটা হাঁটতে চায়। বৃষ্টির পর রাস্তাটা নোংরা হয়ে গিয়েছে, আশেপাশের বাড়ির বাইরের দেওয়ালের শুকনো শ্যাওলা ভিজে কালো হয়ে গিয়েছে, নর্দমায় এক গাদা খবরের কাগজ জমা হয়ে আছে। আমি ফ্রাংককে অনুসরণ করে এমন রাস্তায় চলেছি যা আমার চেনা। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এই সব রাস্তা ফ্রাংক সত্যিই চেনে তো, নাকি এটা ব্যাখ্যার অতীত কোনো একটা ঘটনা। পথ চলতে চলতে আমি এক জায়গায় থেমে বলি, 'ঐতো সেই জায়গা যেখানে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম, পাঁচ পাঁচটি বছরে যে দু হাজার পাউন্ড আমি জমিয়েছিলাম, তা এখানে খরচ হয়ে গিয়েছিল মাত্র পাঁচ মাসে।

দু হাজার পাউন্ড কথাটা কেমন যেন কাণ্ডজে কাণ্ডজে। যদি সারাটা জীবন ডলার এবং সেন্ট নিয়ে কাটানো যায় তাহলে পাউন্ড কথাটার বিশেষ গুরুত্ব নেই। বাবা দশ বছরে দুহাজার পাউন্ড জোগাড় করতে পারেননি। লোকে বলতেই পারে, 'আমি আবার পরিশ্রম করব, আবার টাকা জমাব'। এসব বলা সহজ কিন্তু মন একবার ভেঙে গেলে সব কিছু ভেঙে যায়।

আমি এক মনে কাঁচের ভেতর দিয়ে দোকানটা দেখছিলাম। ফ্রাংক আমার কাঁধে একটা হাত রেখে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যে লোকটা এই দোকানের ইজারা নিয়েছিল সে আমাকে দেখতে লাগল। ইজারাদারের গায়ের রং ছিল চিনাদের মতো, মাথায় ছিল টাক। লোকটাকে দেখে ফ্রাংকের মনে পুরোনো গর্ববোধ জেগে উঠল।

ঐ টেকো লোকটাকে বা যাকে হাতের সামনে পুষে তাকেই সে বুঝিয়ে দেবে সে তার চেয়ে কত গুণ বড়। আমি ইজারাদারের উদ্দেশ্যে বললাম, 'তুই তো একটা সাদা মাদী কুকুর-রে'। কথাগুলো এমনভাবে বললাম যেন ফ্রাংক অশ্লীল কথা শুনতে বড় ভালোবাসে। কথাগুলো শুনে তার মনে বোধ হয় আঘাত লাগল এবং তার মন ধারাপ হল বলেই আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নোংরা কথা বলতে লাগলাম। আমি বলেই চললাম, 'ফ্রাংক, আজ তোমাকে বলে রাখছি আমি প্রচুর টাকা উপার্জন করব যা তুমি সারা জীবনে পারবে না। আমি ঐ সবচেয়ে উঁচু বাড়িটা কিনে নেব, তারপর এই পুরো রাস্তাটা কিনব।'।

কথাগুলো বলবার সময়ও মনে হচ্ছিল যা বলছি তা একেবারে মূর্খের মতো। নিজের কথা কানে গেলে আমারই হাসি আসছিল। এখন আর রাস্তায় বের হতেও ইচ্ছা করছিল না। আমাকে লোকে না দেখুক আমি তাই চাইছিলাম। তবে আমি যা চাইছিলাম তা হল, লোকের মুখ না দেখতে। তারা শ্বেতাঙ্গ ছিল বলেই হয়ত আমি ওরকম চাইছিলাম। ফ্রাংক চাইছিল মাথা গরম করে আমি একটা শ্বেতাঙ্গের মোকাবিলা করি।

যাইহোক, আমি চাইছিলাম রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে। সেই উদ্দেশ্যে ফ্রাংক আমাকে নিয়ে একটা কফির দোকানে ঢুকল। আমরা একেবারে পেছনের দিকে বসলাম। ফ্রাংক আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল, শৈশবে তার ম্যালেরিয়া হয়েছিল সেই কথা আমাকে শোনাল। জ্বরের সময় তাকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল একথা বলে সে বোঝাতে চাইল লড়াই করে জীবনে সে জিতে গিয়েছে। তাই সে এখন একটা বড় শহরে থাকে। সে এখন আর অশিক্ষিত কিংবা দুর্বল কোনোটাই নয়। এসব বলে সে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগাচ্ছিল। তার কথা আমি ইচ্ছা করেই শুনছিলাম না। টেবিলে রাখা কাপড়ের ওপর ফুলের ছবি দেখে যাচ্ছিলাম এক মনে। আমার মনে কী আছে তা সে এখন বুঝতে পারছিল না। আমি নিশ্চিত, আগামী একশো বছরেও সে বুঝতে পারবে না যে এই পৃথিবীটা আমার কাছে কতখানি বর্ণহীন, গুরুত্বহীন। কত ছোট বয়স থেকে আমি বুঝে গিয়েছি জীবন বলে আমার কোনো বস্তু নেই।

পৃথিবীটা আমার চোখে খুব বর্ণহীন হলেও আমার ভাইয়ের চোখে তা কিন্তু ছিল না। সে যে একজন দক্ষ পেশাদার লোক হতে চলেছিল তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। যারা বিত্তবান কিংবা পেশাদার তাদের কাছে পৃথিবীটা কেন ম্যাডমেডে হবে? যেখানে কুঁড়েঘর ছিল সেখানে তারা অট্টালিকা বানাবে। যেখানে মাটির রাস্তা, ঘাস-ভরা মাঠ ছিল, সেখানে তারা উদ্যান বানাবে। রবিবারে যখন আমরা আলস্য করে সময় কাটাবে, তখন তারা পার্টিতে যাবে। একই পরিবেশে আমাদের জন্ম হলেও আমাদের কয়েকজন খুব এগিয়ে যাবে, কয়েকজন পেছনে পড়ে থাকবে। যারা খুব পেছনে পড়ে যায় তারা আর মাথা ওঠাবার জন্য একদম চেষ্টা না করে ভাগ্যের হাতে হাল ছেড়ে দেয়।

আমার বাবা ঠিক এই রকম ছিলেন। লিখতে পড়তে না পারলেও তাঁর আক্ষেপ ছিল না। নিজের শিক্ষার অভাব নিয়েই মজার মজার কথা বলতেন আর প্রাণখুলে হাসতেন। তিনি বলতেন জীবনের ঐ দিকটা তিনি ছোট ভাইয়ের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন। ছোট ভাইটি শহরে এক উকিলের অধীনে কেরানীর কাজ করত। ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা হলেই হল, বাবা নিজের জীবনটাকে এমনভাবে তুলে ধরতেন যেন সেটা একটা গল্প এবং একটা তামাশা, তিনি নিজের শৈশবকে একটা তামাশা বলেই মনে করতেন। এত হালকা কথা বললেও বোঝা যেত তিনি খুব বুদ্ধিমান এবং নিজের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সচেতন। আমার দুই দিদি এবং আমার বড় দাদা ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছে। আগেকার দিনের লোকের মতো তারা কিছুদিন স্কুলে গিয়েছিল, তারপর বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। অন্যরা যা করে এরাও তাই করে। সপ্তাহান্তে শুক্রবার ও শনিবার পয়সা নষ্ট করে নির্লজ্জভাবে মদ্যপান করে।

আমি পিতামাতার চতুর্থ সন্তান এবং পুত্র হিসাবে দ্বিতীয়। আমার জ্ঞান শুরুর থেকে দেখছি পৃথিবীটা কেমন বদলে যাচ্ছে। দেখলাম কত লোক লেখাপড়া শিখতে গেল, ফিরে যখন এল তখন তারা নাম-করা লোক। আমি জানতাম আমার ভাগ্য অন্য ধরনের। বাল্যকালেই আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তবে আমি ঠিক করেছিলাম আমার কপালে যা ঘটেছে তা ছোট ভাইয়ের বেলায় কিছুতেই ঘটতে দেব না। আমাদের পরিবারের লোকেরা সমস্ত ঘটনাকে যে চোখে দেখে আমি সেভাবে দেখি না। তাই আমাকে তারা বলে আমি নাকি খুব স্পর্শকাতর। আমার মনে হয় আমিই বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে বড়। তাই পরিবারের উচ্চাশা ও লজ্জা, দুটোর কথাই আমাকে ভেবে চলতে হয়। উচ্চাশাকে লজ্জার সাথেই তুলনা করা যায়। আবার লজ্জা মানেই গোপনীয়তা এবং সেটা কখনোই আমাদের পিছু ছাড়ে না। বহুকাল পরেও লজ্জার কথা মনে পড়লেই আমাদের মনে জ্বালা বোধ হয়। আমার মনে যা ঘটে, ভাইয়ের মনে তা ঘটবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।

আমাদের বাড়ির কাছেই একটা বিশাল দোতলা বাড়িতে একটা লোক বাস করত। ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বাড়িটা ছিল চকোলেট রংয়ের। এত সুন্দর সাজানো গোছানো ছিল বাড়িটা যে মনে হত একেবারে খেয়ে ফেলি। প্রতিদিন আমি বাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখতাম। লোকটা পয়সাওয়ালা ছিল বলেই বাড়িটা বড়লোকের বাড়ি বলেই পরিচিত ছিল। এককালে লোকটা আমাদের মতোই নির্ধন ছিল, কিন্তু দক্ষিণ দেশে ওর বেশ কয়েক একর জমি ছিল। আমার বাবা যেমন সাধারণ, ঐ লোকটাও এককালে তেমনি ছিল। কিন্তু ওখানেই জমির নিচে তেল খুঁজে পাওয়ায় লোকটার সব কিছু বদলে গেল। তেল, টাকা, বাড়ি, ভাগ্য সব একসাথে মিলে লোকটাকে অনন্যসাধারণ বানিয়ে তুলল।

গ্রামের বিয়ের অনুষ্ঠান সারা রাত্রি চলে। একবার কোনো গ্রামবাসীর বিবাহ উপলক্ষে লোকটা পুরো বাড়িটাই গ্রামবাসীদের ব্যবহার করতে দিয়েছিল। আর ঐ বিয়ের রাতেই আমি ঐ বাড়িতে প্রথম ঢুকেছিলাম। বাইরে থেকে বাড়িটাকে বিশাল মনে হলেও ভেতরে ঢুকলে সেটাকে ছোট মনে হবে। বাড়িটার ওপরের তলায় কেবল পাঁচটা কামরা। ঘরের ভেতর খুবই অনুজ্জ্বল আলো। দোতলায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই মাথার ওপর ঘুনলাগা কাঠের গুঁড়ো ঝরে পড়ে।

হল ঘরে এত আসবাবপত্র আছে যে নিঃশ্বাস নেবার উপায় নেই। টেবিলগুলোর এমন অবস্থা যে একটু জোরে টিপে দিলেই চুর চুর করে ভেঙে পড়বে। বসবার ঘরে আসবাবপত্র বলতে কয়েকটা মাত্র চেয়ার, ঘরে না আছে কোনো ছবি, না কোনো শিল্পকর্ম, এমনকি, একটা ক্যালেন্ডার পর্যন্ত নেই। হ্যাঁ, বেশ কিছু খ্রিস্টান ধর্ম-পত্রিকা এককোণে ডাঁই হয়ে পড়েছিল। যদিও লোকটা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নয়। সব

দেখে মনে হচ্ছিল ঐ বাড়িটা একটা স্মৃতি সৌধের মতো, কেউ সেখানে বাস করে না। ধনী লোকটাও জানে না কেন এই বাড়ি সে কিনেছিল।

এমনি একটা দিনে ঐ লোকটাকে কেউ গুলি করে মারল। টাকার জন্য, নাকি পুরোনো পারিবারিক খারাপ সম্পর্কের জন্য এই ঘটনা ঘটল তা কেউ বলতে পারল না। তবে কৃষ্ণকায় পুলিশ এল, আততায়ীর সন্ধান দিতে পারলে পাঁচশো ডলার পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল একটা নাটক দেখার জন্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নাটক আর জমল না। রাস্তার মোড়ে লাগানো পোস্টারগুলো বিবর্ণ হয়ে গেল, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পুলিশও একদিন খুনের ঘটনা ভুলে গেল, কিন্তু বাড়িটা যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি থাকল। বাড়ির রং চটে গেল, ছাদ খসে পড়তে লাগল, বাড়িতে ব্যবহৃত লোহাতে লেগে থাকা মরচে গুলো বৃষ্টির জলে ধুয়ে দেওয়াল বেয়ে নামতে লাগল। দেওয়ালের শ্যাওলাগুলো ধোয়া হয়ে বাগানের ওপর পড়তেই মাঠের ঘাসের রং সবুজ থেকে কালো হয়ে গেল। কালো রংয়ের জায়গার সামনে সত্যিকারের ঝোপ গজিয়ে গেল। জানালার রং ধোয়া হয়ে গেলে ক্রমে কাঠের একেবারে ভেতরের অংশ দেখা গেল এবং কাঠের ভেতর গর্ত হয়ে গেল। আমি যতদিন ঐ এলাকায় ছিলাম বাড়িটা ঠিক সেই ভাবেই থেকে গিয়েছিল।

এখন আমি বেশ ভালো করেই বুঝি বাড়ির মালিকটা মোটেই ধনী ছিল না। এত দূরের এই শহর থেকেও আমি দিব্য দৃষ্টিতে ঐ ক্ষয়িষ্ণু বাড়িটাকে, তার রং ধুয়ে যাওয়াকে, বাগানে জন্মানো আগাছাকে দেখতে পাই।

এই রকম একটা গ্রামে মানুষ কী খুঁজে পেল যে এখানে বাসিন্দা হয়ে গেল? কিন্তু বাড়ি হল বাড়িই। মেঘহীন রবিবারে কেউ কাজ করছে না। প্রত্যেকেই উঠানে বসে আরাম করছে। বাগানের এদিক ওদিকে নানা রংয়ের ও নানা ধরণের ফুল ফুটেছে। যতদূর মনে পড়ে এমনি একটা সকালে আমার কাকাকে সাইকেলে চড়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখলাম। এই কাকা এখন শহরে থাকেন। আমার বাবার কেন লেখাপড়া হল না অথচ কাকা শিক্ষিত হলেন কী করে? তিনি শহরে চলে গিয়ে উকিলের কাছে একটা চাকরি জোগাড় করে ফেললেন এসব আমার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয়। আমার জন্মের পূর্বে এ সব ঘটেছিল। শহরে গিয়ে কাকা খ্রিস্টান হয়ে গিয়ে একটা খ্রিস্টান নামও নিয়েছেন। তাঁর নাম এখন স্টিফেন। এটা নাকি প্রগতির লক্ষণ, এজন্য অবশ্য বাবা তাঁর পেছনে কখনও কোনো সমালোচনা করেন নি। এটা ঠিক যে স্টিফেনের জন্য আমরা গর্ব বোধ করি কারণ এই গ্রামে তাঁর জন্যই আমরা কিছুটা খ্যাতি ও লোকের শ্রদ্ধা লাভ করতে পেরেছি। তাঁর গ্রামের বাড়িতে আসা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাড়ার লোকেরা অনেক আগে থেকেই জেনে যেত যে কাকা আসছেন। মা মুরগীর মাংস রান্না করে রাখতেন, বাবা মদের

বোতল ও সুন্দর কয়েকটা গ্লাস একেবারে তৈরি করে রাখতেন। চলে যাবার সময় কাকা ছোটদের হাতে কিছু পয়সাও দিয়ে যেতেন।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। ভাবতাম, কাকা শহরে একাই থাকেন এবং আমরাই হলাম তাঁর আপনজন। কিন্তু আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম যখন জানলাম, তাঁর একটা আলাদা সংসার আছে, সেই সংসারে তাঁর অনেকগুলি কন্যা সন্তান আছে যারা কনভেন্টে পড়ে এবং তাঁর একটি পুত্র সন্তানও আছে। পুত্র সন্তানটি পড়াশোনায় ভীষণ ভালো এবং স্টিফেন কাকা এই পুত্রের জন্য বেশ গর্বিত। এই ছেলেটি আমার সমবয়সী হতে পারে আবার একটু বড়ও হতে পারে। দু-একটা অনুষ্ঠানে সে আমাদের বাড়িতে এসেছে। ছেলেটি আমাদের কাছে কোনো নাক-উঁচু ভাব দেখায়নি। আমার এবং আমার ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে বাবার যা ধারণা ছিল, এই ছেলেটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবার আরো উচ্চ ধারণা ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় বাবা তার হাতে দু চারটে টাকা গুঁজে না দিয়ে একটা শার্লি টেম্পলের ঝরনাকলম কিংবা মিকি মাউসের হাতঘড়ি উপহার দিতেন।

স্টিফেন আমাদের বাড়ি আসছেন কিনা তা কখনোই আগে ভাগে জানাতেন না। রবিবারের মতো একটা ছুটির দিনে একজন লোক তার ছেলেমেয়েকে ছেড়ে গ্রামে চলে আসছেন কেন তা ভাবলে অবাক লাগে বৈকি এখন। বাবার মুখে শুনতাম শহরের আধুনিকতায় স্টিফেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কখনও শুনতাম খ্রিস্টান স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয়। আবার কখনও শুনতাম, শহরে সম্মত্যের মধ্যে যে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা আছে তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য কাকা গ্রামে চলে আসেন। আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে স্টিফেনের মতো মানুষের আবার দুশ্চিন্তা কী জন্য? দুশ্চিন্তা থাকলেই যে চেহারা দেখে সব সময় বোঝা যায় তাও নয়।

আমার কাকাটি খুব মজা ও ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসতেন। সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে ঘরে ঢোকানোর মুখে, টুপি কিংবা প্যান্টের ক্লিপ খোলার আগে কিংবা মদের গ্লাসে চুমুক দেবার আগে থেকে তিনি হাসির কথা বলতে শুরু করতেন। আমাদের গাধাটা নিয়ে তিনি এমন মজা কথা বলতেন যেন ইতিপূর্বে এ ধরনের প্রাণী তিনি কখনও দেখেননি। গাধা মারা যাবার পরও তার মৃত্যু নিয়ে তিনি খানিক তামাশা করলেন। তারপর আমরা যখন একটা লরি কিনলাম এবং কয়েক সপ্তাহ সেটা বাড়ির নিচে বেকার দাঁড়িয়ে থাকল, তখনও সেটা নিয়ে তাঁর ঠাট্টা চলল। আমরা যা কিছু করতাম তাই যেন তাঁর ব্যঙ্গের রসদ সরবরাহ করত। আর আমার বাবা হেসে হেসে তাঁকে যেন উৎসাহিত করতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম আমাকে নিয়ে কাকা খুব মজা করতেন। আমাকে দেখিয়ে বাবার কাছে জানতে চাইতেন, 'দাদা, এর বিয়ে দিচ্ছ না কেন এখনও?' বাবাও হেসে বলতেন, 'এই যে আর দুটো মাস যাক।' আমি একটু বড় হলে হাবেভাবে কাকাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে এই ধরনের ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। তখন থেকে অবশ্য বাবা আর আমার বিয়ে নিয়ে মজা করতেন না।

আমার কাকা লোকটি মন্দ বা ক্ষতিকারক ছিলেন না। ঠাট্টা তামাশা করাটা যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটা ব্যাপার। তিনি নিজেকেও রেহাই দিতেন না। একবার তিনি ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সেবার বলেছিলেন ‘আমার ছেলে আজ পর্যন্ত একটি মিথ্যা কথা বলেনি।’ একথা সত্যি কিনা ছেলেটিকে জানতে চাওয়া হলে সে উত্তর দিল, ‘তা আবার হয় নাকি?’ ছেলের জবাব শুনে কাকা হাসতে হাসতে বললেন, ‘হায় ঈশ্বর, ছেলেটার ওপর এত তাড়াতাড়ি তোদের প্রভাব পড়ে গেল!’ এই হল আমার কাকা— স্টিফেন। তাঁর ঠাট্টার পেছনে একটা গুরুগম্ভীর বিষয় ছিল। তিনি চাইতেন আমরা আরো একটু আধুনিক হই।

কাকা আমাদের বাড়িতে এলেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘দাদা, তোমার জন্য ছেলেমেয়েদের তো কিছু হল না। ছোটটির পড়াশোনা নিয়ে কী ভাবছ? একে তো লেখাপড়া শেখাও’। তারপর ভাইকে প্রশ্ন করতেন, ‘অ্যাই, দায়ো, পড়াশোনা করতে তোর ভালো লাগে?’ ভাইটি তার একটি পা অন্য পায়ের গোড়ালিতে ঘষতে ঘষতে উত্তর দিত ‘হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে।’ ভাইয়ের এই অকপট মিষ্টি উত্তরটি বোধ হয় স্টিফেনের খুব ভালো লেগেছিল। তিনি বাবাকে বললেন, ‘দাদা, আমি তোমার এই ছেলেটিকে নিয়ে যাব, ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব।’ বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘তুই যা ভালো বুঝিস কর। এখানের স্কুলে পড়লে ওর কিছুই হবে না। এখানের মাস্টারগুলো কী যে পড়ায় আমি নিজেই জানি না।’

স্টিফেন যদি সত্যি সত্যিই ভাইকে নিয়ে গিয়ে শহরে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিতেন তাহলে আর চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু আমি তো জানি, কথা বলতে হবে বলেই তিনি কথা বলছেন। তিনি তো কথা বলছেন না, এখন কথা বলছে মদ আর মুরগীর মাংসের তরকারি। স্টিফেন যদি বাইরের লোক হতেন তাহলে আমি বাবা কাকার কথার মাঝখানে ঢুকে যেতাম। কিন্তু তিনি যে আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য। আমরা যদি লেখাপড়া শিখি তাহলে তাঁর পুত্রের প্রতিযোগী হতে পারি। এ কথা যদি বলে ফেলি তখন স্টিফেন আর আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করবেন না, বিরক্ত হয়ে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দেবেন। তাই আমি ঠিক করলাম কাকা, যেমন বলছেন, বলে যান। আমি জানি দু-চার গ্লাস খাবার পরেই তার চোখ ক্রমে লাল হয়ে আসবে, তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। তারপর বোতল খালি হলেই লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে আবার শহরে এবং তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যাবেন। কাকার মন-প্রাণ তাঁর নিজের ছেলের উন্নতির চিন্তায় ভরে আছে। তিনি কী করে আমার ভাইয়ের উন্নতির কথা ভাববেন? এত বছর ধরে তাঁর ছেলে কীভাবে আরো পড়াশোনা করে উন্নতি করবে তা শুনে আসছি। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাকা বেশ মোটা টাকা জমিয়ে রেখেছেন এমন কথাও তিনি গোপন করেননি। পড়াশোনা শেষের দিকে এলেই কানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করা আছে বলেও কাকা গল্প করতেন। ছেলের যতটা না উচ্চাশা আছে, কাকার তার চেয়েও বেশি আছে। তবে সেই উচ্চাশা যেন একটু ভয়-মিশ্রিত। কাকা

যেন এমন একজন লোক যে পিঠে একটা বোঝা নিয়ে হেঁটে চলেছে এবং সেই বোঝার ভারেই তার পিঠ ভেঙে যাবে। বাবা বলতেন, ‘ওর ছেলেই একদিন ওকে কাঁদাবে!’ সেই অর্থে আমার বাবা খুব সুখী। তিনি কোনো ছেলেকেই সর্বস্ব খুইয়ে এমন লেখাপড়া শেখাননি যে ভবিষ্যতে তাঁকে কাঁদতে হবে।

এক রবিবারে আগাম না জানিয়ে কাকা একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। এবার আর একা নয়, আর সাইকেল চেপেও নয়। এবার একদম সপরিবারে মোটর গাড়িতে চড়ে। আমাদের বাড়ির পেছনের বাগান থেকে আমি মোটর গাড়টাকে আমাদের বাড়ির সামনে থামতে দেখলাম। দেখলাম আমার খুড়তুতো বোনরা সব গাড়ি থেকে নামছে। এই সময় আমাদের বাড়ির অগোছালো অবস্থার কথা মনে পড়ায় এক ছুটে আমি ভেতরে গিয়ে ঘরটা ঝাঁট দিতে শুরু করলাম। কিন্তু অত সময় কোথায়? ততক্ষণে অতিথিরা ওপরে উঠে আসছে বুঝতে পেরে আমি বাবার মতো একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যেটা যা সেটাই তা, আমাদের যা আছে তাই আছে, লোকে দেখলেই বা কী এসে যায়? দারিদ্র্যকে আর ঢেকেচুকে লাভ কী? স্টিফেনের খ্রিস্টান স্ত্রী ও খ্রিস্টান কন্যারা ক্রমে ওপরে উঠে এল। আমাদের ঘরদোরের চেহারা দেখে তাদের চোখেমুখে একটা তেতো ভাব ফুটে উঠল। তাদের চেহারা যদি অসুন্দর হত আমার খারাপ লাগত না, কিন্তু তাদের কুৎসিত মনে হল। এমন সময় আমার মা ওপরে উঠে এলেন। মাথার ওড়নাটা হাত দিয়ে এমনভাবে সরালেন যেন সকলের সামনে নিজেকে উপস্থাপিত করার ওটাই একমাত্র উপায়। তারপর যেন বেশ একটা মজার কথা বলছেন এমনভাবে বললেন, ‘আচ্ছা, স্টিফেন, তোমার বুদ্ধিগুদ্ধি আর কবে হবে? খবর না দিয়ে এভাবে কেউ আসে? দেখ তো ছেলেটা আমার ঘরদোর পরিষ্কার করতে কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।’ কথাগুলো বলে মা নিজের মনেই হাসতে লাগলেন।

কথাগুলো মা না বুঝে এমনভাবে বললেন যে আমি ঐ ঘর থেকে পালিয়ে আবার বাগানে গিয়ে আখ গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকলাম। আমার লজ্জা ও বিরক্তি ঢাকবার জন্য ঐ মুহূর্তে বাগান ছাড়া আর কিছু ছিল না।

সেখান থেকে এক সময় বেরিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। ভাবলাম, আর কোনোদিন বাড়ি ফিরব না। কিন্তু এক সময় সূর্য ডুবল। এবার তো না ফিরলেই নয়। ঐ তো খালেবিলে ব্যাণ্ডের দল সমস্বরে ডাকতে শুরু করেছে, দূরে আমাদের বাড়ির অনুজ্জ্বল বাতিগুলো দেখা যাচ্ছে। না, আমি অনুপস্থিত কি উপস্থিত, তা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। আজকের আলোচ্য বিষয় আমার ভাই দায়ো শহরে গিয়ে কাকা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকবে। স্টিফেন তাকে স্কুলে না কলেজে কোথায় যেন পড়তে পাঠাবেন। বড় হয়ে সে কী যেন হবে— ডাক্তার, উকিল না কী যেন। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

এটা যেন একটা স্বপ্ন। খুব বেঠিক সময়ে এটা ঘটল। আমার মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীটা বিষময়। ভাইয়ের যাবার মুহূর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগল আমি ততই

অনুভব করতে লাগলাম ভাইকে আমি কতখানি ভালোবাসি। কাকা যেমন তাঁর ছেলেকে ভালোবাসেন, আমিও দায়োকে ততখানি ভালোবাসি। ঐ সময় আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমার বাবা, মা, স্টিফেন ও তাঁর পরিবারের সকলে একেবারে শেষ হয়ে যাক। তাদের সাথে শেষ হয়ে যাক আমার লজ্জা। তাদের সকলকে আমি ঘৃণা করি। আজও যতটা ঘৃণা করি এই কফির দোকানকে, এই রাস্তাকে, আমি তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করি শ্বেতাঙ্গদের, এরাই তো আমাকে পঙ্গু করেছে। এরাই আমাকে মেরে ফেলেছে।

বড় শহর সম্বন্ধে আমার একটা স্বপ্ন ছিল। তবে সেটা এই শহরের মতো নয়। সেখানে থাকবে উঁচু বর্শা বসানো লোহার রেলিং ঘেরা পার্ক। রাস্তার ওপর থাকবে খুব পুরোনো ঝাঁকড়া গাছের সারি। গাছের ওপর বৃষ্টি পড়বে ঠিক যেমন 'ওয়াটারলু ব্রিজ' সিনেমায় দেখিয়েছিল। রাস্তায় পড়ে থাকবে গাছের মোটা মোটা পাতা! পাতাগুলো হবে নানা রংয়ের— সোনালি, লাল কিংবা জবা ফুলের মতো।

পাতা বলতেই মনে পড়ে গেল মেপল পাতার কথা। উচ্চ শিক্ষার জন্য মন্ট্রিয়ালে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই কাকার ছেলে ওখান থেকে আমাকে খামে চিঠি পাঠিয়েছিল। খামটা ছিল বেশ লম্বা, ডাক-টিকিটও ছিল সুন্দর। খামের মধ্যে চিঠির বদলে ছিল একটা খুব সুন্দর মেপল পাতা। ওটাই চিঠি। মাঝে মাঝে খামটা হাতে নিয়ে আমি অবাক বিস্ময়ে মেপল পাতা আর ডাক টিকিটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ঐ তো আমি দেখতে পাচ্ছি কালো রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গাটার ওপাশে রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ঐ তো ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে নাক ঝাড়ছে। রাস্তায় পড়ে থাকা পাতাটার ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। সে আমাদের অর্থাৎ তার কাকার ছেলেদের কথা ভাবছে। গায়ে তারি একটা ওভারকোট, হাতে একটা ছোট বাক্স। মেপল পাতার মাঝে একটা সুন্দর যুবক যে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে রয়েছে। আমার ছোট ভাইয়ের একই রকম ছবি আমিও দেখতে চাই।

স্টিফেনের ছেলে মন্ট্রিয়ালে চলে যাবার পর থেকেই আমার ভাইয়ের দুর্গতি শুরু হল। তারা সকলে মিলে আমার ভাইটিকে অবজ্ঞা করতে শুরু করল। তার কামরা বলে কিছু ছিল না। সকলে শুয়ে পড়লে বসবার ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে তাকে শুতে হত। কাকার বাড়িটা ছিল রাস্তার পাশে। সেই বাড়ির একফালি বারান্দাটা ছিল একেবারে রাস্তার ওপর। সেটাই ছিল তার পড়ার জায়গা। সেখানে বসলে তার চোখ যেত রাস্তার পথ চলতি লোকের ওপর এবং তারাও তাকে খুব ভালোভাবে দেখতে পেত। বারান্দাটা এমনভাবে রাস্তার ওপর ঘেঁষে ছিল যে পথচারীরা ইচ্ছা করলে

তার বই-এর পাতা উল্টে দিত পারত । তবে পড়াশোনায় ছেলেটার এত আগ্রহ ছিল যে পাড়ায় তার খুব সুনাম হয়ে গেল । এর ফল হল তার পক্ষে খারাপ । স্টিফেন ও তাঁর পরিবারের লোকেরা আমার ভাইকে আর সহ্য করতে পারছিল না । তাদের ধারণা ছিল, লেখাপড়া করার অধিকার কেবল তাদেরই আছে ।

খুড়তুতো ভাইয়ের জন্য গর্ববোধ না করে তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করল স্টিফেনের কন্যারা । গরিবদের রীতি হল তারা নিজেরা ওপরে উঠতে চায় । গরিব লোক অন্য এক গরিবকে কিছুতেই উন্নতি করতে দিতে চায় না । দায়োর সাফল্যকে তারা অন্যভাবে নিতে শুরু করল । দায়ো যেন তাদের হীন প্রতিপন্ন করার জন্যেই লেখাপড়াটা ভালোভাবে করছে । স্টিফেন যদি ঐ সময় খবর পাঠাতেন যে আমার ভাই তাঁর মেয়েদের উত্যক্ত করে তাহলেও আমি বিস্মিত হতাম না । দায়ো যদি সব পরীক্ষায় অকৃতকার্য হত তাহলে তাদের যে কত আনন্দ হত তা আমি চোখ বন্ধ করেই দেখতে পেতাম । দায়োকে অবশ্য মানুষ করার জন্য কাকার অবদান কিছুই ছিল না । তাকে ওখানের সব চেয়ে বাজে একটা স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল যেখানে মাস্টারদেরই পড়ানোর উপযুক্ত যোগ্যতা ছিল না । স্কুলের ছাত্রদের ভালো ফল না হওয়ার জন্য তারা সব সময় ছাত্রদের উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশের অভাবকেই দায়ী করত । এই প্রতিকূলতা কিন্তু স্টিফেন কাকার কন্যারা দেখতে পেত না ।

স্টিফেনের ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় গিয়েছে, তাহলে আশা করা যায় তিনি দায়োকে সাহায্য করবেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে উৎসাহিত করবেন । কিন্তু ছেলে বিদেশে চলে যাবার পর তাঁর আচরণ কেমন মনে অস্বাভাবিক হয়ে গেল । কোনো বিষয়েই তাঁর উৎসাহ থাকল না, সব সমস্যা শোকগ্রস্ত অবস্থা; যেন কোনো অশুভ সংবাদ এখুনি এসে যাবে । তাঁর মুখটা কেমন যেন ফুলে গেল, মাথার চুল কর্কশ ও ধূসর হয়ে গেল । কিন্তু দুঃসংবাদ তো পেলাম আমি । সপ্তাহের মাঝে একদিন আমি বাড়িতে এলাম । লরিতে কাজ করে আমি খুব ক্লান্ত । শরীরটা একটু বিশ্রাম চাইছিল । এমন সময় খুব ভালো পেশাক পরে দায়ো বাড়িতে এল । সে জানাল, স্টিফেনের বাড়িতে আর সে ফিরে যেতে চায় না । পড়াশোনার চেয়ে ওরা তাকে দিয়ে সংসারের অন্য সব কাজ বেশি করিয়ে নেয় । তার চেহারাই বলে দিচ্ছিল ভাইটি আমার কত কষ্টে আছে । তার সন্দেহ ছিল আমরা হয়ত তার কথা বিশ্বাস করব না এবং তাকে কাকার বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য করব ।

আমার বাবা হলে তাই করতেন । এরকম কথা শুনলে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মন্তব্য করতেন, 'জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এসব তো করতেই হবে ।'

আমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া ভাইয়ের আর উপায় কী? ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে অত্যন্ত ভীত এবং হতাশাগ্রস্ত । তার এই চেহারা দেখে আমার শরীরের সব শক্তি চলে গেল এবং আমি কাঁপতে লাগলাম । তারপর আমার শিরা উপশিরায় রক্ত ছুটতে শুরু করল । আমার হাত আমার অজান্তেই উঠতে শুরু করল যেন আমার শরীরে কেবল তার আছে, আর কেউ যেন সেই তার ধরে টান মারছে ।

দায়ো বলল, ‘ওখান থেকে আমাকে পালাতেই হবে, ওখানে থাকলে ওদের ঈর্ষার জ্বালায় আমি পঙ্গু হয়ে যাব’।

এর উত্তর আর আমি কী দেব? আমার তো ওপর মহলে চেনাজানা বড় একটা নেই, কোন্ সুতোতে টান মারলে প্রার্থিত ফল পাব তা আমি জানি না। স্টিফেনের পরিচিতির গন্ডি অনেক বড়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁকে আমাদের কোনো কিছু করতে বলতে পারি না।

দায়ো জানাল এখানে তার কোনো কাজ নেই। তেলকূপে চাকরির কী অবস্থা জানতে চাইলে সে বলল ভালো ভালো চাকরিগুলো সব শ্বেতাঙ্গদের জন্য রাখা আছে আর “বেঞ্চ কেমিস্ট” পদগুলি আছে আমাদের জন্য।

‘বেঞ্চ কেমিস্ট’ শব্দটা আমি আগে কখনও শুনিনি। দায়ো যে এত কিছু জেনেছে তা প্রশংসনীয়, এ সত্ত্বেও স্টিফেনের পরিবারের লোকজন তাকে কোনো কৃতিত্ব দিল না। কিন্তু এই দু বছরের মধ্যে তার জ্ঞান এত বেড়েছে এবং তার কথা বলার ধরন এত সুন্দর হয়েছে যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সে এখন খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে না, তার কণ্ঠস্বর ওঠা-নামা করে না। কথা বলার সময় হাত নাড়াটা সে বেশ ভালো রপ্ত করেছে এবং মেয়েদের মতো নাকি সুরে মাঝে মাঝে কথা বলে যা কিনা উচ্চ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তার কথা বলার ভঙ্গি আমার ভালো লাগলেও তার দিকে তাকাতে আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কারণ ভাষার ওপর তার দক্ষতা একেবারে অসাধারণ। আমি তাকে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে গেলাম। কথা বললে তার দুঃখ ও ভীতি দুটোই কেটে যাবে।

আমি জানতে চাইলাম তার কী নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে— ডাক্তারি, চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্সি, নাকি আইন। ভাই উত্তর দেবার আগেই মা বলে উঠলেন, ‘দায়ো যখন পেটে ছিল তখন থেকেই আমি ঠিক করেছি ওকে দাঁতের ডাক্তার করব’। এই হল মায়ের উপস্থিতি বুদ্ধি। আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মা জানতই না দস্ত-চিকিৎসা কাকে বলে। যাই হোক, মা তো বলেই গেল ঔষধিকক্ষন, তারপর রান্নাঘরে চলে গেলে দায়ো আবার মুখ খুলল। সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একথা সে কথা বলার পর সে জানাল সে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

যেমন ‘বেঞ্চ কেমিস্ট’ কথাটা আমি আগে শুনিনি, তেমনি এটাও আমার কাছে নতুন, কথাটা শুনে আমার একটু ভয় হল। দায়ো আমাকে বোঝাল যে এই পাঠক্রমটা ইংল্যান্ডে পড়ানো হয়। সেখানকার একটা কলেজে গিয়ে টাকা জমা দিলেই ওরা ভর্তি করে নেবে। খুব কঠিন কাজ কিছু নয়। যাই হোক, তার প্রস্তাবে আমরা রাজি হলাম। ঠিক হল, সে ঐ দেশে চলে যাবে।

রাজি হবার পর থেকেই দেখা গেল দায়ো একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে যেন জেল-পালানো কয়েদি— এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মনে হচ্ছে তাকে যেন এখুনি জাহাজ ধরতে হবে। সত্যি সত্যিই দেখা গেল, তার যাত্রার দিন খুব দূরে

নেই। অন্যান্য বন্ধুদের মতো সে আগেই ইংল্যান্ড যাবার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছে। এবার চাই টাকা, আমি চেনা জানা যত লোক আছে সবার কাছে গেলাম টাকা ধার নেবার জন্য। এই কাগজে সই, ও কাগজে সই করেই গেলাম যতদিন না পর্যন্ত টাকার সমাধান হল। সব ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি চুকে গেল। আমি এবার কল্পনা করলাম, ঐ তো আমার ভাইটি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। ঐতো জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার হাসি। তারপর ধীরে ধীরে জাহাজটা বন্দর ছেড়ে চলে গেলে আমি ভীষণ মনমরা হয়ে ভাবলাম, এ যাবৎ আমার ধারণা ছিল তাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো খুব সহজ বিষয়। কিন্তু অতি সহজ বিষয় ভালোভাবে শেষ হয় না। ছেলেটা চোখের বাইরে যেতেই নতুন স্যুট পরা রোগাটে ছেলেটার জন্য আজ আমার মায়া হতে লাগল।

আমাদের এই বিচ্ছেদের জন্য স্টিফেন ও তার পরিবারের লোকেরা ও তাদের ঈর্ষাই দায়ী। মনের কষ্ট চেপে রেখে দু তিন দিন পর আমি স্টিফেনের বাড়িতে গেলাম। তাদের বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের এবং শহরের সবচেয়ে বাজে জায়গায়। একদিন স্টিফেনদের বড় মানুষ মনে করেছিলাম বলে আজ লজ্জা হতে লাগল। স্টিফেন ও তাঁর কন্যাদের সব আশা ভরসা তাদের বাড়ির সেই ছেলেটিকে ঘিরে যে মন্ট্রিয়ালে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছে। ছেলেটি স্টিফেনের মেয়েদের কাছে রাজপুত্রের মতো। তাদের বাড়ির সামনে বা পেছনে কোনো উঠান বা খালি জায়গা নেই, 'স্লো-হোয়াইট ও সাত বামন' গল্পে যে বাড়িটার বর্ণনা আছে, স্টিফেনের বাড়িটাও সেইরকম।

যখন স্টিফেনের বাড়ি পৌঁছলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। দেখলাম কাকা একটা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল এই অল্প ব্যবধানে কাকার যেন বয়স বেড়ে গিয়েছে মনে হল। তার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে তারাও কম অবাক হয়নি। তারা সকলে ভেবেছিল আমি বুঝি তাদের সঙ্গে কোনো গুপ্তগোষ্ঠীতে গিয়েছি। কিন্তু কাকার কাছে গিয়ে আমি তার গালে চুমু খেলাম। কাকীমাকেও সম্মান জানালাম। তাদের মেয়েরা আমাকে না দেখার ভান করল। তবে অবশ্য একটু পরে তাদের একজন আমার জন্য চা নিয়ে এল। আমরা যেমন চিনি ও দুধ একসাথে মিশিয়ে চা খাই, তেমন নয়। চিনি, দুধ ও চা সব আলাদা আলাদা পাত্রে। যেমন খুশী ঢেলে নাও। এখন আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি সাত বামনের একজন এবং তারা যেমন বলেন আমি তেমন কাজ করি। আমি যা আশা করছিলাম এবার তাই ঘটল। তারা সকলে দায়ো-র খবর জানতে চাইল।

চা এর কাপে চামচ নাড়াতে নাড়াতে আমি খুব সহজভাবে বললাম, 'দায়োর কথা আর বলবেন না। সে তো এখন ইংল্যান্ড যাবার জাহাজে।' আমার কথা শুনে কাকার দোল খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি মৃদু হাসলেন। তার হাসিটা ঠিক আমার বাবার হাসির মতোই ছিল।

স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের জামাকাপড় পরিহিত স্টিফেনের বে-শরম স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিদেশে গেল? কাজের খোঁজে?' কাপে চামচ নাড়ানো বন্ধ করে আমি পরিষ্কারভাবে কেটে কেটে বললাম, 'উচ্চশিক্ষার জন্য দায়ো বিদেশে গিয়েছে।'

আমার কথা শুনে কাকা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও তো নিম্ন শিক্ষাই পেল না, তা আবার উচ্চশিক্ষা কী করে হবে?' দায়োর কাছ থেকে আমি নতুন অনেক কিছু শিখেছিলাম। সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে আমি বললাম, 'এটা অবশ্য আপনার মতামত'। স্টিফেনের কন্যাদের মধ্যে যে জন খুব সুন্দরী কিন্তু সবচেয়ে বেশি হিংসুটে, এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'তা কী বিষয় নিয়ে পড়তে গেল?'

- এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

আমার উত্তর শুনে স্টিফেনের বাড়ির সকলে একেবারে চুপসে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ঈর্ষায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। তাদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। এবার মেয়েরা গোল হয়ে আমার চারপাশে দাঁড়াল। আমি যেন সার্কাসের রিং-এর মধ্যে খেলা দেখানো মেয়ে।

দেওয়ালে টাঙানো বিদেশের অনেক ছবির ওপর আমার চোখ পড়ল। ওরা খ্রিস্টান, তাই হয়ত বিদেশ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান তাদের থাকা উচিত বলে মনে করে।

এই সময় সব কিছুকে নিয়ে তামাশা করার পুরোনো অভ্যাস স্টিফেনকে পেয়ে বসল। এই মুখোসটা ফসকে যাক তা যেন তিনি চান না। সেইজন্য তিনি মন্তব্য করলেন, 'এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হল সেই লোক যে বিমান বন্দর থেকে শহর পর্যন্ত ট্যাক্সি চালায়। তাই না?' তাঁর মজার কথা শুনে স্টিফেনের স্ত্রী ও মেয়েরা খিলখিল করে হাসতে থাকল। আমি দেখলাম আমি যদি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকি তাহলে হয়ত রুঢ় কথা বলে ফেলব। তাই তাদের কাছে বিদায় নিলাম কিন্তু ঐ পরিবারের সকলের জন্য আমার অন্তর ঘৃণায় অরপূর হয়ে থাকল। পরের দিন ভোর চারটায় ঘুম ভাঙার পর ঐ পরিবারের লোকদের কথা মনে পড়তেই বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল। এই বিতৃষ্ণা সারাটা দিন আমাকে যেন কুরে কুরে খেল। একটু বেলা বাড়লে আমি যখন লরি চালিয়ে রাস্তায় নামলাম তখনও এই ঘৃণাটা থাকল। সারাদিন কাজের মধ্যেও এই ঘৃণা আমার মনকে তেতো করে রাখল।

বিকলে কাজ শেষ হলে বাড়ির নিচে লরিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরে স্টিফেনের বাড়ি গেলাম। কেন যে যাচ্ছিলাম তা নিজের কাছেই পরিষ্কার ছিল না। কখনও ভাবছিলাম তাঁর বাড়িতে গিয়ে সবার মাঝে পুরোনো সম্পর্কটা ফিরিয়ে এনে বুঝিয়ে দেব যে মজার কথা শুনলে আমিও হাসতে পারি।

আমার চিন্তাটা বলা যায় নির্বোধের মতো। যা ভাবছি তা যদি করি, সেটা হবে আমার দুর্বলতার পরিচায়ক। আমরা যদি শত্রুকে চিনে নিতে পারি তাহলে সে আমাদের মেরে ফেলার আগে আমরা তাকে মেরে ফেলতে পারি। আমার মনে এই রকম ইচ্ছা জাগল, স্টিফেন যে উপহাস আমাকে করেছে তার যোগ্য জবাব দিয়ে

আসি। এই জবাবটা হবে তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র সব ভাঙচুর করে দেওয়া। এই ইচ্ছা নিয়ে আমি যখন তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি গেলাম, তখন আমার যা প্রয়োজন পড়ল তা হল, একটি শৌচাগার। কাকার বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে গেলাম ওদের শৌচাগারে। তারপর একসময় ওদের কারো সাথে কোনো বাক্যালাপ না করে রাস্তায় নেমে এলাম। তারপর শুরু হল হাঁটা, শুধু হাঁটা। এক সময় মাথা ঠাণ্ডা হলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের দিন আবার ভোর চারটায় ঘুম ভাঙল। আজ আমার মনের জোর একেবারে নেই। গতকালের ঘটনার জন্য, কাকার সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা জাগছিল। গতকাল আমার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল, আমার জীবন ও মন কোনোটাই আমার অধীনে ছিল না। আজ আমি, কাকা ও তার পরিবারের লোকেদের ছবিটা দেখলাম, পরক্ষণেই অসুস্থ ভাইয়ের শুয়ে থাকার ছবিটা মনের মধ্যে ফুটে উঠল। এই মুহূর্তে নিজেকে খুব রিক্ত মনে হল।

আমি শান্তি পাবার অপেক্ষায় আছি, কিন্তু কীভাবে সেটা আসবে তা জানি না। তবুও আমি শান্তির জন্য অপেক্ষা করি। প্রতিদিন আমি দায়ের চিঠির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু সে আর লেখেই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, স্টিফেনের বাড়ি যাই। কারো সাথে কথা বলি, আর না বলি, একবার তাঁদের বাড়ি যাই। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

একদিন স্টিফেন ও তাঁর ছেলের সংবাদ পেলাম। ছেলে মাদ্রিদে গিয়ে পড়াশোনা একেবারে ছেড়েই দিয়েছে। পড়াশোনার চাপ আর অন্যদিকে বাবার অনুপস্থিতি ছেলের মনের ওপর খুব চাপ ফেলেছিল। খারাপ খবরটা পেয়ে স্টিফেনের বাড়ির সকলে খুব মুষড়ে পড়ল।

বাবা বললেন, ‘আমি আগেই বলেছি স্টিফেনের ছেলেই একদিন তাকে ডোবাবে’।

বাবা এমনভাবে কথা বললেন যেন তাঁর খুব একটা বড় জয় হয়েছে। কোনো কাজ ব্যতিরেকে শুধু অপেক্ষা করেই তিনি বিজয়ী হয়ে যান। আমার মনের মধ্যে ঘৃণাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই ঘৃণার জন্যই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব, এই ঘৃণার জন্য আমার ইচ্ছা করে ওদের সব ক’টাকে একেবারে মেরে ফেলি।

সেই ছেলেটার পাঠানো মেপল গাছের পাতার কথা মনে পড়ে। আমি কল্পনায় দেখতে পাই ওভারকোট পরে হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে একটা ছাত্র চলেছে। সেই রাস্তাটা আজও আছে। রাস্তার ওপর অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে, কালো রেলিং-এর ধারে এখনও মেপল পাতা পড়ে আছে। মনে হল, আমিই তো ফ্রাংক রাস্তা দিয়ে ঐভাবে হেঁটে চলেছি। সুন্দর পাতা দেখে আমি একটা কুড়িয়ে নিলাম। আমার

ব্যাগের মধ্যে লাইন-টানা খাতা আছে। সেখান থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লাইনের ওপর আমার অর্থাৎ ফ্রাংকের নাম লিখলাম। স্বপ্ন ভেঙে গেলে দেখলাম আমি তো ফ্রাংক নই। চিঠি লিখবার কিংবা মেপল গাছের পাতা বা ফুল পাঠাবার মতো কোনো পরিচিত জন আমার এই পৃথিবীতে নেই।

সমুদ্রের জলের রং কালো, জাহাজের রং সাদা, চোখ ধাঁধানো আলো। জাহাজের যাত্রীরা কী রকম? তারা জল বন্দী, রাত্রে জাহাজের আলো কমে এলে তারা সব শুয়ে পড়ল। সকালে সাগরের রং নীল। কোথাও ডাঙা দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ যে দিকে যাচ্ছে যাত্রীরাও সেদিকে যাচ্ছে। তাদের তো কোনো স্বাধীনতা নেই। দিন ও রাত সব সময় জাহাজ চলতেই থাকছে। পরিবর্তন আসছে কেবল আকাশ ও সমুদ্রের জলের রঙে। বাকী সব বিবর্ণ, ধূসর।

আমি চাই না জাহাজটা থেমে যাক। জাহাজটা তীরভূমি ছুঁয়ে ফেলুক আমি সেটাও চাই না। আমার ঠিক নিচের বাস্কে একটা স্বর্ণকার চলেছে। তার মাথায় সব সময়, চব্বিশ ঘণ্টাই একটা টুপি আছে। দেখলে মনে হবে সে মজা করবার জন্যই টুপিটা পরেছে। কিন্তু লোকে যাই বলুক সে নিজে কিন্তু হাসে না। তার মুখে কেবল ফিরে যাবার কথা। কিন্তু আমি তা করব না। আমি যেন নিজের পাতা ফাঁদে পা আটকে ফেলেছি।

ভোরবেলা বৃষ্টির মধ্যে দিয়েও তীরভূমি দেখা গেল। সেটা সবুজ নয়, বলা যায়, সাদা। আসলে কোনো রং-ই দেখা যাচ্ছে না। জাহাজটা মিশ্র হয়ে দাঁড়ালে নিচে সমুদ্রের জলে একটা নৌকো আর কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম। লোকগুলো নড়াচড়া করছে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু কী বলছে তা শোনা যাচ্ছিল না। সমুদ্রের মধ্যে একটানা এতদিন কাটানোর পর নৌকো ও তার পাশে যা কিছু দেখছিলাম তা আর সাদা কালো নয়, দস্তুরমত রঙিন। যেখানে জাহাজটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে ছিল গভীর সবুজ জল, নৌকোর মধ্যে যে লোকগুলো ছিল তাদের গায়ের রঙ ছিল হলুদ এবং তাদের মুখের রঙ ছিল গোলাপি।

এই দেশটার মালিক ঐ লোকগুলো। এখানে তুমি হলে পরদেশী। বৃষ্টি ভেজা বাড়িগুলোর কোনোটাই তোমার নয়। ঐ যে উঁচু টিলা দেখা যাচ্ছে ওখানে তুমি গিয়ে মনের শান্তির জন্য দুদন্ড বিশ্রাম নিতে পারো না। কিন্তু তোমাকে ওখানেই যেতে হবে। যেই না যাত্রীরা সব তাদের মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে ঐ নৌকোয় উঠে যাবে, অমনি জাহাজটা আবার বাঁশি বাজাবে। জাহাজটা সাদা, বড় এবং সুরক্ষিত। ও তোমাকে বিদায় জানাবে বলে তাড়াতাড়ি করছে। বর্ণময় ছবি আবার বদলে গেল। এখন আবার মালপত্র, দৌড়াদৌড়ি, হৈ, চৈ, ট্রেন আর গাড়ির সারি।

দায়ো যতদিন পড়াশোনা করবে তার দেখাশোনা করব বলে আমি ইংল্যান্ডে এলাম। কিন্তু রেল স্টেশনে কিংবা জাহাজের ঘাটে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি একেবারে একা পড়ে গেলাম। অন্যরা কী করছে তা দেখে নিজেই চলবার চেষ্টা করলাম। কয়েকদিন পর আমি একটা কাজও পেয়ে গেলাম। প্যাডিংটনে আমি একটা বাড়িও পেলাম, বাসের নম্বর, জায়গার নাম সব পেলাম। ক্রমে ঋতু পরিবর্তন হল— শীত চলে গিয়ে গরম পড়ল।

কোনোরকমে এখানে টিকে থাকলেও বুঝলাম এটা আমার জীবন নয়। আমার মনে হতে লাগল জাহাজের জীবনের সাথে এই জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। আমি আরো বুঝলাম যা কিছু ছুড়ে ফেলি তাই হারিয়ে যায়।

বেশ কয়েক সপ্তাহ দায়োর খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। এমন সময় তার চিঠি পেলাম। আমাদের গ্রামের বাড়িতে চিঠি লিখে সে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছে। এতদিন কোনো খবর না দেওয়ায় সে আমাকেই দোষারোপ করেছে। তার চিঠিতে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কোনো উল্লেখ নেই। জানলাম, সে কী একটা পড়াশোনা করে ডিপ্লোমা পেয়েছে এবং লন্ডন শহরে এসে আরো লেখাপড়া করবার জন্য তার সাহায্যের খুব প্রয়োজন।

যে সিগারেট কারখানায় আমি কাজ পেয়েছিলাম সেখান থেকে ছুটি নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে আমি স্টেশনে গেলাম। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমি ভাইয়ের কাছে যাব। সে কেমন বাড়িতে থাকে, সেই শহরটাই বা কেমন, এ সব চিন্তা আমার মনকে ভরিয়ে তুলল।

দায়ো যে পাড়ায় থাকে সেখানে এক বাড়ির গায়ে লাগামশো আরেকটা বাড়ি। একেবারে রাস্তার ওপর বাড়িটা। দরজায় ধাক্কা দিতেই একজন বেঁটে বয়স্ক লোক এগিয়ে এল। দায়োর কথা শুনেই সে বলে উঠল, বাড়ি ভাড়া বাবদ বারো পাউন্ড বাকি রেখে দায়ো পালিয়েছে। সেই টাকা না মেটানো পর্যন্ত দায়োর কোনো জিনিস সে আমার হাতে তুলে দেবে না। একটা ছাপারছন্দ কামরার ভাড়া সপ্তাহে তিন পাউন্ড। এ তো দায়োর ছেলেমানুষির সুযোগ নেওয়া। ভাবলাম, লোকটার সাথে ঝগড়া করি, দুচারটে কড়া কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। কী পুরস্কারের জন্য এই সংযম তা আমি অবশ্য জানি না।

ঐ তো ঘরের এক কোণায় ‘কলম্বিয়ার’ টিকিট লাগানো দায়োর সুটকেশটা। আমি বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভারী সুটকেশটা নিয়ে রাস্তায় নামলাম। গত চার সপ্তাহ ধরে দায়ো কোথায় আত্মগোপন করে আছে জানি না। তবুও ভারী সুটকেশ নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম, আমার চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল কেবল দায়োকে।

স্টেশনে পৌঁছেও ঠিক করতে পারলাম না আমি নিজের বাড়িতে চলে যাব, না এই শহরে দায়োর খোঁজে ঘুরে বেড়াব। স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষ একেবারে জনশূন্য। চেয়ারের সিটগুলো ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা। এই রকম একটা শহরে দায়ো কীভাবে এতগুলো দিন কাটাল! ট্রেনে করে লন্ডন শহরে ফিরবার সময় আমি

দেখলাম, ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলা করছে, লোকজন কাজ করছে, কত বাড়িঘর, দোকানপাট। সেগুলো চোখে পড়তেই আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হল, তা হল, এই সব কিছুকে আমি ঘৃণা করি।

স্টেশনে নেমে আমি একটা বাসের জন্য অপেক্ষা করলাম। তারপর সেটা পালটে অন্য একটা বাসের জন্য অপেক্ষা করে শেষে যখন আমাদের পাড়ার রাস্তার মোড়ে এলাম তখন দেখি দায়ো দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশ যাবার সময় তার পরনে যে স্যুট ছিল, সেটাই আছে। দেখে মনে হল সে আমার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে করতে ভুলেই গিয়েছে তার অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যটা কী। দায়োর স্বাস্থ্য যেন ভালো হয়েছে। আমাকে বিমর্ষ দেখে তার চোখে জল এল। বাড়িতে এসে সোফায় দুজনে বসলে তার নোংরা জামা কাপড়ের দুর্গন্ধ আমার নাকে এল।

দায়ো আমার হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিলে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তাকে যে বকাঝকা করব সেই মনোভাবও আর থাকল না। এতগুলো দিন আমাকে ছাড়া সে থেকেছে। নিজের কষ্টের কথা কউকে সে বলতেও পারেনি। সে আমার কোলে মাথা গুঁজে বলতে লাগল, 'আমার নিজের ওপর আর কোনো আস্থা নেই। আত্মবিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি'। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম বেশ কয়েক সপ্তাহ তার মাথার চুল কাটা হয়নি, কলার তেলচিটে, ধুলো-কাদা মাখা পায়ের জুতা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, বাইরের রাস্তায় আলো জ্বলল। আমার সব অভিমান দূর হয়ে যেতে বুঝলাম, লোকের চোখে নিজেদের বড় দেখানোর চেষ্টা করাটা বোকামি। দায়োর যদি পড়াশোনা ভালো না লাগে তাহলে জোর করে কিছু করানো যায় না। তাকে তার পছন্দের রাস্তায় চলতে দেওয়াই ভালো। আমি জানতে চাইলাম, 'হ্যারে, তোর কি পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না?' প্রথমবার জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল না, কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে কেঁদেই চলল। প্রথম দ্বিতীয়বার করতে সে উঠল। তারপর নাক ঝেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ঠিক আছে দাদা, কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আমি পড়াশোনা করব। খুব ভালো করে, আমারও মনে হল, এতদিন যে কোনও কারণেই হোক, সে খুব মনমরা হয়েছিল। আজ মনে হল সে ঠিক উঠে দাঁড়াবে। সে যে ভালো করে লেখাপড়া করবে, তা একেবারে সত্যি।

রান্নাঘরে আলোটা জ্বালাতেই আরশোলাগুলোর ছোট্টাছুটি শুরু হল। পুটের ওপর, উনুনের ওপর, কড়াই-এর ওপর সর্বত্র আরশোলা হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি সেখান থেকে দুধ, রুটি বের করে আনলাম খাবার জন্য।

আজকে আবার পূর্ণিমার রাত। আমাদের বাড়ির ওপরের তলায় যে শ্বেতাঙ্গ মহিলাটি থাকেন, পূর্ণিমা রাতে তিনি স্বামীর সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করেন। স্বামীর সাথে ঝগড়া, লড়াই, গালাগালি চলতেই থাকবে যতক্ষণ না একজন অন্য জনকে বাড়ির বাইরে বের করে দিচ্ছে।

উনুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করে আমি আর দায়ো খেতে বসলাম। আমার বাড়িতে স্নানাগার নেই বলে আমার খরাপ লাগল। কাল সকালে ছয় পেন্স খরচ

করে ওকে বাইরের স্নানাগারে পাঠাব বেশ ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে বলে। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানোর জন্য ভেতরটা বেশ গরম হয়েছে। খাবারের গন্ধ পেয়ে একটা ইঁদুর গর্ত থেকে একবার বের হল, ভয় পেয়ে পরমুহূর্তে গর্তে ঢুকে গেল। এই সুযোগে একটা বাস্তু দিয়ে আমি গর্তের মুখটা চাপা দিয়ে দিলাম। গর্তের ভেতর থেকে ইঁদুরটা বাস্তুটাকে আঁচড়াচ্ছে শুনতে পেলাম। এই পরিস্থিতিতে আমি মজা করে বললাম, ‘আমার ঘরে সব কিছু থাকলেও একটা জিনিসের অভাব আছে। তা হল, মেয়েদের ব্যাগে রাখার জন্য হাত-আয়না। ওরকম একটা পাওয়া গেলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতাম।’

ঘরের ভেতরে মরা ইঁদুরের গন্ধ, বাসি খাবার ও জামা কাপড়ের গন্ধ থাকলেও বিছানা করে আমরা দুই ভাই শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে ঐ স্বামী ভদ্রলোকের চিৎকার ও দরজায় ধাক্কা দেবার ফলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিকে সব শান্ত।

দুঃখ ও ভয় কেটে গিয়ে সুখের সময় আসে। সুখের সময়টা এলে কাকা ও তাঁর পরিবারের লোকজনের কথা একেবারে ভুলে যাই। আমি ভুলে যাই মা-বাবার কথা, আখের খেত, কাদা, রাতের জাহাজ ও সকালের রহস্যাবৃত দেশের কথাও। ওসব যেন অন্য জন্মের মতো অনেক দূরের কথা যা ধরা-ছোঁয়ার অতীত। এক তলায় আমাদের এক ফালি ঘর আর ওপর তলায় অর্ধোন্মাদ শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে নিয়ে আমার সময় বেশ ভালোই কাটছিল। দায়ো আমার কাছে থাকত ফলেই লন্ডনের দিনগুলি অত্যন্ত মধুর ছিল আমার কাছে।

আমি যে জায়গায় শুতাম তার পেছনটা একটু ঠিকঠাক করে একটা আলো লাগিয়ে দিলাম। ওটা হল দায়োর পড়ার ঘর। এখানে সে একমনে পড়াশোনা করতে পারবে।

ধীরে ধীরে দায়োর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। সে যে লেখাপড়া সত্যিই ভালোবাসত তা প্রকাশ পেতে শুরু করল যখন সে একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষায় পাশ করে অন্য ডিপ্লোমাতে ভর্তি হল। তার জন্য যখন আমি নতুন জামা কিনে আনতাম তখন সেই পোশাকে তাকে কত সুন্দর দেখাত! ইতিমধ্যে সে আরো সুন্দর করে কথা বলা অভ্যাস করেছে— অত্যন্ত পেশাদারি ভঙ্গিতে সে কথা বলে। আমি নিজে জানি যে আমার লেখাপড়া বিশেষ কিছুই হয়নি আর সেই কারণেই আমি তার পড়াশোনায় কোনো বিঘ্ন ঘটতে দিতাম না। যেমন ভাবে সে চায় তেমন ভাবেই আমি তাকে পড়তে বলতাম। পাশ করে বের হতে যদি একটু বেশি সময় লাগে তাতেও ক্ষতি নেই কিছু। সে যে এখানে পড়াশোনা করছে আমার কাছে সেটাই ছিল বড়।

ক্রমে বড় শহরের জীবন আমার ভালো লাগতে শুরু করল। গ্রামাঞ্চলে কাজ করাটা হল একটা অপরাধ এবং একই সঙ্গে শাস্তি। তবুও লোকেরা মানিয়ে চলে।

ঐ অঞ্চলে আমিই নিজের মনিব হয়ে থাকতে চাইতাম। কিন্তু এখানে আসার পর কারখানাকে আমার ভালো লাগত। এখানে কেউ তোমার ওপর নজর রাখছে না, কেউ তোমাকে উপহাস করছে না। আবার তুমিও কাউকে ছোট করছ না। কারখানাতে তামাকের গন্ধটা আমার খুব সুন্দর মনে হয়। মেশিনের ভেতর দিয়ে একটা একটা সিগারেট বের হয় না। একটা বিরাট আকৃতির সিগারেট— মেশিন থেকে বের হয়। সেই মেশিনটাকেও আমার ভালো লাগে। কাজ যে এত মনোমুগ্ধকর হতে পারে সেই ধারণা আগে আমার ছিল না। কাজের জন্যই আমি চাইতাম এই কারখানাটা চিরকাল টিকে থাকুক আর রোজ সকালে আমি সেখানে কাজে যাই।

প্রতি শুক্রবার কারখানা থেকে আমাকে একশ সিগারেট দেওয়া হত। এই সিগারেটে একটা বিশেষ জলছাপ থাকে। পাকিস্তান থেকে আগত শ্রমিকরা মাঝে মধ্যে এই সিগারেট চুরি করত এবং তাদের মধ্যে দু-চার জন ধরাও পড়ে যেত। একদিন একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি উঁচু গোড়ালির জুতা পরে খুব কায়দা করে বেরিয়ে যাবার সময় প্রহরীরা তাকে আটকে দিল। পরে দেখা গেল, তার জুতার ভেতর প্রচুর তামাক রয়েছে। এ রকম ঘটনা কারখানাতে মাঝে মধ্যে ঘটেই থাকে। কারখানা হল একটা স্কুলের মতো— প্রথম প্রথম ভালো লাগে না, কিন্তু যত দিন যায়, স্কুলকে ততই ভালো লাগে।

লরি চালানোর বিস্তর ঝামেলা কারখানার চাকরিতে নেই। এখানে ছোট বাদামি রংয়ের খামে তোমার মাইনে চলে আসবে যেন তুমি একজন বড়দরের আমলা কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। নিয়মিত কাজ, নিয়মিত মাইনে এখানে। কয়েক মাস পর থেকে আমি কিছু টাকা জমাতে শুরু করলাম। মাইনের পুরো টাকাটা প্রথমে পোস্ট অফিসে জমাতাম। এইভাবে চলতে চলতে দেখলাম পোস্ট অফিসে আমার জমা টাকার পরিমাণ প্রায় এক শো পাউন্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কারখানার জীবন লরী চালানোর জীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। এখানে অন্যের সাথে কথা কাটাকাটি করতে হয় না, একজন অন্যজনকে সর্বদা খাটো করার চেষ্টা করেনা। নির্ধারিত সময়ে তুমি বাদামি রংয়ের খামে তোমার মাইনে পেয়ে যাবে যেমন বড় বড় সরকারি অফিসার কিংবা পেশাদার লোকেরা পায়। এখানে নিয়মিত কাজ, নিয়মিত মাইনে। কয়েক মাসের মধ্যেই আমি পাওনাদারদের সব বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে কিছুটা সঞ্চয়ও করলাম। এই সঞ্চয় আমি বাড়িতে রাখি না। পরিবর্তে আমি পোস্ট অফিসের সঞ্চয় প্রকল্পে রেখে দিলাম। এইভাবে করতে করতে আমি দেখলাম একশো পাউন্ড জমে গিয়েছে। একশো পাউন্ড, কারো কাছ থেকে টাকাটা ধার নেওয়া নয়, একেবারে নিজের পরিশ্রমের টাকা। এবার আমার মনে হয় আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। কতখানি সুরক্ষিত তা অবশ্য ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যাবে না, তবে সুরক্ষার বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে এবং ঐ অবস্থায় আমার একটা হাত বুকের ওপর চলে আসে।

খুব সুখের দিনে মানুষ অনেক কিছু বিস্মৃত হয়। একশো পাউন্ড জমিয়ে আমারও একই অবস্থা হল। আমি নিজেকে বিস্মৃত হলাম। আমার মাথায় অনেক নতুন ভাবনা উদয় হল। কী জন্যে আমি লন্ডনে বাস করছি তা আমি ভুলেই গেলাম। সঞ্চয় করে আমি খানিকটা নিরাপত্তা বোধ লাভ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন চাইছি আমার টাকা সুদে আসলে বহুগুণ বেড়ে যাক। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম ব্যাংকের কেরানিরা ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষরে প্রতি সপ্তাহে আমার খাতায় হিসাব লিখছে। এটা একটা নেশার মতো হয়ে গেল। আমি জানি, এসব একেবারে ছেলে মানুষি। আমার নেশার কথা ভাইকেও বলতে পারলাম না। এই গোপনীয়তা আমি একাকী উপভোগ করতে লাগলাম। আমার জমানো টাকা বেড়ে উঠুক— আরো বেড়ে উঠুক। এই নেশায় আমি আরেকটা কাজ ধরলাম। একটা খাবারের দোকানে রাতের একটা কাজও পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে।

এইভাবে আমি কাজের ভারে নিজেকে পিষে ফেলতে লাগলাম। সকাল ছাঁটায় ঘুম থেকে উঠে সাতটায় তৈরি। তখনও দায়ো বিছানায় শুয়ে আছে। আমি চললাম সিগারেট কারখানায় কাজে যোগ দিতে। সন্ধ্যা ছাঁটার সময় যখন ফিরতাম তখন কোনোদিন দায়ো হয়ত ফিরেছে, আবার কোনোদিন ফেরেনি। রাত আটটায় আমি চলে যেতাম রেস্তোরাঁতে কাজে যোগ দিতে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরতাম। আমার কাছে লন্ডন শহর মানে বাসে চড়া— সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে। লন্ডন শহর মানে, কারখানা, রেস্তোরাঁর পাকশালা, বাসাবাড়ি। এগুলোই আমার আনন্দের উপকরণ। এই অবস্থার সাথে তুলনা করা যায় একজন অসুস্থ এবং আরেকজন মোটা লোকের। অসুস্থ লোকটি যেন দেখতে চায় রোগা হতে হতে কতদূর পর্যন্ত শীর্ণ হওয়া যায়। মোটা লোকটি মেদ বাড়তে বাড়তে যেন জানতে চায় সে কত মোটা হতে পারে। তারা নিজেন্নের ছায়া দেখে সংগ্রহ করতে চায় তাদের গোপন সংবাদ। এ যেন তাদের একটা শখ। এত কাজের চাপে ঘুমোতে যাবার সময় আমি ক্লান্ত থাকি, সকালে ঘুম ভাঙার সময় পরিশ্রান্ত থাকি। তবে হ্যাঁ, আমি এই ক্লান্তি উপভোগ করি। এটাই আমার গোপনীয়তা। এইভাবে প্রতিমাসে আমার জমার খাতায় যোগ হয় পঞ্চাশ, ষাট পাউন্ড। সকালে দু-চার ঘণ্টা কেটে গেলে আমার ক্লান্তিটাও কেটে যায়।

আমার ধারণা, দায়ো যদি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে ফেলে, তা হলে সে আমাকে উপহাস করবে। তবে সে কিছু বলে না। কিন্তু এটাও সত্যি যে লন্ডনের একজন ছাত্র হিসেবে সে ভালোভাবে মেনে নেবে না যে তার দাদা একটা খাবারের দোকানে পাচকের কাজ করে। এই ভাবে দিন কেটে যায়। এক বছর পর, দু-বছর পর আমার টাকাটা যখন বেশ বেড়ে গেল তখন নিজেকে বেশ বলবান মনে হতে লাগল। এখন আমি কোনো কিছুকে পরোয়া করি না। লোকে আমাকে কী চোখে দেখে কিংবা আমার সম্বন্ধে তারা কী ভাবে, ওসব নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। যখন আমার পয়সা ছিল না তখন এই বস্তিগুলোকে ঘৃণা করতাম, আমি দিবা স্বপ্ন দেখতাম যে কেবল দায়োর জন্য নয়, নিজের জন্যও আমি নতুন কাপড়চোপড়

কিনছি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। বর্তমানে জামা কাপড় নিয়ে আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। আমি ঐ বস্তি থেকে বের হয়ে কারখানায় কুলিগিরি করতে যাই। আমার পরনে থাকে কুলির পোশাক। লোকে যদি এ সব দেখত তাহলে আমি বেশ মজা পেতাম। তারা কি বিশ্বাস করবে পোস্ট অফিসের খাতায় আমার নামে হাজার, বারোশো, দেড়হাজার পাউন্ড জমা পড়েছে?

লন্ডন শহরের সব কিছুই ভালো। লোকে এ নিয়ে কত কথা বলাবলি করে। এই শহরে থাকতে পারব এমন কথা কি আমি কখনও ভেবেছিলাম? এই শহর নিয়ে আমার একটাই ভীতি ছিল, তা হল— পড়াশোনা শেষ করে দায়ো যদি এই শহরে আমাকে একাকী ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যায়। জীবন তো আমার সেখানেই শেষ।

তবে সত্যিই, সুখের ছিল দিনগুলো। বস্তিতে থাকলেও দায়ো ছিল আমার সাথে। প্রতিটি সকালে আমি যেতাম কারখানায়, প্রতিটি সন্ধ্যায় রেস্টোরাঁতে। তবে সেইসব দিন আজ আমার কাছে স্মৃতি। এ সব কি পাগলামো? মানুষ নিজেকে ওভাবে বোকা বানাতে পারে নাকি? লোকগুলোকে দেখ, আশেপাশে তাকাও, তোমার মনে হবে এ যেন এক প্রেতপুরী। সব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে চলেছে। আমি যে দৃষ্টিতে এই শহরকে দেখি, অন্য কেউ সেভাবে দেখবে না। আমি যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করি অন্য লোকে তা বুঝবে না।

ফ্রাংক হল আমার বন্ধু, একমাত্র বন্ধু। সে আমাকে সাহায্য করে। তবে কারখানায় ওপরওয়ালা যখন অপমান করে কিংবা রেস্টোরাঁ-য় লোকের যখন আমার সঙ্গে মারামারি করে, তখন সেইসব বিষয় নিয়ে সে আমাকে এত প্রশ্ন করতে থাকে যে আমার বিরক্তি এসে যায়। আসল কথা হল, সে চায় আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, তার খোঁড়া গর্তে আমি পড়ে যাই। সে চায় অস্ত্রহীন তিরিশরে আমাকে ঠেলে ফেলতে।

কি রেস্টোরাঁতে, কি বাস স্টপে, কি বাসের মধ্যে— আমার প্রতি ফ্রাংকের আচরণ সর্বত্রই সমান। সে যেন দুনিয়াকে বলছে চায়— এই লোকটি অত্যন্ত দুর্বল এবং আমার ছত্রছায়ায় আছে, তোমরা এর থেকে দূরে সরে যাও। তার এই আচরণে আমিও শক্তিহীন হয়ে পড়ি। সুন্দর টুইডের কোট ও চকচকে জুতা পরে সে পাশে থাকলে আমার মনে হয় একটাও টুইডের জ্যাকেট কিনবার ক্ষমতা আমার নেই।

এখন আমার টাকা নেই, কিছুই অবশিষ্ট নেই কেবল এই স্যুটটি ছাড়া। এই স্যুটে এখন ঘামের গন্ধ। এখনকার সব কিছুতেই দুর্গন্ধ। এ তো আমার দেশের বাড়ি নয় যেখানে সব সময় জানালা খোলা থাকে আর খোলা হাওয়ায় সবকিছু কেমন পরিষ্কার থাকে। এই শহরে সব কিছু বন্ধ। বাসে চড়ে যাবার সময়ও খোলা বাতাস পাওয়া যায় না। সব জানালা বন্ধ।

আজ এই শহরের কোনো এক প্রান্তে দায়ো-র বিয়ের আসর বসেছে। সে যে কোন্ জায়গায় আছে তা বোধ হয় দায়ো নিজেও জানে না।

সকালে কাজ, সন্ধ্যায় কাজ, সেই সঙ্গে টাকা জমানো, সুদে আসলে টাকা বেড়ে যাওয়া, এ নিয়ে ভালোই চলছিল। কিন্তু সঞ্চয় দু-হাজার পাউন্ডে পৌঁছলে আমার মনে হল এভাবে আর পেয়ে ওঠা যাচ্ছে না। দুটো চাকরি করা খুব অসম্ভব। এত পরিশ্রমে শরীর টিকবে না। তাই আমি পোস্ট অফিস থেকে পুরো টাকাটা তুলে নিলাম। কারখানার কাজ, রেস্টোরার কাজ দুটোই ছেড়ে দিলাম।

এটা অজ্ঞতা, এটা পাগলামি। টাকা থাকলে এক ধরনের পাগলামি আসে। টাকা থাকলে মনে জোর আসে, মনে হয় টাকা উপার্জন করাটা খুব শক্ত কাজ কিছু নয়। আজ আমার হাতে যে দুহাজার পাউন্ড আছে তা জমাতে পাক্কা চার বছর সময় লেগেছে। এত টাকা হাতে পেয়ে আমি ভুলেই গিয়েছি যে আমার বাবা মাসে দশ পাউন্ডের বেশি আয় করতে পারেননি। ঐ টাকাটুকু ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে তাঁকে উপার্জন করতে হত। সে সামান্য টাকায় এত বড় সংসার প্রতিপালিত হয়েছে। মাসে দশ পাউন্ড হিসাবে উপায় করলে দু হাজার পাউন্ড উপায় করতে একজন মানুষের দুশো মাস মানে প্রায় পনেরো, ষোলো বছর সময় লাগে।

টাকা থাকলে মানুষ কী করে তা আমি দেখেছি। লোকে একটা লরি কেনে। তার থেকে দুটো কেনে, তার থেকে আরেকটা। হাতে টাকা পেয়ে আমিও ঠিক করলাম আমি ব্যবসায়ে এই টাকাটা খাটিয়ে বড়লোক হব। ব্যবসার আমি কিছুই বুঝি না। লন্ডন শহরটাকেও আমি চিনি না। তবুও ঠিক করলাম, আমি ব্যবসা করব।

আমি যখন সিগারেট কারখানাতে কাজ করতাম তখন আমার মাথায় একটা ভাবনা এসেছিল এবং সেই ভাবনাটা এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমি ঠিক করলাম একটা ডাল-রুটির দোকান করব। রেসকোর্স বা এই সমস্ত জায়গায় এই ধরনের খাবারের দোকান দেখা যায়। দোকানের এক দিকে থাকবে তরকারির কয়েকটা গামলা আর অন্য দিকে থাকবে রুটি, চাপাট কিংবা ডালপুরি। এই ধরনের দোকান খুললে চলবে ভালোই। কিন্তু এই ব্যাপারে দায়ের কোনো আগ্রহই নেই। জানি না, এত ছোট ব্যবসা করতে হয়ত তুমুল লজ্জা হবে অথবা লন্ডন শহরে ডাল-রুটির দোকান মানে একটা হাসির খোরাক। আবার এমনও হতে পারে এই ধরনের দোকান মানে দেশের এবং খুব সাধারণ জীবনের স্মৃতি।

আমার প্রচেষ্টায় প্রথম ধাক্কাটা খেলাম সম্পত্তির দাম থেকে। কী চড়া দাম রে বাবা! তবুও আমি দমে গেলাম না। পাগলামি আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি আর পিছিয়ে যেতে পারি না। আমার তো তখন ট্রেন ধরবার মতো তাড়া। কীভাবে সব টাকাগুলো বিনিয়োগ করতে পারি সেই জন্য আমি সর্বদা সচেতন। বেশ কিছু টাকা হাত বদল করে আমি খানিকটা জমির ইজারা নিলাম। কিন্তু হাত থেকে টাকাটা বেরিয়ে যেতেই বুঝলাম আমি খুব বোকার মতো কাজ করেছি। আমার কষ্ট হতে লাগল।

পরবর্তী চার-পাঁচ সপ্তাহে আমার সারা দুনিয়াটা বদলে গেল। মনে হল, আমার সব শক্তি ও পয়সা কড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে। লোকে আমার সম্বন্ধে কী বলে বা

ভাবে, আগে তা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন আমি একেবারে নিঃশ্ব। আমার অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড় নিয়েও আমার মনটা ভারী হয়ে থাকে। ছোটখাটো অভাব, যেমন একটা বারো পাউন্ড দামের জ্যাকেটের অভাবও আমার মনকে পীড়া দেয়। ডেকোরেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, সবজি ও মশলা সরবরাহকারীদের পাওনা মেটানোর পর আমি দেখলাম আমার পকেট একেবারে খালি।

আমাদের দেশে অর্থের প্রয়োজন পড়লে খাবার টেবিলটা বাইরে বের করে তার ওপর কিছু জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতে পারি বিক্রির জন্য, কিন্তু এদেশে তো নিয়ম কানুন আলাদা। এখানকার সরকারি লোকেরা যাদের অধিকাংশই যুবক, হাতে একটা সরকারি কাগজ নিয়ে এসে নানাভাবে পীড়ন চালাবে। এরা অন্যকে সন্দেহ করে খুব। এরা হাসতে জানে না, আমরা যেটাই করব সেটাই ওদের অপছন্দ। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করতে খুব পটু, এরা লোকের মানসিক শান্তি নষ্ট করতে ওস্তাদ। ব্যবসায়ে টাকা ঢেলে তো আর হাত গুটিয়ে নেওয়া যায় না। তাই আমাকেই বাজার করতে হয়, রান্না করতে হয়, দোকান পরিষ্কার রাখতে হয়। জায়গাটা এই ধরনের ব্যবসার পক্ষে মোটেই ভালো নয়; তা যতই আমি ভোরে উঠি না কেন আর যত কঠোর পরিশ্রমই করি না কেন।

বুঝতে পারছি আমি নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেলছি। অল্প যে মনোবলটুকু ছিল তাও যেন হারিয়ে ফেলছি। এক সময় ভাবতাম, পয়সা জমিয়ে জমিয়ে গোটা লন্ডন শহরটাকে কিনে ফেলব। এখন নিজের মুখামি, কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করি। পোস্ট অফিসে রাখা দু হাজার পাউন্ডই ছিল আমার শক্তি, যেমন স্যামসনের মাথার চুলই ছিল তার শক্তি।

কমবয়সী ঐ সরকারি কর্মচারীগুলো প্রায়ই আমার এখানে আসে। তারা নিজেদের মধ্যে যে কী বলাবলি করে তা বুঝি না। তবে ওদের নিয়ে চলা বড় মুশকিল। ভালো ভালো জামা কাপড় পরে তারা আমার এখানে আসে যেন সমস্যা সৃষ্টি করতে। মাঝে মাঝে তারা আমার দোকানে খায় কিন্তু পয়সা দেয় না। শুধু তাই নয়, খাওয়া-দাওয়া করে কাঁটা চামচগুলো গায়ের জোরে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে চলে যায়। এই হল এদের বীরত্ব, এই হল এদের শিক্ষা। আমার পাশে দাঁড়াবার মতো কাউকে আমি খুঁজে পাই না।

আমাকে যখন দুটো চাকরি করতে হত, মানে কঠিন পরিশ্রমের দিন, তখন যা বলা যেত, সমৃদ্ধির দিনে এসব নিয়ে তা বলা যায় না। এসব নিয়ে মন খারাপও করতাম না। কিন্তু আজকাল এই ছেলে ছোকরাগুলোর চাল চলন, কথাবার্তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এদের আমি ঘৃণা করি যেমন আগে আমার কাকা স্টিফেন ও তার পরিবারের লোকজনদের করতাম। এই ঘৃণা যেন আমাকেই অসুস্থ করে তোলে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, দায়ো আমাকে একটু সাহায্য করলেই পারত। যতই হোক সে আমার ভাই। কঠোর পরিশ্রম আমি করেছি তার জন্যই তো। তার জন্যই জাহাজ ধরে আমি এখানে এসেছি। সে আমার সাথে এই বস্তিতে ছোট্ট ঘরটাতে থাকলেও তার জগত যেন আলাদা। আমার সমস্যা মানে আমারই সমস্যা। তার কিছু যায় আসে না। রবিবারে আমরা দু'জনে এক সাথে খাই, শুধু এইটুকুই আমাদের মেলামেশা। সে তার পড়াশোনা কিংবা নিজের কাজ নিয়েই থাকে। রাত্রিতে যখন ফিরি তখন মাঝে মাঝে দেখি তার ঘরে আলো জ্বলছে। কখনও তাকে মাঝরাতে বিড়ালের মতো লঘুপদে বাড়িতে ঢুকতে দেখি। সকালে আমি যখন কাজে বের হয়ে যাই তখনও সে ঘুমোয়। সে তো পাশেই আছে, তবুও নেই। তার প্রতি আমার মনটা বিরূপ হয়ে পড়েছে।

যেভাবে সে কথা বলে প্রথমে সেটাই আমার অপছন্দের কারণ হয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তনটা খুঁজবার চেষ্টা করি। এক সময় সে মাথায় তেল দিয়ে সোজাভাবে চুল আঁচড়াত এবং তার মুখের মধ্যে একটা লাবণ্য ছিল। এখন মজুরদের মতো তার মুখে একটা ছাপ পড়েছে। অত্যধিক পরিশ্রম ও রোদে ঘোরাঘুরির ফলে বাবার মুখে কাঠিন্য এসেছিল। কিন্তু ভাইয়ের মুখের আর বাবার মুখের কাঠিন্য দুটোই আলাদা ধরনের। সে এমনভাবে কথা বলা শুরু করবে যে তাকে থামানোর জন্য আমাকে বলতে হয়, 'দায়ো, একটা দেশলাই আনো তো'। তার বাচনভঙ্গি ও বাক্যচয়ন আমার একেবারেই ভালো লাগে না। এক নাগাড়ে সে কথা বলতে ভালোবাসে যেন লন্ডন শহরে তার সাথে কথা বলবার মতো কোনো মানুষ নেই কিংবা দিনের শুরুতে সে কথা বলা শুরু করেছে।

ডাল-রুটির দোকান নিয়ে আমার চিন্তার শেষ নেই ঠিকই, তবুও দায়োকে নিয়েই আজকাল আমার বেশি চিন্তা হয়। আর তো সিগারেট কারখানায়—ঝগড়াটে, অশিক্ষিত মেয়েগুলোর মাঝে ফিরে যাওয়া দরকার নয়। ঐ অধ্যায় শেষ করে ফেলেছি। এখন আমার ধ্যান জ্ঞান বলতে আমার ভাই দায়ো। আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখি, সে কেমন করে হাঁটে, কেমনভাবে দাড়ি কামায়। সে যে মেয়েলি চণ্ডে কথা বলে তা বোধ হয় নিজে বোঝে না। আমি কখনও মুখ ফুটে সে কথা তাকে বলি না। আমি কেবল তাকে লক্ষ করে যাই।

এক রাতে দায়োকে নিয়ে আমি একটা নোংরা স্বপ্ন দেখে ঠিক করলাম তাকে বুঝিয়ে বলব যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি এবং আমার মনে তার প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই।

আমি তার শোবার ঘরে ঢুকলাম। পর্দার মধ্যে দিয়ে ভোরের আলোর আভা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলাম সরু লোহার খাটে ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে। ছেলেটার মুখটা একেবারে চাষাড়ে। আমার কিনে দেওয়া লাল অয়েল ক্লথ দিয়ে

ঢাকা টেবিলের ওপর রয়েছে একটা টেবিল ল্যাম্প যেটা জ্বালিয়ে সে পড়াশোনা করে। টেবিলের ওপর রাখা আছে মোটা মোটা সব বই। কতকগুলো চটি বই আছে দেখতে পেলাম। সেগুলো হয়ত সে অবসর সময়ে পড়ে। আমাকে সে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে একটা রেডিও কিনিয়েছিল, সেটাও আছে টেবিলের ওপর।

ছেলেটার মুখে মুটে-মজুরের মুখের মতো একটা কঠিন ছাপ পড়েছে। ঘুমন্ত ভাইটার মুখে ক্লান্তি ও পরিশ্রমের ছাপ, সংকীর্ণ একটা কামরা, জানালার বাইরে আলো-আটকানো সিমেন্টের একটা দেওয়াল, সূর্যালোক বঞ্চিত একটা উঠান দেখে আমার মনটা ভারী হয়ে গেল। সে কোথায় চলেছে, তার কিংবা আমার ভবিষ্যৎই বা কী, সে আবার জাহাজে চড়ে আমাদের দেশে ফিরে যাবে কিনা আর সেখানে তার চেনা রাস্তায় গাড়ি চালাবে কিনা— এই সব কত চিন্তা আমার মনকে বিষণ্ণ করে তুলল। দেখলাম, একটা চায়ের প্লেটকে আমার ভাই ছাইদানি হিসাবে ব্যবহার করে এবং তার টেবিলে যে সিগারেটের প্যাকেট রাখা আছে, তা অত্যন্ত দামি। তার হাতের আঙুলগুলো যে এত নোংরা হয়ে গেছে তা আগে কখনও মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। তার হাতের ওপরভাগটা আর নমনীয় নেই। এক সময় আমার ভাইটি কী চমৎকার ভঙ্গিতে হাঁটত!

হিম-শীতল ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমি তাকে দেখে চলেছি এমন সময় সে পাশ ফিরল এবং একবার চোখ মেলে তাকাল। এক মুহূর্তের ব্যবধানে আমাকে চিনতে পেরে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বিছানায় উঠে বসল। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে সে ভয় পেল মনে হল। আমি দেখলাম যে বিছানায় সে শুয়েছিল সেটা কতখানি নোংরা। সভয়ে সে জানতে চাইল, কী হয়েছে তার চোখে মুখে এমন একটা আতঙ্ক যেন আমি তাকে হত্যা করতে এসেছি। সে আর কোনো কথা বলতে পারল না। সে যেন কথা বলবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমি একটা মজদুরের মুখ দেখলাম ভাইয়ের মধ্যে।

তার মুখটা দেখে আমার মনটা প্রচণ্ড বিষণ্ণ হয়ে গেল— বিষণ্ণতার একটা স্রোতও আমার শরীরে বয়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম, ‘দায়ো তুমি এখন কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছ?’

ভয়টা তার মুখ থেকে অপসারিত হয়ে যেতে লাগল। সে বিরক্ত হবার চেষ্টা করল বিরক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে বলল, ‘তুমি কি পুলিশের লোক নাকি?’ কথা বলবার সময় তার সম্প্রতি অর্জিত উচ্চারণ ভঙ্গি ছিল না। সে আগেকার স্বাভাবিক ভাইটির মতো স্বাভাবিক আচরণ করল— কোনো কৃত্রিমতা নেই। তাকে বোঝালাম যে আমাকে আজকাল দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ কথাই তো আমাদের মধ্যে হয় না আমার উত্তর শুনে সে ফের কৃত্রিম উচ্চারণ ভঙ্গিতে ফিরে গিয়ে বলল, ‘অবশ্য জানবার অধিকার তোমার আছেই। যাই হোক জানতে চাও তাই বলছি, তুমি বা অন্য লোকের ধরেই নিয়েছে যে পড়াশোনা করাটা এখানে খুব একটা সহজ কাজ। তা কিন্তু নয় এখানে অনেকেই পড়াশোনা করবে বলে আসে কিন্তু...,’ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘এ সব তুমি কী বলছ?’ তার উত্তরে সে বলল, ‘শুনে রাখো, আমি যা পড়ছি ত

হল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। বুঝলে কিছু? আবার বলছি— কম্পিউটার প্রোগ্রামিং।
আশা করি, এতে তোমার কোনো আপত্তি হবে না।’

টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম, ‘এত দামি সিগারেট।’ ভাই সঙ্গে সঙ্গে জানাল দামি সিগারেট ছাড়া সে খেতেই পারে না। সেই মজদুরের মুখ। মনে হল এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি হয়ত তাকে চড় মেরেই বসব।

সারাটা দিন একটা লজ্জাবোধ আমাকে ঘিরে থাকল। দোকানে ঐ শ্বেতাঙ্গগুলোর সাথে কিছুটা ঝামেলা হল। মনে হল, আমার হাতে স্প্রিং লাগানো তার আছে। যে কোনো সময় সেটা প্রসারিত হয়ে ঐ শ্বেতাঙ্গগুলোর মুখের ওপর চড় কষিয়ে দেবে। দোকান বন্ধ করে একটা বাস ধরে আমি যখন ফিরলাম তখন বাসস্ট্যান্ডে একটা কালো কুকুর আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। জন্তুটার গলায় একটা চেন বাঁধা ছিল বলে বুঝলাম ওটা কারো পোষা কুকুর। রাস্তায় বেশ আলো থাকলেও বৃষ্টির জন্য এখানে সেখানে অল্প কাদাও ছিল। কুকুরটা যে ভুল বুঝে আমাকে অনুসরণ করছে তা বোঝাতে আমি ওটাকে ‘হ্যাট হ্যাট’ শব্দ করে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও সেটা গেল না। সে আমাকে দেখে প্রিয় বন্ধুর মতো আচরণ করতে লাগল। লেজ নেড়ে সে আমার কাছাকাছি এসে গেল তারপর আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালে সেও আসতে লাগল। এক সময় আমি বাড়িতে ঢুকলে সেও ভেতরে চলে এল। তারপর ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। তার পায়ের ছাপে সারা ঘর ভরে গেল।

দায়ের ঘরে ঢুকে দেখবার চেষ্টা করলাম সে আছে কিনা। চতুষ্পদ জন্তুটাও ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখলাম তার নোংরা বিছানার চাদরটা গোল করে পাকিয়ে বিছানার মধ্যখানে রাখা আছে, বালিশের কভারটা তেলচিটে, ছাইদানিটা সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি। হায় ঈশ্বর!

আমার মনে হল অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। এক কাপ ওভালটিন বানিয়ে আমি খেতে বসলে কুকুরটা দৌড়ে আমার কাছে এল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ এমনভাবে নাড়তে লাগল যেন সে কিছু বলতে চায়। তার মনোভাব বুঝতে পেরে তার পেছন পেছন গিয়ে সদর দরজা খুলতেই একলাফে সে রাস্তায় গিয়ে নামল। সে যেন এখানে এসে একটা বেঠিক কাজ করেছিল এমন ভঙ্গিতে সে ছুটে পালাল, একবারও পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাল না। কুকুরটা চলে গেলে আমি আবার সঙ্গীহীন হয়ে পড়লাম।

আমি শুয়ে পড়ার অনেক পরে লঘুপদে দরজা খুলে দায়ো এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে আমি যখন বাজারে যাচ্ছি তখন ট্রেনের মধ্যেই একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। তাতে লেখা আছে— আগামী দিনের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর একটা কোর্স করে নিজেকে তৈরি করে রাখুন।

এবার সব কিছু আমার বোধগম্য হল। কিন্তু ঐ যে অপছন্দের ভাবটা কিছুতেই যেন গেল না। আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। বেশ কয়েকটা সিগারেট খেলাম।

আশেপাশের লোকেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। শেষে আমি অন্য দিকের প্লাটফর্মে চলে গেলাম। সেখানে যাত্রী সংখ্যা ছিল খুব অল্প। পরে একটা ট্রেন ধরে আমি আবার বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু সেই অনুভূতিটা থেকে গেল। একটা মজদুর যে দামি দামি সিগারেট খায়। মনে হল, আমি যেন তার নোংরা বিছানা, উপচে-পড়া ছাইদানি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ভাইটাকে কোলে করে বিছানা থেকে নামাচ্ছি এবং মিথ্যেবাদী ভাইটার গালে চড় মারছি।

বাড়ির সামনে এসে দরজার বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। নোংরা ডাস্টবিন, ভেঙে পড়া পাঁচিলের গায়ে কয়েকটা অযত্ন-লালিত গাছ। তাদের ডালপালাগুলো কেউ ছেঁটে দেয় না, বাড়ির জানালাটার গায়ে ধুলোর পাহাড়। বাগানের মধ্যে এখানে ওখানে কাগজের টুকরো ও লম্বা লম্বা ঘাস। পূর্ণিমা রাতে যে মহিলাটি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান তাঁকেই সদর দরজা খুলতে দেখলাম। সম্প্রতি হয়ত পূর্ণিমা পার হয়েছে তাই তাঁর চেহারা একটা ক্লান্তির ছাপ। তাঁর শরীরে যে একটা কালিমা পড়েছে তা এক নজর দেখলেই টের পাওয়া যায়। মহিলাটি আমাকে দেখে একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। দরজার সামনে রেখে যাওয়া দুধের বোতল ওঠাবার জন্য একটু ঝুঁকতেই তার মাথার পাতলা হয়ে আসা চুল দেখতে পেলাম। ভাবলাম, আমি তাকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে অভিবাদন করি। এরকম সৌজন্য বিনিময় আমরা অবশ্য পাঁচ বছরে একবার করি। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা মনেই থেকে গেল। আমি ওখান থেকে অন্যত্র সরে গেলাম। ভাগিন সেদিন চলে গিয়েছিল।

ওখান থেকে সরে গেলেও আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যেতে পারলাম না। বাজারেও আমার আর যাওয়া হল না। আমি একটা কোম্বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কেন যে অপেক্ষা করছিলাম তা নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। এক সময় দায়াকে বইপত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। দূর থেকে তাকে দেখেই আমি পা চালিয়ে বাস স্ট্যান্ডে চলে গেলাম। বাস আসতেই আমি উঠে ডানদিকের সীটে বসলাম। আমি জানি, শব্দের স্টপে আমার ভাই ঐ বাসেই উঠবে। এটা একটা অস্বাভাবিক আচরণ। দায়ো যেন আমার কেউ নয়, এমনকি তার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত নেই। আমি সেই ভাবে তার ওপর নজর রেখে চলেছি। তাকে দেখে মনে হল কোনো রকমে চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে, পরনের পোশাক নোংরা। তবুও ভাইটি আমার খাবার বেলায় দামি সিগারেট খায়। বাসে চড়ে দোতলায় গিয়ে বসল সে।

অক্সফোর্ড সার্কাসে বাস থেকে সে নামলে আমি মোড়ের মাথায় নামলাম। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে অনুসরণ করে চললাম। সে একটা বড় বাড়িতে ঢুকলে আমি বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করলাম। এইভাবে প্রায় এক বেলা কেটে গেলে আমি দেখলাম সে উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটাচ্ছে, ভারতীয় খাবারের দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ কয়েকজন আফ্রিকার লোকও এদিক ওদিক

ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি না, এই ছেলেগুলো কী পাঠক্রম পড়ছে এবং এতে কার কত মঙ্গল হবে।

একটু এগিয়ে গেলে আর কোনো দোকান চোখে পড়বে না, রাস্তার ধারে উঁচু কালো রেলিং দিয়ে রাস্তার দুটো ধার ঘেরা আছে। ব্রিটিশ যাদুঘরের পাশে যে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর আছে দায়ো সেই দিকে পা বাড়াল। খোলা মাঠটায় অসংখ্য বিদেশী পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তারা দু-চারদিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে। দায়ো বই হাতে নিয়ে আর গায়ে কোট পরে তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কষ্টের বিষয় হল, দিনের শেষে ঐ বিদেশী পর্যটকদের নিয়ে যাবার জন্য বাস আসবে, তাদের বাড়ি আছে— কয়েকদিন পর তারা বাড়িও ফিরে যাবে। দায়োর জন্য কষ্টে, বেদনায় আমার বুকটা একেবারে ফেটে যেতে লাগল।

এরপর দায়ো ভেতরে গেলে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করব ঠিক করলাম। পর্যটকদের দেখে খানিকটা সময় কাটালাম। খানিকটা সময় কাটালাম খোলা জায়গার পাশে দাঁড়িয়ে। খানিকটা সময় কাটালাম রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। এক সময় পায়চারি করতে করতে টোটেনহ্যাম কোর্ট রোডে পৌঁছে গেলাম। ঐ তো ওখানকার ভারতীয় রেস্টোরাঁটা চোখে পড়তেই আমার নিজের দোকানের কথা মনে পড়ল। এই দোকানেই আমি নিজেকে বন্দী করে ফেলেছি। আরে, এখন যে দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভিড়ের মধ্যেই ছুটতে শুরু করলাম। জোর কদমে সিঁড়ি টপকে, বিদেশীদের পাশ কাটিয়ে আমি যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন দেখলাম আমার ভাই দায়ো রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চি হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে ধূমপান করছে। তখনও তার হাতে বই ধরা আছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা জন্মাল। আমি তাকে সর্বসাধারণের সামনেই শাস্তি দিতে চাইলাম। ইচ্ছা করল, এত বড় একটা প্রত্নতত্ত্বপাঠশালায় আর লুকিয়ে না রেখে সকলকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতেই আমার মনের বাসনার পরিবর্তন হল। একটা থামের আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেলে তার ওপর নজর রাখলাম। কেন আমার মধ্যে এই পরিবর্তন এল? তার কারণ কী? তার মুখের বিষণ্ণতা নয়, বেপরোয়াভাবে সে সিগারেট খাচ্ছে তাও নয়। তার বসে থাকার ভঙ্গিটা যে লোককে দেখাবার জন্য নয় সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম তার মুখটা একটা সর্বহারার মুখ, একটা হেরে যাওয়া মানুষের মুখ। একটা ক্লান্ত, কাঁচা বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের মুখ। আমাকে এখন দেখলে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠবে।

মাথার ওপর মেঘহীন আকাশে প্রখর সূর্য, পার্কের সবুজ ঘাস বেশ মসৃণভাবে ছাঁটা। লনের ওপর হাঁটলে মাঠের ভেজা ভাব বেশ বোঝা যায়। দূরে কয়েকটা স্কুলে পড়া মেয়ে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। পথ-চলতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তারা বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। বাস আসছে আবার চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সি আসছে আবার মোড় নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বাস-ট্যাক্সি

থেকে অসংখ্য মেয়ে পুরুষ নামছে আর উঠে চলে যাচ্ছে। সারা দুনিয়াটা ছুটে চলেছে। শুধু আমি আর আমার ভাই হলাম ব্যতিক্রম। আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলাম। আর ওপাশে আমার ভাইটি বেঞ্চের ওপর বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়েই চলল। তার পরনে এতই কম দামি একটা সুট যা ইস্তিরির ভাঁজ ধরে রাখতে পারে না। ঠিক এই মুহূর্তে আমি চাইলাম ঐ দুঃখী ছেলেটা যেন পৃথিবীর সব চেয়ে দামি সিগারেট খেতে পায়।

আমি চাই না ও স্টিফেন কাকার ছেলের মতো বিগড়ে যাক। একবার ভাবলাম, ওর কাছে যাই, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ওকে জড়িয়ে ধরি। ওকে বলি- ‘ওরে তুই এত মনমরা হয়ে আছিস কেন? তোর চিন্তার কী আছে? আমি তো আছি। তোকে আর পড়াশোনা করতে হবে না। তুই আজ থেকে মুক্ত মানুষ।’ আমার কথা শুনে খুশিতে ওর মুখে হাসি ফুটুক আমি চাই। কিন্তু আমি কাছে গেলে ও যদি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, যদি না হাসে, তাহলে আমার কী লাভ হবে? আমি ঠিক করলাম, থামের পেছনে যেমন দাঁড়িয়ে আছি তেমনই থাকব।

এক সময় হাতের সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে দায়ো উঠে দাঁড়াল। বইগুলো হাতে নিয়ে কালো রেলিং দিয়ে ঘেরা গেট দিয়ে সে বাইরে চলে গেল। অফিসে এখন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। দোকানের সামনে, গাছের তলায় সর্বত্র লোকের ভিড়। ভিড়ে সে হারিয়ে যেতে চাইলেও আমি জানি হারিয়ে যাবার মতো কোনো জায়গা তার নেই। নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একই ছবি দেখতে পেলাম। যাবার মতো আমারও কোনো জায়গা নেই। লন্ডনের জীবনের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই।

দায়োর যেমন যাবার কোনো জায়গা নেই, আমারও নেই। পর্যটকরা যে জায়গাটাতে ঘুরে বেড়ায় আমি সেখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে নিজের রেষ্টোরাঁ-তে ফিরে গেলাম। এই সেই রুটির দোকান। এই সেই ফাস যার মধ্যে আমি গলা ঢুকিয়েছি। দোকানটা এই মুহূর্তে যে রকম অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি যদি বেপান্তা হয়ে যাই তা হলে কী হয়? গামলার তরকারি পচে বিষের মতো লাল হয়ে যাক। তার ওপর ধুলোর স্তর জমে যাক। আরো অধঃপতন হবার আগে দায়োকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যে জীবন মানুষকে নষ্ট করে দেয় সেই জীবন যদি মানুষ পরিত্যাগ করতে পারত!

পূর্ণিমা রাতের অশ্রুতীত্ব মহিলাকে পেছনে ফেলে চলে যাওয়া, যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি সাধ্যায়ত্ত? এখান থেকে যেতে হলে আরো অনেক কিছুকে ছেড়ে যেতে হবে যেমন, মাটির তলার ইঁদুরটি, যাকে বের হতে দেব না বলে গর্তের মুখে বাস্ত্র চাপা দিয়েছিলাম, বাস্ত্রের ওপাশে তার নখের আঁচড় শুনেছিলাম। আজ চাইছিলাম পুরোনো সব কিছু শেষ হয়ে যাক। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুক ইঁদুর।

এই জীবনের সমাপ্তি ঘটুক। আমি কিছুই নিয়ে আসিনি, কিছুই নিয়ে যাব না, আমার কিছুই নেই।

সারা বিকেল আমি হাঁটলাম, একজন মুক্ত মানুষের মতো হাঁটলাম। যা কিছু চোখে পড়ল সেই সব কিছুকেই আমি অবজ্ঞা করলাম। ঘৃণা করলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখনও ঘৃণা করলাম। যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল তখনও ঘৃণা করলাম। বাসকে ঘৃণা করলাম, রাস্তাকে ঘৃণা করলাম, বাসের চালককে ঘৃণা করলাম।

সন্ধ্যার সময় যে শ্বেতাঙ্গ যুবকগুলো মারপিট করতে, অসভ্যতা করতে দোকানে আসে, আমি তাদের ঘৃণা করি অন্তর থেকে। তারা আমাকে প্ররোচিত করে যাতে আমি তাদের প্রতিবাদ করি। তাহলে গণ্ডগোল পাকাতে তাদের সুবিধা হবে। আজ কিন্তু আমি একেবারে ভিন্ন মানুষ। এদেশে থেকেই বা আমার লাভ কী? যখন থাকবই না তখন এদের বিরুদ্ধাচরণ করার কী প্রয়োজন? আজ আমাকে কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না। স্যামসন তো জাহাজে করে ফিরে যাচ্ছে। রাত্রে সমুদ্রের জল কালো কিন্তু অন্ধকার তো চিরকাল থাকবে না। সূর্য উঠবেই, আর সূর্য উঠলেই সমুদ্রের জল আবার নীল রংয়ের হয়ে যাবে। স্যামসনকে মনের জোর আনতে হবে, তাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

ঐ যে কাপ, ডিশ, প্লেট ভাঙার শব্দ আসছে। যত জিনিস ভাঙছে ছেলেগুলো, তত গালাগালি করছে ও হাসছে। আজ ওরা যা চায় তাই করুক, আজ ওদের বাধা দেব না। এই দেশ থেকে আমি ভাইকেও নিয়ে চলে যাব। তার মুখ, ভয়াবহ মুখ আমাকে ব্যাথা দেয়। আমি ঘর থেকে হাতে একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দরজা দিয়ে দোকানে ঢুকে ছেলেগুলোর মুখোমুখি হতে হবে এমন সময় দায়োকে দেখলাম। তাকে দেখেই আমার সব সাহস উবে গেল। আমার হাতের পেশিগুলো যেন তারের মতো নরম হয়ে গেল। ঐ লোকগুলো আমার টাকা লুণ্ঠ করে নিচ্ছে, আমার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। একটা ছেলে আমাকে টেনে নিয়ে এলাম। তারপর বাইরে থেকে দোকানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঐ ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চললাম। ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম, তাদের একটাকে ধরেছি, এবার আমরা দুজনে এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি।

সবকিছু শান্ত হলে আমি ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতেই ছেলেটা অপার বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল। ইংল্যান্ডে পুরোনো ধাঁচের যে বাড়িতে দায়ো থাকত এই ছেলেটাও তার সাথে থাকত। খেলতে খেলতে কত সহজে দায়ো তার শরীরে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে, কত সহজে ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এ তো নিছক দুর্ঘটনা। কাজটা সেরে দায়ো মুখ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন সে ভয়ে চিৎকার করতে পারছিল না, সে চাইছিল আমি তাকে সাহায্য করি। এই নারকীয় দৃশ্য দেখে তার চোখ যেন ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ফাঁসি কাঠটাকে চোখের সামনে দেখতে

পাচ্ছে। কিন্তু আমি তাকে কীভাবে সাহায্য করব? আমি কি ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় পরব নাকি? ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও সেই সঙ্গে বিপদ যেন আমার পিছু ছাড়তে চাইছে না। এই দুটো জিনিসই আমার জীবনকে শেষ করে দিয়েছে। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ, প্রাণহীন দেহটা সিন্দুকের মধ্যে রাখা আছে। ‘রোপ’ নামের সিনেমাতেও ঐ রকম একটা শব রাখা ছিল সিন্দুকের মধ্যে। তবে আজ এটা আছে এক ইংরেজের বাড়িতে। সবচেয়ে খারাপ অংশটা এবার এল। ছেলেটার পিতামাতার সাথে একত্রে বসে খাওয়া। দায়ো মোটেই অভিনয় করতে পারে না। যে কোনো সময় সে ধরা পড়ে যেতে পারে। সিন্দুকের মধ্যে রাখা দেহটা কি তার না আমার? আমি এখন বাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছি না, মৃত ছেলেটার মা-বাবাকেও দেখতে পাচ্ছি না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন, যখন নড়তে পারি না তখন জেগে উঠি।

আবার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে। বুঝতে পারছি আমার ডান চোখে কিছু একটা লেগেছে কিন্তু কিছুতেই হাত ওঠাতে পারছি না।

আমি আর ফ্রাংক বাসে করে চলেছি। আমি ভেতরের দিকে বসেছি, ও বসেছে বাইরের দিকে। আমরা প্রথমে রেল স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্রেন ধরব। পরে আবার বাসে করে যেতে হবে। যাত্রার শেষে কোনো এক গির্জায় আমার ভাই দায়ো এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করছে। বিগত তিন বছরে দায়ো নিজের পছন্দসই কাজ করে গেছে। পড়াশোনা ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়ে সে একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি যদি ঐ দিন দায়ো ঐ বাড়িতে ফিরে যেত তাহলে কী হত? সেখানে কাউকে দেখতে পেত না সে। কেউ বাড়ি ফিরত না। সেটা হত পৃথিবীর শেষ দিন। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছিল। তার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল যদিও আমি তাকে চাইতাম। এই ঘটনার পর থেকে সে কী ধরনের লোকের সাথে মেলামেশা করত, কী ধরনের জীবন যাপন করত তা আমি জানতেও পারিনি। কখনও মনে হয়, যে ভাইকে আমি চিনতাম সে এই লোক নয়। কখনও মনে হত, সে আগের মতোই আছে। কখনও মনে হত সে বড় একা, ঠিক আমার মতোই।

বৃষ্টি থেমে গেলে সূর্য দেখা গেল। ট্রেন ছুটে চলেছে। বড় বড় বাড়িগুলোর পেছন দিক দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। বাড়ির ইটের রং ধূসর, বেশির ভাগ বাড়ির গায়ে কোনো রং নেই। কেবল জানালাগুলোতে একটাই রং— সবুজ। ভারী অপরিচ্ছন্ন এলাকা দিয়ে আমরা চলেছি। বহুতল বাড়িতে একজন অন্য জনের মাথার ওপরে বাস করছে। ওপরের বাড়ি থেকে ফেলা আবর্জনা নিচ তলার বাড়ির জানালার শেডের ওপর আটকে রয়েছে। প্রতিটি মানুষ নিজের ক্ষুদ্র জায়গায় বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারে, একদিন নিজেও

হারিয়ে যেতে পারে। একজন মানুষ চলে গেলে অন্য জন আসবে, আগের লোকের ফেলে যাওয়া আবর্জনা পরিষ্কার করবে। তার সময় হলে একদিন সেও চলে যাবে।

স্টেশনে পৌঁছে মনে হল আমরা লন্ডন শহরের বাইরে এসেছি। স্টেশনের বাড়িটা ছোট এবং নিচু। বাইরের বাড়িগুলো লাল ইটের তৈরি, সেগুলো থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্টেশন চত্বরে বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন। দেখে মনে হবে এখানকার মানুষজন খুব সুখী। ওগুলো তো বাড়ি নয়, যেন এক একটা বড় ছাতা যার তলায় হাসিমুখে পরিবারের সকলে মিলে মিশে বেশ মজা করে নানা খাবার-দাবার খাচ্ছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা বাসের অপেক্ষা করছি তখন আমার পুরোনো ভয়টা ফিরে এলে আমি কাঁপতে লাগলাম। চওড়া রাস্তা আর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল সবাই আমার মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আমার সঙ্গী ফ্রাংক মনে করল আমার বুঝি শীত করছে। তাই সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হাওয়া লেগে তার মাথায় চুল উড়ছিল এবং তার মুখটা সাদা লাগছিল। আমার মনে হল আমি যেন ঐ রাস্তায় নোংরা জামা কাপড় পরে তাকে খেলতে দেখছি। তার সারা মুখে ধুলো-বালি মাখা। আমি যখন তার চকচকে জুতার দিকে তাকিয়ে এই ছবিটা দেখছি তখনই একটা বাচ্চা মেয়ে এসে ফ্রাংকের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভিক্ষে চাইল। মেয়েটা বলেই চলল, ‘একটা পেনি দাও, একটা’। ফ্রাংক চোয়াল শক্ত করে না বললেও মেয়েটা তাকে ছাড়ছিল না, বাচ্চা মেয়ে, সে তো জানে না অপরিচিত লোকের হাঁটু ধরলে কী বিপদ ঘটতে পারে। শেষে বাস এলে আমরা দুজনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

গির্জাতে যাবার রাস্তাটা ছিল বেশ চওড়া, রাস্তার পাশের গাছগুলো ছিল পত্রহীন। সব কিছুকে আমার বেশ নতুন মনে হচ্ছিল। গির্জাটাও বোধ হয় নতুন তৈরি হয়েছে। লাল ইট দিয়ে তৈরি গির্জাটা একেবারে রাস্তার পাশেই ছিল, কোনো পাঁচিলও ছিল না সেটার। ভাই কাদের সাথে মেলামেশা করে তা জানি না, কেমন ধরনের লোক তারা তাও জানা নেই আমার। এই অঞ্চলে কোন্ বাড়িতে সে থাকে তাও আমার অজানা। সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি কোনো শত্রু নগরীতে ঢুকছি।

রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই আমারও কেমন যেন স্নায়বিক দুর্বলতা এসে গেল। মনে হল ফ্রাংক আমার বেয়েও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমন সময় গির্জা থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সি এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি নববধূর মা হতে পারেন, আবার কোনো প্রতিবেশীও হতে পারেন। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এ আবার কী রকম বিয়ে যেখানে নিমন্ত্রিত অতিথিরা গির্জার বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়? একটু পরে আরো কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল, তাদের সাথে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেও

ছিল। তারা আমার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকাল। হ্যাঁ, এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই আমার জীবনকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।

ফ্রাংক হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলে আমি তার হাতটা সরিয়ে দিলাম। আমি খুব ভালোভাবে জানি, ফ্রাংক শ্বেতাঙ্গ বলে তার মনটা ঐ সম্প্রদায়ের লোকের কাছে আছে। তবে যেহেতু সে দুর্বলমনা তাই সে আমার পাশেই থাকতে চাইছে। নিজের সম্প্রদায়ের লোকের কাছে সে যেতে পারছে না। বাস কিংবা কফি হাউসের মধ্যে হলে সে জোর দিয়ে বলতে পারত, ‘আমার সঙ্গে থাকা এই লোকটির সুরক্ষা দেব আমি।’ কিন্তু বিয়ে বাড়ির ব্যাপার আলাদা। এখানে আমরা দুজন রাস্তার এপাশে আর রাস্তার অপর পাশে আছে বিষণ্ণ সব লোকেরা। এই সময় আকাশের সূর্যকে একটা কমলা লেবুর মতো লাল লাগছিল, রাস্তার ওপর গাছের ছায়াও পড়ছিল না।

এই সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সি থেকে নামল আমার ভাই। তার সাথে রোগা দুটি শ্বেতাঙ্গ বালকও নামল। আজকাল বিয়েতে ট্যাক্সির চল হয়েছে। কোনো পাগড়ি নেই, কোনো বরযাত্রীর দল নেই, কোনো বাজনা বাদ্যি নেই, অতিথিদের আপ্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই, সবুজ পাতা দিয়ে বাঁধা কোনো তোরণ নেই, আলোক সজ্জা নেই, মণ্ডপ নেই, বিয়ের গান নেই। ট্যাক্সিতে যেমন বিয়ে বাড়িতে আসাটা আমাদের চোখে অস্বস্তিকর লাগছিল তেমনি ছোট চুল, পালিশ করা জুতা পরা, রোগাটে শ্বেতকায় বালকটিকে এবং জ্যাকেটের পকেটে সাদা গোলাপ রাখা আমার ভাইটিকে একটু বে-মানান লাগছিল। ভাইয়ের মুখটা ছিল খেটে খাওয়া মজুরদের মুখের মতো কর্কশ। সে তার বন্ধুদের সাথে এমনভাবে বাক্যালাপ করছিল যেন তার মনের মধ্যে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে।

বন্ধুদের নিয়ে ভাই আমার কাছাকাছি এলে আমি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। তার চোখ, উঁচু গাল এবং হাসিমুখ মুখ আমি দেখতে পেলাম। তার মুখে ভীতির একটা ছাপ আছে। ঐ মুখটাই আমি একদিন ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম। তার বন্ধুটা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে দিশারিট খেতে লাগল এবং কায়দা করে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল।

ফ্রাংক আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল সে সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এই সময় সেই সপ্রতিভ মহিলাটি এলেন এবং উপস্থিত দু-চার জনের সাথে সংক্ষেপে দু-চার কথা বললেন। সত্যি বলতে কী, তিনি বাক্যালাপ করছিলেন নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য, তাঁর কথার মধ্যে সারবস্তু কিছু ছিল না। তারপর আমার ভাই ও তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে ওপাশে চলে গেলেন। মহিলার চালচলনে এমন একটা ভাব ছিল যে অস্বস্তিকর মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি একটা আমেজ এনে দিল। ভদ্রমহিলার আমন্ত্রণে আমি ও ফ্রাংক গির্জার মধ্যে গেলাম। ডানদিকের সারিতে আমাদের বসতে বলা হল। পরে একে একে কন্যাপক্ষের লোক এলে তাঁরা বাঁদিকের সারিতে বসলেন। গির্জার ভেতরে যে এত জায়গা আছে তা বাইরে থেকে মনে হয়নি। এই প্রথম আমি গির্জার ভেতরে গেলাম। পরিবেশটা আমার একদম

পছন্দ হল না। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ভাইয়ের দিকে কিংবা পাত্রীর দিকে ভালো করে তাকাতে পারিনি। অনুষ্ঠান শেষে তাকে দেখলাম। পরনে সাদা পোশাক, গলায় ফুলের মালা, গালে ও কপালে বিস্তর প্রসাধনের ছাপে তাকে মোটেই সজীব লাগছিল না, বিজাতীয় এই মেয়েটির সাথে আমার ভাই কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলল কে জানে! যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা সকলেই বুঝে গেল আমার ভাইটি খুব ঠকে গিয়েছে। একমাত্র তার স্ত্রীর বোধ হয় সে কথা মনে হচ্ছিল না।

গির্জার বাইরে বেরিয়ে আসতেই নির্মল বাতাস পেলাম। লোকেরা বর-কনের ছবি তুলল। আমার কেবল মনে হচ্ছিল এই অনুষ্ঠানে আনন্দের চেয়ে শোকের ভাগ বেশি আছে। ঐ ভদ্রমহিলা আমাকে ও ফ্রাংককে ফটোগ্রাফারের কাছে নিয়ে গেলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা ফটোগ্রাফার একজন ব্যবসায়ী। সে তো ফটো তোলার মাঝে কথা বলার সুযোগ পেলেই ব্যবসার কথা ফাঁদে। কী করে সে ফটোগ্রাফির ব্যবসাতে এল এবং এই ব্যবসাতে কত অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ আছে তা বেশ সহজ ভাষায় বলছিল। ট্যাক্সি চালাবার ফাঁকে এক সময় কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কার্ড খুঁজে পেয়ে সে আমাকে দিয়েও ছিল। এই কার্ডে তার নাম ধাম ইত্যাদি লেখা ছিল।

গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে সে একটা রেস্টোরাঁ-তে গেল। সেখানে আমাদের কথা বেমানুম ভুলে গিয়ে ফটোর পর ফটো তুলতে লাগল। এই বাড়িটা ছিল বহু পুরোনো। বাড়িটার ভেতরে মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঠান ছিল। পুরোনো ইংরেজি ছবিতে যে ধরনের বাড়ি দেখা যায় এটা ছিল সেই রকম। এদিকে ওদিকে ছিল লোহার বিম। ঘরের মধ্যে যে যখন খুশি আসছিল এবং ফটো তুলিয়ে চলে যাচ্ছিল। ছোট হলে কী হয়, সেই ঘরে সবার জন্য জায়গা ছিল, এই বিয়ে বাড়িতে সবার একটা ভূমিকা ছিল।

কয়েকজন মহিলা চীৎকার করছিলেন। দায়োঁ তার স্ত্রীকে এই সময় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার স্ত্রী! কত অল্প সময়ে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কত অল্প সময়ে একটা পুরুষ নিজের জীবনকে বরবাদ করে তোলে! ফ্রাংক আমার পাশেই ছিল বলে যখন বসলাম সেও আমার পাশেই বসল। এই সময় আর কেউ কথা বলছিল না। কথা যা বলার বলছিল খাবার পরিবেশনকারী মেয়েটি। পরনে তার কালো রংয়ের পোশাক, তার ওপর সাদা রংয়ের অ্যাপ্রন। সে তো এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে নেই-তার কাছে এটা সত্যিকারের একটা বিয়ে।

আমি কিংবা ফ্রাংক কেউই মাংস নিলাম না। এখন আমি যা করব, ফ্রাংকও তাই করবে। পরিবেশনকারী মেয়েটি আমাদের জন্য মাছ নিয়ে এল। মাছের ওপরের অংশে পুড়িয়ে কালো করা হয়েছে। মাছের ছালটা সরিয়ে ভেতরের অংশে হাত দিতেই বুঝে গেলাম ভেতরটা শুধু কাঁচা নয়, পচা।

একটু পরে পরিবেশনকারী মেয়েটি এসে জানতে চাইল কেউ মদ নেবে কিনা। সে নিজেই স্বীকার করে নিল যে প্রথমবার এই প্রশ্নটি করতে তার ভুল হয়ে

গিয়েছিল। মনে হল, তার কথা কারো কানে যায়নি, কেউ উত্তর দিল না। তখন দ্বিতীয় বার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল সে। এবারেও কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। কেবল একজন বয়স্ক লোক যিনি এতক্ষণ একেবারে চুপচাপ ছিলেন তিনিই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, ‘আপনার উত্তর তো ওটাই।’ তাঁর কথা শুনে স্টিফেন কাকার কথা মনে পড়ে গেল। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কাকা বেশ কৌতুক করতেন। ঐ বয়স্ক লোকটির কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। আমার মনে হল, লোকটি বেশ ভালো তো।

এরা শ্বেতাঙ্গ হলেও এদের আমার ভালো লেগেছিল। এরা আমার টাকা লুণ্ঠ করেছে, আমার জীবন বিষময় করে দিয়েছে, ভাইয়ের সাথে আমার দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি যদি আমাকে আমার শত্রু দেখাতে পারো তাহলে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু এদের দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এরা কি আমাকে আঘাত করেছিল? এরা কি আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল? আমি তো কত পরিশ্রম করেছি। তিল তিল করে চার বছর ধরে সামান্য একটু জমিয়ে ছিলাম। কীসের জন্য? আমার ভাইকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। কিন্তু আজ সে কীভাবে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করল? এই জীর্ণ বাড়িতে, এই লোকগুলির সাথে বসে খেতে খেতে যে জীবনের শুরু, আমি কি তাই চেয়েছিলাম? এর জন্য দায়ী কে? আমি কার ওপর প্রতিশোধ নেব?

BanglaBook.org

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে

১

আফ্রিকার এই রাজ্যটিতে একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, একজন রাজাও আছেন। তারা আলাদা আলাদা উপজাতির লোক। এসব দেশে উপজাতি-গত শত্রুতা পুরোনো ব্যাপার, আর স্বাধীনতার পরে এই উপজাতি-গত বিভেদ সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। রাজা এবং রাষ্ট্রপতি, দুজনেই সাদা চামড়ার সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সাদা চামড়ার সাহেবরা ব্যক্তিগতভাবে রাজাকেই বেশি পছন্দ করত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ছিলেন বেশি ক্ষমতাশালী; নতুন সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁরই কজায়, তাঁরই উপজাতির লোক। কাজেই সাদা চামড়ার সাহেবরা ঠিক করল যে, রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করবে এবং তাই শেষ পর্যন্ত এই সপ্তাহের শেষেই রাষ্ট্রপতি তাঁর সেনাবাহিনীকে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন।

রাজার নিজস্ব লোকদের এলাকা ছিল রাজ্যের দক্ষিণে এবং তখনও পর্যন্ত জায়গাটা তার পুরোনো ঔপনিবেশিক নামে সাদান ক্যালেটরেট হিসাবেই পরিচিত ছিল। ববি ওখানেই কাজ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিভাগে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসাবে। কিন্তু এই সঙ্কটের সপ্তাহে ও ছিল চারশ' মাইল দূরে, রাজধানীতে, সমাজ-উন্নয়নের ওপর একটা শিক্ষাক্রমে উপস্থিত থাকতে, আর রাজধানীতে এই যুদ্ধ, সঙ্কট, এসবের কোনোও চিহ্নই ছিল না। সেই শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আফ্রিকানদের চাইতে বেশি ছিল ইংরেজ। আফ্রিকানরা ছিল ধোপ-দুরন্ত পোশাক-পরা এবং বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। ওরা বেশি কথা বলত না। এই শিক্ষাক্রমটা শেষ হল রবিবারে, আর শহরের উপকণ্ঠে তখনও ইংরেজদের দখলে থাকা একটা আধা-একর বাগানে দুপুরের 'বুফে' খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

এই রবিবারটাও রাজধানীর অন্য রবিবারের মতোই ছিল। সাদা চামড়ার সাহেবদের দলে দলে সাউথ আফ্রিকায় যাওয়া এবং অবাস্তিতদের বহিষ্কার করা, এসব সত্ত্বেও এই রাজধানী শহরটা ছিল বন্য আফ্রিকায় ইংরেজ-ভারতীয়দের সৃষ্টি।

এর জন্যে আফ্রিকার নিজস্ব দক্ষতা কোনো প্রয়োজনে আসেনি। রাজধানী থেকে কিছু দূরে ছিল ঝোপ-ঝাড়ের গ্রামগুলো, যেখানে পর্যটকদের যাতায়াতে অর্ধেক দিন সময় লাগত। রাজধানীতে খাঁটি আফ্রিকার দেখা মিলত কেবল শহরের উপকণ্ঠের আধা-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় বাগানগুলোতে, পর্যটকদের জন্যে খোদাই শিল্প এবং চামড়ার তৈরি জিনিস সাজানো দোকানগুলোতে, যেখানে ঢোল ও বর্শা এসবও স্মারক হিসাবে সাজানো থাকত, আর পর্যটকদের জন্যে তৈরি নতুন হোটেলগুলোর বেটপ চাপরাশ আঁটা ছেলেগুলোর মধ্যে, যেখানে সাদা চামড়ার বা ইস্রায়েলী তত্ত্বাবধায়করাও আশেপাশেই থাকত। এখানে আফ্রিকা হচ্ছে মনোহর সৌন্দর্য। সাদা চামড়ার পরিব্রাজক বা দেশত্যাগীদের জন্যে মনোহর, আফ্রিকানদের জন্যেও মনোহারিনী, যাদের ঝোপ-ঝাড় থেকে উৎখাত করা হয়েছে, যারা শহরের স্বাধীনতায় সভ্যতার চূড়ান্ত রূপ দ্যাখে। যদিও এটা একটা ঔপনিবেশিক শহর, ঔপনিবেশিক সৌন্দর্যময়। এখানে সবাই বাইরের লোক।

নিউ শ্রোপশায়ারের মদের বারটা আগে সাদা চামড়াদের একচেটিয়া ছিল, এখন ওটা রাজধানীর নানানজাতের লোকেদের দেখা করার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর জাতিগত গণ্ডগোলের জন্যে কুখ্যাত। এখানে এখন সাদা চামড়ার লোকেরা বুকখোলা জামা পরে বিয়ার খায়। আফ্রিকানরা ইংরেজদের তৈরি ডাকস্ সুট পরে এখানে ককটেল কাঠি দিয়ে শৌখিন মদ খায়। ওরা বাঁ দিকে সিঁথি করে আর ডানদিকে চুলটা টিপি করে আঁচড়ায়, শহরের আফ্রিকানরা এটাকে ইংরেজদের স্টাইল মনে করে।

আফ্রিকানগুলো অল্পবয়েসি, কুড়ির ঘরে বয়স্ক ভালো স্বাস্থ্য। লিখতে পড়তে পারে, উঁচু পোস্টের সরকারি চাকুরে, রাজনৈতিক নেতা বা নেতাদের আত্মীয়, সদ্য-খোলা বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানির শাখাগুলোতে ডাইরেক্টর বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর চাকরি করে। এরাই দেশের নতুন নাগরিক আর নিজেদের ক্ষমতাশালী লোক বলে মনে করে। ওরা যে সুটগুলো পরে আছে, সেগুলোর দাম দিতে হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইসব কাপড়ের ব্যবসায়ীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। ওরা নিউ শ্রোপশায়ারে এসেছে সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে, যতই ক্ষণস্থায়ী হোক, মেলামেশা করতে, নিজেদের দেখাতে আর গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে। বার-এ কোনো এশিয়ান লোক নেই, স্বাধীনতার মুক্তি শুধু সাদা-চামড়াদের আর কালোদের জন্যে।

ববি একটা গেরুয়া রং-এর সুতি জামা পরে ছিল, ওগুলোকে “দেশি জামা” বলত। ওগুলো ছিল ঢিলা আংরাখার মতো, ছোট, চওড়া হাতা আর নিচু খোলা গলা; জামার কাপড় হল্যাণ্ড-এ ডিজাইন করা এবং বোনা, আর ওতে ছিল কালো আর লাল রং-এ স্পষ্ট ‘দেশি’ কারুকাজ করা।

ববির টেবিলে যে ছোটখাট চেহারার অল্পবয়েসি আফ্রিকানটি বসেছিল ও এদেশি নয়। ও ববিকে এসেই বলেছিল যে, ও একজন জুলু, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত একজন উদ্বাস্তু। ও পরেছিল একটা হালকা-নীল প্যান্ট আর একটা সাধারণ সাদা জামা। এছাড়া বার-এর অন্য আফ্রিকানদের থেকে ওকে আলাদা করেছিল ওর মাথার টুপিটা। একটা পশমের চাদরের মতো নকশা-করা কাপড়ের টুপি, ও চেয়ারের ভেতরে ঢুকে গিয়ে নিচু হয়ে বসে টুপিটা হাতে নিয়ে ক্রমাগত খেলা করছিল, মাথায় পরছিল, খুলছিল, ওটা দিয়ে পাখা করার মতো হাওয়া করছিল, বুকের ওপর চেপে ধরছিল, ওর ছোট ছোট হাত দিয়ে ময়দার মতো ডল্‌ছিল, যেন একভাবে একটা ব্যায়াম করে যাচ্ছে।

এই জুলু ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াটা সহজ ছিল না। এ ব্যাপারেও ও ছিল অস্থির। রাজা, রাষ্ট্রপতি, দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তর্গত, শিক্ষাক্রম, পর্যটক, দেশীয় লোক; একটা থেকে আরেকটা বিষয়ে চলে যাচ্ছিল, অথচ নিজেকে খোলসা করছিল না। একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকছিল না। আর ওর টুপিটাও ছিল ওর এই এড়িয়ে যাওয়ার একটা অংশ। টুপিটা পরে ওকে কখনও মনে হচ্ছিল ফুল বাবু, কখনও দক্ষিণ আফ্রিকার খনির শোষিত শ্রমিক, কখনও একজন আমেরিকান ভবঘুরে গাইয়ে আবার কখনও একজন বিপ্লবী, আর ও ববিকে তাই বলেছিল, ও একজন বিপ্লবী।

ওরা প্রায় ঘণ্টাখানেক একসঙ্গে বসে আছে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে; ববির দেরি হয়ে যাচ্ছিল। খানিকটা নিশ্চিন্ততার পর, যখন ওরা বার-এর চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, জুলু ছেলেটা বলল, ‘শহরে এখন সাদা চামড়ার বেশ্যাও আছে।’

ববি ধীরে সুস্থে বিয়ার-এ চুমুক দিতে দিতে, জুলু-র দিকে না তাকিয়ে মনে মনে ভেবে খুশি হল যে, প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত যৌন ব্যাপারে এসে গেল।

“এটা ভালো নয়,” জুলু বলল।

“কোনটা ভালো নয়?”

জুলু উঠে বসল, টুপিটা মাথায় দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোটো কিন্তু শক্ত-সমর্থ বুক চিতিয়ে পকেট থেকে ওর মানিব্যাগ বের করে নতুন নোটের তাড়ায় আঙুল বুলিয়ে বলল, “দেখ, আমি এখন ওই সব জায়গায় যেতে পারি, এই নোটের তাড়া দেখে আমাকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়।”

ববি ভাবল; এই ছোকরা নিজেই একটা লম্পট, পুরুষ বেশ্যা। হোটেলের বার-এ এইরকম আফ্রিকান পুরুষ বেশ্যা দেখলে ববি ঘাবড়ে যায়। কিন্তু ও একটু দরদাম করতে চাইল। ও বলল, “তোমার খুব সাহস, এত টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমি কখনও ষাট বা আশি শিলিং-এর বেশি পকেটে রাখিনা।

“এই শহরে কিছু করতে গেলে অন্ততঃ দুশো দরকার।”

“খুব বেশি হলে একশো আমার পক্ষে যথেষ্ট।”

“ভালো, স্মৃতি করো।”

ববি জুলুর চোখে চোখ রাখল। জুলু চোখ সরাল না। শেষ পর্যন্ত ববি-ই চোখ সরিয়ে নিল। বলল, “তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা খুব উদ্ধত।”

“আমরা তোমাদের এখানকার দেশি আদমিদের মতো নই। এই লোকগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে অজ্ঞ লোক। দেখ ওদের দিকে তাকিয়ে।”

ববি জুলুর দিকে তাকাল। জুলু হিসেবে ওর শরীরটা এত ছোট! “সাবধানে কথাবার্তা বল। ওরা তোমাকে বহিষ্কার করতে পারে।”

জুলু টুপিটা দিয়ে খানিক হাওয়া খেল। তারপর ঘুরে বসে বলল, “সাদা চামড়ার সাহেবরা দেশি আদমিদের সঙ্গে কেন মিশছে? বছর দুয়েক আগে, কোনো দেশি আদমি এখানে ঢুকতেই পারত না। এখন দেখ, এসব মোটেই ভালো না।”

“দক্ষিণ আফ্রিকায় বোধ হয় অন্যরকম।” ববি বলল।

“আপনি কী শুনতে চান মশাই? শুনুন, বলছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি বেশ ভালো রোজগার করতাম। আমার হুইস্কি আমিই কিনতাম। শুনলে অবাক হবেন, আমার নিজস্ব মেয়েছেলেও ছিল।”

“দেখতেই পাচ্ছি, অধিকাংশ মানুষ তোমাকে বেশ আকর্ষণীয় ভাবে।”

“বলছি, শুনুন।” জুলুর গলার স্বর নেমে গেল। ও ষড়যন্ত্রীর ভঙ্গীতে নামগুলো বলতে লাগল, দক্ষিণ আফ্রিকার সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের, যাদের বৌ-মেয়ের সঙ্গে ও শুয়েছে।

ববি জুলুর উত্তেজিত ছোট মুখটার দিকে তাকিয়ে, ওর দেশে আঘাতের জ্বালা দেখে, ওর প্রতি সমবেদনা ও উত্তেজনা বোধ করল। এটাই হচ্ছে আফ্রিকান রোমাঞ্চ। ববি নিজের ঘাবড়ে যাওয়া ভুলে গেল।

“দক্ষিণ আফ্রিকান,” জুলু আবার গলা তুলে বলল, “এখানে ওরা তোমাকে একা থাকতে দেবে না। ওরা সবসময় তোমাকে খুঁজে বেড়াবে, জিজ্ঞাসা করবে, ‘তুমি কি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক, না কি ওদের পাল্লায় পড়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’”

“ওদের দোষ দিতে পারি না।”

“তুমি যখন এলে, আমি ভেবেছিলাম তুমি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক।”

“আমি!”

“ওরা সবসময় আমার সঙ্গে বসে। ওরা সবসময় আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চায়।”

“তোমার টুপিটা খুব সুন্দর।”

ববি ঝুঁকে টুপিটা ছুল। খানিকক্ষণের জন্যে ওরা দুজনেই টুপিটা ধরে রইল, ববি আঙুল দিয়ে টুপির কাপড়টা দেখছে, জুলু কিছু বলছে না।

ববি বলল, “আমার এই নতুন জামাটা তোমার পছন্দ?”

“ওই রকম একটা দেশি জামা যেন আমার মৃতদেহেও না থাকে।”

“আরে এটার রঙ এইরকমই। তুমি যেমন সুন্দর রঙ-এর জামা পরতে পার, আমরা তা পারি না।”

জুলুর চোখদুটো রুম্ব হয়ে উঠল। ববি টুপিটার ধার দিয়ে দিয়ে আঙুল সরাচ্ছে, যতক্ষণ না ওর আঙুলগুলো জুলুর আঙুলের কাছাকাছি এল। তারপর ও চোখ নামিয়ে আঙুল দেখল, কালোর পাশে গোলাপি আঙুল।

“যখন আমি আবার জন্মাব,” ববি থেমে গেল। ও ওখানকার চালু মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু জুলু ওই ভাষা বুঝবেনা। ও মুখ তুলে বলল, “আমি যখন আবার এই পৃথিবীতে আসব, আমি তোমার গা-এর রঙ নিয়ে আসতে চাই।” ও নিচু গলায় কথা বলছিল আর ওর আঙুল টুপিটার ওপর সরতে সরতে জুলুর আঙুলের ওপর এসে গেল।

জুলু একদম নড়াচড়া করছে না। যখন ও ববির দিকে মুখ তুলল, মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। ববির নীল চোখ ভিজ্জেভিজ্জে, মনে হচ্ছে যেন ওর দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে; ওর পাতলা ঠোঁট কাঁপছে, মনে হচ্ছে মৃদু হাসি ঠোঁটের ওপর থমকে আছে। দু’জন মানুষের মাঝখানে নীরবতা। তারপরই, হাত না সরিয়ে, মুখভাব না পাল্টে, জুলু ববির মুখের ওপর একদলা থুতু ছিট্‌কালো।

সেকেন্ডখানেক ববির আঙুল জুলুর আঙুলের ওপর রইল। তারপরই ও হাত সরিয়ে নিয়ে রুমাল বার করে মুখ মুছল; ও যখন রুমাল সরাল সে তখনও জুলুর দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে সেই একচিলতে হাসি আট্‌কানো। জুলু কিন্তু একটুও নড়েনি।

পুরো বার ঘটনাটা দেখল। কালোরা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল, সাদারা চোখ ফিরিয়ে নিল। কথাবার্তা একটুখানির জন্যে থেমে গিয়ে ফের শুরু হল।

ববি উঠে দাঁড়াল। জুলু তাকিয়েই রয়েছে, এখন তাকিয়ে আকাশের দিকে, ওর দৃষ্টি একভাবে, একই উচ্চতায়। ববি ইচ্ছা করেই চেয়ারটা জোরে পেছন দিকে সরাল। তারপর ওর ঢিলেঢালা দেশি জামা পরা মোটাসোটা, বলির পাঁঠার মতো চেহারা নিয়ে নিচের দিকে না তাকিয়ে, মুখে সেই স্থির হাসি, বাঁ হাতটা ঝুলছে, ডান হাতটা কনুই থেকে ঝাঁকি মারছে, দরজার দিকে হেঁটে গেল।

জুলু চেয়ারে আরো ঢুকে বসল। টুপিটা মাথায় পরল, আবার খুলে ফেলল। চিবুকটা গলার কাছে নামিয়ে কিছু বলবে বলে মুখ খুলল, তারপর বন্ধ করল। ওর মুখ টানটান, অভিব্যক্তিহীন; এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বাচ্চা ছেলের মতো ঠাণ্ডা মুখ। ওর বিপ্লবের এই টুকুই বাকি ছিল; এই শ্রোপশায়ারে আসা, সাদা চামড়ার মানুষ খুঁজে বেড়ানো। রাজধানীতে জুলু একেবারে একা, কাজ-কর্ম নেই, একটা সামান্য আমেরিকান বৃত্তি-ভোগী। আফ্রিকার এই সব অঞ্চলে, আমেরিকানদের আনুকূল্যেই সব কিছু চলে।

চাপরাশ-পরা বার-এর ছেলেটা বিল নিয়ে ববির পেছনে দৌড়লো। ববিকে দরজার কাছে, বড় দেশি ঢাকটার কাছে, যেগুলো আজকাল নিউ শ্রোপশায়ারের

নতুন অলঙ্করণ হয়ে উঠেছে, থামিয়ে বিল ধরিয়ে দিল। ববি প্রথমে খেয়াল করেনি; পরে যখন দেখল বিল নিয়ে এসেছে, ওর হাল্কা ধূসর ফ্রানেলের প্যান্টের পেছন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ছেলেটার হাতে একটা কুড়ি শিলিং-এর নোট দিল। তারপর ঔদার্য দেখিয়ে ছেলেটার হাতে আরেকটা নোট দিয়ে বলল জুলুর মদের দাম মিটিয়ে দিতে; খুচরো নেবার জন্যে আর দাঁড়াল না।

লবিতে র‍াষ্ট্রপতির নতুন সরকারি ফটোগ্রাফটা টাঙানো রয়েছে। ওটা এই সপ্তাহান্তেই শহরে এসেছে। পুরোনো ফটোগ্রাফে র‍াষ্ট্রপতির মাথায় ছিল রাজা-র উপজাতিদের মাথার টুপি, যেটা রাজা স্বাধীনতার প্রাক্কালে উপহার দিয়েছিলেন, উপজাতিদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে। নতুন ফটোতে র‍াষ্ট্রপতির মাথায় কোনো টুপি নেই, জ্যাকেট, সার্ট আর টাই পরা, ইংরেজদের ধরনে চুল আঁচড়ানো। স্টুডিও-র আলোতে, ফোলা ফোলা গালদুটো চক্‌চক্‌ করছে; দুটো কঠিন অস্বচ্ছ চোখ সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে।

আফ্রিকানরা বলে, র‍াষ্ট্রপতির চোখে নাকি জাদু আছে; দেখে মনে হচ্ছে, চোখ দুটো তাদের খ্যাতির কথা জানে।

নিউ শ্রোপশায়ার-এর আলোয়-ভাসা প্রাঙ্গন, পাথর-সাজানো বাগান, জাতীয় পতাকা ঝোলা সাদা খুঁটিটা পার হয়ে ববি গাড়ি চালিয়ে অন্ধকার রাজপথে চলে এল। রাত্রিবেলায় শহরের উপকণ্ঠে হাইওয়ের পাশে ঝোপঝাড় শুরু হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে জঙ্গলের মানুষরা বেরিয়ে এসে জ্বরদস্তি, দখল কষ্ট, শহরটায় বসতি স্থাপন করে। ওরা সঙ্গে আনে ওদের জঙ্গলে বাস করার দক্ষতা; ওরা শহরে কোনো ঘর পায় না আর রাত্রিবেলা শহরের খোলা জায়গাগুলোয় শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এ সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ গল্প প্রচলিত আছে। সাধারণত ববি এসব শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে আর গল্পগুলো তো বটেই, যারা বলে, সেই সব দেশত্যাগী লোকগুলোকেও হঠিয়ে দেয়। কিন্তু এখন ও হাইওয়ে দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছে দু'পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়, চওড়া বাঁক, ভারতীয় বাজারের উঁচু নিচু গলি-বাড়ি, দোকান, গুদামঘর সব পার হয়ে শহরের কেন্দ্রে, জটিল একমুখী রাস্তায়, আলোকোজ্জ্বল স্কোয়ারে আধডজন আকাশ-চুম্বী বাড়ি আর চওড়া ধূলি-ধূসরিত গাড়ি পার্ক করার জায়গায় চলে এল।

ওর হোটেলের স্বল্প-পরিসর লবিতেও র‍াষ্ট্রপতির নতুন ফটোগ্রাফটা রয়েছে। ইংরেজদের শিয়াল শিকারের দুটো ফটোর মাঝখানে। হোটেলটা ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি। এখানে ববির মতো সরকারি অফিসাররা সরকারি কাজে রাজধানীতে এলে, থাকে। হোটেলটা যা নয়, তার চেয়ে বেশি পুরোনো দেখায়। এবড়ো-খেবড়ো কাঠ আর মেকি-রাজকীয় নির্মাণ শিল্প একসাথে মিশে আছে। হোটেলটা অংশত: প্রথম দিকের, 'প্রবর্তক' বলা যায়, অংশত; মফস্বলী, সব মিলিয়ে ইংরেজ-ইংরেজ,

যেন বাড়ির বাইরে আরেকটা বাড়ি। ববির মোটেই পছন্দ নয়। ওর ঘরটায় একটা খোলা আগুন জ্বালার জায়গা, সাদা রং-করা, দেওয়ালগুলো সাদা, সাদা ভেড়ার চামড়ার কম্বল, একটা সাদা বিছানার চাদর আর জেব্রার চামড়া বিছানো গদি।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেছে, সপ্তাহটাও শেষ। রাজধানীতে এটাই ওর শেষ রাত্রি; পরদিন ভোর ভোর ও গাড়ি চালিয়ে নিজের অফিসে ফিরে যাবে। জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। ও একটা খামে হোটেল-ঘরের বয়টার জন্য কিছু বখশিশ রেখে দিল। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিল। এখন ও খুব শান্ত বোধ করছে।

ববির কাছে আফ্রিকা হচ্ছে, বিশাল খোলা ভূখণ্ড, খোলা রাস্তায় লম্বা লম্বা ক্লাস্তিকর গাড়ি চালানোর নিরাপদ রোমাঞ্চ, অন্য আফ্রিকানরা, সাবালক মানুষের মতো শরীর নিয়ে আফ্রিকান ছেলেগুলো। “গাড়িতে লিফ্ট নিবি? ধাড়ি ছেলে, স্কুলে যাস্ না? আরে না না, ভয় পাস্ না। এই দেখ্, একটা শিলিং দিচ্ছি। আমার হাতটা ধর। দেখ্ আমার গায়ের রঙ, তোর গায়ের রঙ। এই শিলিংটা দিয়ে স্কুলের বই কিন্বি। বই কিন্বি, পড়াশোনা করবি, বড় চাকরি পাবি। আমি আবার জন্মালে তোর মতো গায়ের রঙ চাই। ভয় পাস্ না। পাঁচ শিলিং নিবি?” মিষ্টি মিষ্টি শিশুর মতো আচরণ, প্রায় কোনো ভাষা ব্যবহার না করে; ভাষায় থাকে ব্যাঙ্গ, নিজের প্রতি বিরক্তি।

সারা সপ্তাহ ধরে ও ছিল শিক্ষাক্রমে সরকারি অফিসার আর সপ্তাহ শেষে গাড়ি চালিয়ে নিজের অফিসে যাবার মহড়া চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর, ওই বুফে লাঞ্চে ওকে বলা হল লিভা-কে গাড়িতে লিফ্ট দিতে; ওর মতো খলার কোনো উপায় ছিল না। লিভা ছিল ওদের জেলা শাসকের অফিসের একজন অফিসারের বৌ, ওদের সরকারি কোয়ার্টার-এ থাকত। ও রাজধানীতে এসেছিল পুনে, ওর স্বামীর সঙ্গে, যে কিনা একই শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ও স্বামীর সঙ্গে পুনে ফিরে যাচ্ছে না। ববি, লিভা আর ওর স্বামীকে চিনত, একবার ওদের বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্নও খেয়েছিল। কিন্তু তিন বছর পরেও ওরা কেবলমাত্র চেনা-ই থেকে গেল। কিছু কিছু কঠিন আধা-সম্পর্ক থাকে, যেগুলোতে সন্দেহ কম, কিন্তু অনিশ্চয়তা বেশি, এদের সঙ্গে সম্পর্কটা তেমনই। কাজেই, এতে রোমাঞ্চের কোনো অবকাশ নেই; তাই এই সম্ভাবনাময় গাড়ি চালানোটা ওকে একটা মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে দিল।

প্রয়োজনে নয়, হতাশাই ববিকে নিউ শোপশায়ারে পাঠিয়েছিল। ও বেরোবার উদ্যোগ নিতে নিতেই বুঝে গিয়েছিল যে, সন্ধ্যাটা ভালো কাটবে না। নিউ শোপশায়ারের মতো জায়গা ওর পছন্দ নয়। ওর বারবরু-এ বসার দক্ষতা নেই, বারবরু-এ বসার মতো শক্ত-পোক্ত ও নয়। জুলুর সঙ্গে প্রথম চোখাচোখিতেই ওর সহজাত বুদ্ধিতে বুঝে গিয়েছিল যে, জুলু ছোকরা একটা উৎপাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ওর টেবিলে গিয়ে বসেছিল এবং ফেঁসে গিয়েছিল। আফ্রিকার এই সব পুরুষ

বেশ্যা ওর পছন্দ নয়। আফ্রিকার পুরুষ বেশ্যা হচ্ছে সেই সব ছোকরা যারা পাঁচ শিলিং-এর বেশি চায়; যারা পাঁচ-এর বেশি চায়, তারা কেবলমাত্র টাকা-পয়সাই বোঝে আর তাই তারা ভুল করে। ববি অনেকদিন আগে থেকেই এসব জানত, তা সত্ত্বেও, জুলুর সঙ্গে দরাদরি করতে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ও নিজের তৈরি সমস্ত নিয়মই ভেঙেছিল। আর তাতেই বোঝা গিয়েছিল, ওর নিয়মগুলো ছিল কেমন সঠিক। অবশ্য ওর মন খারাপও হয়নি, কোনো মানসিক আঘাতও লাগেনি। এর জন্যে ও জুলুকে কোনো দোষ দিচ্ছে না, লিভা-কেও না।

আফ্রিকায় আসার আগে এরকম ঘটনা ঘটলে, ও হয়তো আরো বিপজ্জনক জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুঃসাহসী অভিযান চালাত: তারপর নিজের ঘরে এসে আরো অতিরিক্ত কিছু, আত্ম-অবমাননাকর কিছু করত। কিন্তু এখন বুঝেছে যে, এই মনোভাব কেটে যাবে, সকাল হবে। লিভা ওর গাড়িতে যাত্রী হিসাবে থাকলেও, গাড়ি চালানোটা তো থাকবেই।

কাকের ডাকের মতো কোনো আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। হোটেলের পাশের গলি থেকে আওয়াজটা এল। আফ্রিকার রাতের একধরনের আওয়াজ এটা। মনে হয়, কোনো নিশাচর ধরা পড়েছে আর আফ্রিকান চিংকার-চেষ্টামেচি শুরু হয়ে গেছে। আরো পরে ও দেখল যেন ও শোপশায়ারের মতো কোনো জায়গায় চিং হয়ে পড়ে আছে আর হোটেলের পোশাক-পরা ছেলেটা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে; ও মাথা তুলে ছেলেটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, ছেলেটার মুখে হাসি আছে কিনা, বুঝতে পারছে না। ওর মাথায় যন্ত্রণা আরম্ভ হল, যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, মাথাটা ফেটে যাবে। এমনকি যখন ও জেগে গেল, যন্ত্রণাটা রয়েই গেছে, মাথাটা যেন খালি হয়ে গেছে। আরো খানিকক্ষণ পরে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এর পরে ও যখন আবার জাগল, হেলিকপ্টারের শব্দে, কখনও কাছে, কখনও দূরে চলে যাচ্ছে, আবার কখনও এত কাছে যেন সোজাসুজি হোটেলের ওপরে, তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, ওর সাদা ঘরটা আলোয় ভরে গেছে। এবারে উঠে পড়বার সময় হয়েছে।

ইয়াক-ইয়াক-ইয়াক-ইয়াক। হেলিকপ্টারটা খুব নিচু দিয়ে উড়ছে, যেন হোটেলের গাড়ি-রাখার জায়গাটা নিরীক্ষণ করছে, ববি ওর গাড়ির দরজার তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে চুরি-প্রতিরোধী সতর্ক করার আওয়াজটা হল, সেটাকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল। ববির মনে হল যেন হেলিকপ্টারটা ওকেই নিরীক্ষণ করছে, ও ওপরে তাকাল না। হেলিকপ্টারটা খানিকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে, ওপর দিকে উঠে গেল।

বাজার এলাকায়, যেখানে গত সন্ধ্যায় ববি বেপরোয়া গাড়ি চালিয়েছিল, কংক্রীট-লোহার তৈরি দোকানঘরগুলো, গুদামগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। বড় বড় ভারতীয় নাম লেখা দোকানের সাইনবোর্ডগুলো বাড়িগুলোর মতোই ঘিঞ্জি মনে হচ্ছে। রাস্তাটা বাজার এলাকা ছাড়াবার পর, একটা চওড়া শুকনো নালার পাশ দিয়ে চলে গেছে। নালটা এখন ঠাণ্ডা কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ধুলোয় ভরে গিয়ে চক্চক করবে। তারপর নালটা ছাড়িয়ে রাস্তাটা যানবাহন চলাচলের মতো দু'ভাগ হয়ে গেল, রাস্তার মাঝখানের জমিতে ফুল, ঝোপঝাড় দেখা গেল।

উপনিবেশ কালে কয়েকজন ভারতীয় মিলে একটা বহু-জাতিক ক্লাব হিসাবে ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীতে এটাই একমাত্র ক্লাব, যেখানে আফ্রিকানদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পরে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতাদের বহিষ্কার করা হয়, ক্লাবটাকে দখল করা হয় এবং পর্যটকদের জন্যে হোটেল বানানো হয়। একটা খালি জমির ওপর হোটেলের ব্যান্ডটা একটা বন্য শুকনো ঝোপঝাড় হয়ে আছে। আর প্রধান প্রবেশ দরজায় যেটা ধুলোয় ভরা জমিটার সঙ্গে একই উচ্চতায়, একটা বেরিয়ে আসা কংক্রীট ফলকের নিচে লিভা ওর হাতের দাঁতের রঙ-এর সুটকেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে ববির দিকে হাত নাড়ছে।

ওকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল, ওর পাতলা ধারালো মুখে এত সকালে ঘুম থেকে ওঠার কোনো ছাপ নেই। রাজধানীতে কী কারণে রাত কাটাতে হল, সেটা জিজ্ঞাসা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওর নীল রং এর ট্রাউজার্সের বাইরে ওর সরু, নিচু নিতম্ব ঘিরে একটা মাখন রং-এর সার্ট বুলছে; একটা ফ্যাকাশে বাদামি রুমাল দিয়ে ওর চুল বাঁধা। ঐ কাপড়ে, কংক্রীটের ফলকটার নিচে লিভাকে একটা ছোটখাট বাচ্চা ছেলের মতো দেখতে লাগছিল। ও দেখতে মোটেই সুশ্রী নয়, তাছাড়া শরীরে বয়সের ছাপ বোঝা যায়, অথচ অফিস-চতুরে ওর নাকি মানুষ-খেকো হিসাবে খ্যাতি আছে। ববি লিভা সম্বন্ধে অনেক ভীতিপ্রদ গল্প শুনেছে। গাড়ি

থেকে বেরোতে বেরোতে ববি ভাবল, আমার সম্বন্ধে যে সব গল্প লিভা শুনেছে, সেইরকমই ভীতিপ্রদ।

হৈ হৈ করতে করতে হোটেলের খালি চত্বরে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল, যেন অনেক লোকজন এই সাক্ষাৎকারের সাক্ষী রয়েছে, অথচ কেউ কোথাও নেই। ওরা যেন কোনো নাটকের দুজন অভিনেতা, কেউ কারো কথা শুনেছে না, লিভা বকে চলেছে, ক্ষমা চাইছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, ববি ওর কথা শুনেছে না, ওর ক্ষমা চাওয়া, কৃতজ্ঞতা সব সরিয়ে দিচ্ছে, ওর সুটকেসটা নিয়ে টানাটানি করছে।

ইয়াক-ইয়াক-ইয়াক-ইয়াক।

ওরা চুপ করে গিয়ে ওপর দিকে তাকাল। হেলিকপ্টারে কয়েকটা সাদা চামড়া বসে আছে। “ওরা রাজাকে খুঁজছে,” লিভা বলল, যখন হেলিকপ্টারটা অন্যদিকে সরে গেল। “সবাই বলছে, রাজা নাকি রাজধানীতেই আছেন। উনি একটা আফ্রিকান ট্যাক্সি চড়ে জেলাশাসকের অফিস-এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন। মনে হয়, ছদ্মবেশে।”

গতরাত্রের দেশত্যাগের গল্প ববি ওর গাড়ির যাত্রী সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ল। ওরা পাথর, ভাঙা ফুটপাথ-এর ওপর দিয়ে ঝাঁকানি খেতে খেতে, চত্বর থেকে বেরিয়ে এল।

“আশা করি, ওরা বেচারী বৌ-গুলোর ওপর খারাপ কিছু করেনি” লিভা বলল। ওর তখনও মন-মরা ভাব। “তুমি কি ওই এলাকায় একজন খুব ‘আস্থাভাজন’ ব্যক্তি?”

“খুব একটা নয়। আমি উঁচু সমাজে খুব একটা মিশতে পারি না।”

লিভা নিজের মনের আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল।

ববি মুখটা শক্ত করল। ওর মুখ দেখে যেন কিছু না বোঝা যায়, ও মুখটা বিষণ্ণ করে রাখল। ও এতক্ষণ ভালো ব্যবহার দেখিয়েছে, এটাই যথেষ্ট।

বিষণ্ণভাবেই ও দু’ভাগ-ওয়ালা রাস্তায় গাড়ি চালাতে লাগল আর অনেকক্ষণ পরে, বিষণ্ণ মুখেই ধীরে সুস্থে বাঁক নিয়ে শহরতলীর রাস্তায় ঢুকে পড়ল, রাস্তাটার দু’পাশে চওড়া ঘাসের জমি, কেয়ারি-করা ঝোপ, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় বাগান, এখানে ওখানে খাকি পোশাক-পরী খালি পায়ের পাহারাদার ছোকরারা।

“আমরা আফ্রিকায় রয়েছি বিশ্বাসই করা যায়না,” লিভা বলল, “এখানটা এত ইংল্যান্ডের মতো দেখতে।”

“আমি যে ইংল্যান্ডকে জানি, এ জায়গাটা তার চেয়েও ভালো।”

লিভা জবাব দিল না। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলল না।

ববির মনে হল, ও বড় বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েছে। সে বলল, “অবশ্য ওরা আফ্রিকানদের এখানে বসবাস করতে দেয়নি।”

“ববি, ওদের চাকর-বাকর আছে।”

“হ্যাঁ, তা ঠিক।” লিভা ওকে অপ্রস্তুত করে দিয়েছে। ও বুঝতে পারেনি লিভা এত তাড়াতাড়ি ওকে প্ররোচিত করবে। ও শান্ত অথচ কঠোর ভাবে বলল, যেন ও জাতিগত ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করছে, “আমার মনে হয় এই জন্যই জন মুবেন্ডে-ম্বারারা তাঁর দেশীয় বাড়ি থেকে পালাতে অস্বীকার করেছেন।”

“তুমি এদের নামগুলো কী সুন্দর উচ্চারণ কর।”

ববির বিষণ্ণতা হতাশায় পরিণত হল। “উনি কিন্তু তোমার কাছে আসবেন না। যদি তুমি ওঁর কাজ দেখতে চাও, তোমাকে ওঁর কাছে যেতে হবে, ওঁর দেশীয় বাড়িতে।”

লিভা বলল, “যখন জনি এম শুরু করেন, উনি একজন ভালো আদিম চিত্রকর ছিলেন আর আমরা সবাই ওঁর আঁকা ওঁর পরিবারের হাড়জিরজিরে গরু-মোষের অপূর্ব ছবিগুলো খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু উনি এই ছবি এত বেশি আঁকলেন যে, তাঁর শিল্পের আদিমতা থেকে আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল। এখন উনি কেবল বাজে ছবি আঁকেন। কাজেই আমার মনে হয়, তিনি যদি তাঁর দেশীয় বাড়িতে বসে তাঁর গরু-মোষের ছবিই আঁকতে থাকেন, তাতে কিছুই যায় আসে না।”

“এসব কথা আগেই বলা হয়েছে।”

“তাঁর দেশীয় বাড়িতে বাস করা নিয়ে?”

“তাঁর ছবি নিয়ে।” ববির উত্তর দিতে নিজের ওপরই ঘেন্না হচ্ছিল।

“উনি দারুণ মোটা হয়ে গেছেন” লিভা বলল।

ববি স্থির করল, আর কিছুই বলবে না। সে স্থির করল, আরো বিষণ্ণ হয়ে থাকবে এবং এর পরে আর কোনো কথায় থাকবেনা।

শহরতলীর বাগানগুলোর জায়গায় এবার আফ্রিকান শহুরে বাড়ি-ঘর দেখা যেতে লাগল, গাছপালা অনেক কম, আর শহরের প্রান্তে জমিটা যেন খুলে ছড়িয়ে গেছে আর আলোটা এমন যে, কাছাকাছি সমুদ্র আছে, এই আলো যেন তারই ঘোষণা। এইখানে, উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় রোদে-জলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় হোর্ডিং, যাতে দেখা যাচ্ছে, হাস্যমুখ আফ্রিকানদের, সিগারেট খাচ্ছে, নরম পানীয় পান করছে, সেলাই মেশিন ব্যবহার করছে। হোর্ডিংগুলো শহর আর খোলা প্রান্তর, দু’দিকের জন্যই রাখা হয়েছে।

কিছু কিছু আফ্রিকানদের দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগই হাঁটছে, দু-একজন পুরোনো সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের পরণের কাপড়ে লাল, নীল, হলুদে, সবুজ লম্বা লম্বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তালি দেওয়া, ওটাই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। ববি আফ্রিকানদের রঙ-এর রুচি বোধ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বিষয়টা শিল্পীর দিকে ইঙ্গিত করতে পারে।

জমিটা ঢালু হতে শুরু করল; সামনের দৃশ্যটা আরো ছড়িয়ে গেল। ইঙ্গ-ভারতীয় শহরটা ইতিমধ্যেই অনেক পেছনে পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। রাস্তার একধারে জমিটা

উঁচু-নিচু, যেন ঘাসে ঢাকা উই-টিবি। প্রত্যেকটা টিবি বোঝাচ্ছে, ওখানে একটা গাছ ছিল, সেটা কাটা হয়েছে। একেবারে উষ্মর জমি, অনাবাদী, ফাঁকা; অথচ এখানে মাত্র সত্তর বছর আগেও ওই রাস্তার লোকগুলোর মতো আফ্রিকানরা বসবাস করত, জঙ্গলের আশ্রয়ে, পৃথিবীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে।

ইয়াক-ইয়াক। প্রথমে আওয়াজটা অনেক দূরে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই হেলিকপ্টারটা মাথার ওপর এসে গেল। কিছুক্ষণ ওটা ওখানেই রইল, সকালের আলো ওটার গায়ে পড়েছে, নিচের গাড়ির আওয়াজটা ডুবিয়ে দিচ্ছে। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে আরো নিচে নামছে, কখনও হল্‌দেটে আলো, কখনও ভিজেভিজে ছায়া। হেলিকপ্টারটা সরে গেল, বাতাসের আর গাড়ির টায়ারের শব্দ ফিরে এল।

রাস্তার ধারে স্তূপ-করা ফল আর সবজির পাশ থেকে ভারী হাত-পা ওয়ালা আফ্রিকান ছেলেরা রাস্তার ওপর দৌড়ে এল, হাতে ফুলকপি, বাঁধাকপি ধরে আছে। এই জায়গায় আগে গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, উন্মত্ত জনতা গাড়ি-চালককে ধরে পিটিয়েছিল, রাস্তার ধারের ঝোপগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছিল দলে দলে। ববি গাড়িটা আস্তে করে দিল। ও স্টিয়ারিং হুইল এর ওপর ভর দিয়ে প্রথম ছেলেটার দিকে আস্তে করে হাত নাড়ল। ছেলেটা সাড়া দিল না, কিন্তু ববি হাসি হাসি মুখে হাত নাড়াতে নাড়াতে সবকটা ছেলেকে পার হয়ে গেল। তারপর ওর লিভার কথা মনে পড়ল আর ও আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

লিভা নিজের মনের প্রফুল্লতায় ভরে রয়েছে, শান্ত। আর ও যখন বলল, “ফুলকপিগুলোর সাইজ দেখেছ?” তখন মনে হল, ওরা যে ঝগড়া করছিল, সে কথা ভুলে গেছে।

ববি গম্ভীর ভাবে বলল, “হ্যাঁ, ফুলকপিগুলোর সাইজ দেখেছি।”

“ওগুলো দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।”

“ও?”

“নিজেকে সত্যিই বোকা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি কখনো ভাবতেই পারিনি যে, ওদের চাষ করবার জমি আছে। আমি ভাবতাম ওরা বুঝি জঙ্গলেই বাস করে। যখন মার্টিন বলল যে আমাদের সাদার্ন কালেক্টরেটে পোস্টিং হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম, জায়গাটা হবে জঙ্গল পরিষ্কার করে খানিকটা খোলা জায়গা। ভাবতেই পারিনি যে, ওখানে রাস্তা, বাড়ি, দোকান এই সব থাকবে—”

“আর, রেডিও।”

“কি হাস্যকর ব্যাপার। আমি জানতাম, তবু যখন দেখলাম একটা গাছের তলায় ওরা ওদের বল্লমের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরোনো ধরণের বড় রেডিও সেটের চারপাশে গোল হয়ে, হিজ মাস্টার্স ভয়েস।”

ববি বলল, “তোমার মনে আছে সেই আমেরিকান-এর কথা, যে আমাদের এখানে এসেছিল আমাদের পরিসংখ্যান বা ওইরকম কিছু শেখাতে? ওকে একদিন আমি গাড়িতে চড়িয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আর আমরা শহরের বাইরে আসতে না

আসতেই ও কি দারুণ ভয় পেয়ে গেল! খালি জিগ্যেস করছে, “‘কোথায় কঙ্গো? ওটাই কি কঙ্গো?’ সারাক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে ছিল।”

রাস্তাটা এখন একটা পাহাড়ের গায়ে চলে এসেছে আর বাঁকগুলো হয়ে উঠেছে ধারালো। রাস্তার ধারে একটা তক্তায় লেখা আছে, “পড়ন্ত পাথর থেকে সাবধান।”

“আমার প্রিয় এই সতর্কবার্তাটা,” ববি বলল, “আমি সবসময় এটা দেখবার জন্যে তাকিয়ে থাকি।”

“একেবারে ঠিক কথা।”

“তাই না?”

ওর গান্ধীর্ষ কেটে গেছে। এখন আবার গান্ধীর হওয়াটা শক্ত। ইতিমধ্যেই ও আর লিভা সহ-পর্যটক হয়ে গেছে। দৃশ্যাবলী দেখতে ভালো লাগছে, সবকিছুতেই কথা বলার ঝোক এসে গেছে।

“এইরকম ভোর ভোর বেরোতে আমার ভালো লাগে,” লিভা বলল, “ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মকালের ভোরবেলাগুলো মনে পড়িয়ে দেয়। যদিও বলতেই হবে, ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকাল আমার মোটেই ভালো লাগে না।”

“ওঃ!”

“সবসময়েই ভাবতাম জীবনটা উপভোগ করতে হবে, কিন্তু কখনোই পারতাম না। দিন কেটে যেত, কিছুই করতে পারতাম না। গ্রীষ্মকালে খালি মনে হত, আমি যেন অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলছি। আমার পছন্দ ছিল শরৎকাল। সেই সময় আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকত। আমার কাছে শরৎকাল হলে সব কিছু নতুন করে পাওয়ার ঋতু। মনে হয়, ব্যাপারটা মেয়েলি, তাই না?”

“মেয়েলি বলব না। বলব একটু অন্যরকম। একসময় আমার একজন মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন, যিনি ভাবতেন অক্টোবর মাস আমাদের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। উনি বলেছিলেন, যখনই উনি এটা বুঝলেন, তখনই শীতকালে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ করলেন। অবশ্য তখন উনি বাড়িতে সব ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।”

“ববি, আমার কেন জানি মনে হত, তোমার একজন মনস্তত্ত্ববিদ দরকার।” লিভা একটু উচ্ছল হয়ে উঠল। “আমাকে বল তোমার কী গুণগোল হয়েছিল।”

ববি ঠাণ্ডা গলায় বলল, “অক্সফোর্ড-এ আমার একটা মানসিক বিপর্যয় হয়েছিল।” ও খুব ঠাণ্ডা ভাবে কথাটা বলল। লিভা কিন্তু উচ্ছল। “অনেকদিন থেকেই এই রকম একজনকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম। আচ্ছা, মানসিক বিপর্যয় মানে ঠিক কী?”

ববি একাধিক বার এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু এখন ও যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেনা, এমন ভান করল। “একটা মানসিক বিপর্যয়। যেন নিজেকেই মরে যেতে দেখছ। মানে, ঠিক মরে যাওয়া নয়। যেন নিজেকেই একটা ভূত হয়ে যেতে দেখার মতো।” লিভা ওর গলার স্বর ববির মতো করল, “ব্যাপারটা কি অনেকদিন চলেছিল?”

“আঠারো মাস।”

লিভা প্রভাবিত হয়েছে বলে ওর মনে হল।

যেন একটা বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে এই ভাবে একটু হেসে ও বলল, “ওই সুন্দর গাছটা দেখ।” লিভা ওর কথা শুনল। আর গাছটা দেখার পর ও বেশ গম্ভীর ভাবে বলল, “আফ্রিকা আমার জীবন বাঁচিয়েছে।” যেন সব কথা বলা হয়ে গেল, সব কিছুর ব্যাখ্যা করা হয়ে গেল; যেন ওকে যারা ভুল বুঝেছে, তাদের সবাইকে একই সঙ্গে শাস্তি দেওয়া ও মাপ করা হয়ে গেল।

লিভা একদম চুপ। ওর সব কথা হারিয়ে গেছে।

এই সেই বিখ্যাত দৃশ্য। এই উদার, খোলামেলার কথাই আকাশ বলছিল। জমিটা ক্রমাগত নিচে, আরো নিচে নেমে গেছে। মহাদেশটা এখানে দারুণ বেখাপ্পা। বিশাল চওড়া উপত্যাকার নি-রঙ সুদূরে দৃষ্টি হারিয়ে যায়, সব দিকেই মেঘ আর ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে কোথায় মিশে যায়।

লিভা বলল, “আফ্রিকা, আফ্রিকা।”

“আমরা গাড়ি থামিয়ে একটু দেখি?”

রাস্তাটা যেখানে অনেকটা চওড়া হয়ে গেছে, সেখানে গাড়িটা একপাশে দাঁড় করিয়ে ওরা নেমে পড়ল।

“কী ঠাণ্ডা,” লিভা বলল।

“তোমার বিশ্বাসই হবে না, তুমি প্রায় বিষুবরেখার ওপাশেই দাঁড়িয়ে আছ।”

ওরা দুজনেই এই দৃশ্যটা অনেকবার দেখেছে আর ওরা দুজনেই এমন কিছু বলতে চাইছিল না যা অন্যজন আগেই শুনেছে, অথবা কিছু বানানো কথা।

“মেঘের জন্যই এটা হয়েছে” শেষ পর্যন্ত লিভা বলল, “আমরা প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, মার্টিন সারাক্ষণ মেঘের ফটো তুলেছিল।”

“মার্টিন একজন ফটোগ্রাফার, জানতাম না তো।”

“ও ফটোগ্রাফার নয়। একটা ক্যামেরা ওর হাতে এসেছিল। ও ফিল্মগুলো প্রিন্ট করতে পাঠাবার সময় আমার নামে পাঠাত, যাতে কোডাক কোম্পানিতে কেউ বুঝতে না পারে যে, ছবিগুলো ও তুলেছে। ওরা মনে হয় একদম বাজে বাজে ফটো পেয়েছিল। পরে, মার্টিন মেঘের ছবি তুলে তুলে ক্লাস্ত হবার পর, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ব্যাঙের ছাতা, ছোট ছোট বুনো ফুল, এসবের ফটো তুলত। ক্যামেরা এই ধরনের ছবি তোলার উপযুক্ত ছিল না। কাজেই ওর ফটোতে কেবল সবুজ বাদামি অস্পষ্ট দাগ দাগ উঠেছিল। আর কোডাক-এর লোকেরা কর্তব্যবোধে প্রত্যেকটা অস্পষ্ট দাগওয়ালা ফটো, আমার নামে পাঠিয়েছিল।”

এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা দৃশ্যটা দেখার কথা ভুলতে বসেছিল।
‘এখানটা কী শান্ত, ঠাণ্ডা।’ ববি বলল।

একটা সাদা ভক্সওয়াগন গাড়ি শহর থেকে বেরিয়ে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। গাড়িটা চালাচ্ছিল একজন সাদা-চামড়া। লিভা আর ববিকে দেখে ও অনেকক্ষণ ধরে টানা জোরে গাড়ির হর্ণ বাজাল, তারপর পাহাড় থেকে নিচের দিকে বেশ জোরে নেমে গেল।

“বুঝতে পারছি না ও কাকে উদ্দেশ্য করে এরকম করল,” ববি বলল।

লিভার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজাদার মনে হল।

“ব্যাপারটা অদ্ভুত,” ওরা গাড়িতে বসার পর ববি বলল, “কিন্তু আমার কেন জানি না, মনে হয়”— ও হাত দিয়ে বিশাল উপত্যকাটা দেখাল— “এই সব কিছুই মালিক আমি।”

লিভা প্রায় হেসে ফেলে আর কি! এবার ও সামনে ঝুঁকে একটু হাসল। “সত্যিই এটা অদ্ভুত ববি, বিশেষ করে তুমি যখন এই রকম করে বল।”

“কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি। এই মহান দৃশ্যটা আমি কিছুতেই দেখতে পারব না, যদি না আমি জানি যে, আমি আবার একদিন এই দৃশ্যটা দেখব। তুমি জান,” ও সোজা হয়ে বসে ডাইনে বাঁয়ে দেখে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, “আমি আগে জানতামই না যে, আফ্রিকার মতো একটা জায়গা আছে। আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। মনে হয়, তোমার মতো আমিও আদিবাসীদের কথা, ওদের বনুদের কথা ভাবতাম। অবশ্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে জানতাম।”

“এই মাত্র মনে হল, কিছুক্ষণ ধরে হেলিকপ্টারটার আওয়াজ শুনে পাচ্ছি না।” “হেলিকপ্টার বেশি দূরত্ব যেতে পারে না। এয়ারফোর্স একমাত্র এটাই আমি শিখেছি।”

“ববি?”

“আরে, জাতীয় কর্তব্য।”

“তোমার কি মনে হয় ওরা রাজাকে ধরে ফেলেছে?”

“এটা রাজার পক্ষে একটা আতঙ্কের ব্যাপার,” ববি বলল, “এই ওদের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। আমি নিজে যদিও একজন সংখ্যালঘু আমি জানি, কিন্তু তবু রাজাকে আমার মনে হয় বড় অস্বস্তিকর। আমার কাছে উনি যথেষ্ট ইংরেজ। এখন শুধু দেখার, ওঁর লন্ডনের বুদ্ধিমান বন্ধুরা ওঁর জন্যে কী করতে পারে। এই রকম বোকা লোক। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওদের মধ্যে কেউ ওঁর মাথায় এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মতলব ঢুকিয়েছে।”

“এখানে এখন ভয়ানক দমবন্ধ পরিবেশ, কি বল?”

“অথচ ওদের এটা খুব সুন্দর আর মজাদার লাগে। আমার কোনোদিনই ভালো লাগত না। এখন কিন্তু প্রচুর উল্টোপাল্টা সমালোচনা হবে। আর আমরাও বাদ যাব না। যেমন আফ্রিকান একনায়কত্ব কায়েম করা, এই সব।”

“মার্টিনও এই নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন,” লিভা বলল।

“ও:!”

“সমালোচনা বললে না? সেই জন্যে।”

“আমি তো এখানে চাকরি করতে এসেছি,” ববি বলল “ওরা কীভাবে দেশ শাসন করবে, আমি তো সেকথা ওদের শেখাতে আসিনি। আফ্রিকানরা কী রকম সরকার পছন্দ করবে, সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তাতে তো এই সত্য চাপা দেওয়া যাবে না, যে, ওদের খাদ্য চাই, স্কুল চাই, হাসপাতাল চাই। যারা সেবামূলক কাজ করবে না, তাদের এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি জিনিসটা এই ভাবেই দেখি।”

লিভা জবাব দিল না।

“এই ধরনের ভাব-ভঙ্গী অবশ্য মোটেই জনপ্রিয় নয়, আমি জানি,” ববি বলল, “আমাদের ডাচেস্ এ ব্যাপারে কী বলেন?”

“ডাচেস্?”

“আমি তো তাকে এই ভাবেই ডাকি।”

“তুমি কি ডরিস মার্শাল-এর কথা বলছ?”

“আমি ‘কালোদের দিকে’ ঝুঁকি। ও এই কথাই বলে না?”

লিভা হাসল।

“অসাধারণ” ববি বলল, “কিন্তু বুঝি না আমরা কেন ভাবি যে, আফ্রিকানদের চোখ নেই? তুমি ভাবছ আফ্রিকানরা জানেনা যে, মার্শালরা পুরোনো দক্ষিণ আফ্রিকা রেলপথের লোক?”

“ডরিস তো দক্ষিণ আফ্রিকার লোক।”

“হ্যাঁ ও নিজে যেমন সবাইকে বলে থাকে,” ববি বলল।

“হ্যাঁ, এবং তার জন্যে ও গর্ব করে।”

“‘যখন আমি সাফাফ্রিকাতে ইটিকিট স্টেডি করছিলাম’-”

“ঠিক তাই,” লিভা বলল, “তুমি একদম ঠিক বলেছ। আর ‘গ্লোভ-বক্স’-এর ব্যাপারটা তুমি জান?”

“তুমি বলতে চাইছ, তুমি গ্লোভ-কম্পার্টমেন্ট বল না।”

“না, না, সবসময়েই বলবে ‘গ্লোভ-বক্স’।”

“কারণ সাফাফ্রিকা-তে এটাই ইটিকিট।”

“ঠিক তাই, ঠিক তাই,” লিভা বলল।

“আমার মনে হয়, যত তাড়াতাড়ি ডেনিস মার্শালকে ওরা চেপে ধরতে পারে আর দুজনকেই সাউথ আফ্রিকায় চালান করে দিতে পারে, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল।”

লিভা ওর চুলে রুমালটা ঠিক করে বাঁধল আর জানালার কাচটা সামান্য নামাল।

“বেশ ঠাণ্ডা” ও বলল আর একটা লম্বা শ্বাস নিল। “রাজধানীর এই জিনিসটা বেশ ভালো, এই খোলা আগুন জ্বালানো।”

ওরা এতক্ষণ যেভাবে কথাবার্তা বলছিল, তারপর এই দেশত্যাগীদের সাধারণ কথাবার্তা ওকে হতাশ করল। ও বলল, “রাজধানীর ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, এই গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসা। আমার মনে হয়, এতে আমি কোনোদিন ক্লান্ত হব না।”

“থামো, থামো, আমাকে দুঃখ দিও না।”

“সমারসেট মম-এর কোনো একটা লেখায় একটা চমৎকার জিনিস পড়েছিলাম। আমি জানি, আজকাল মম-কে লোকে বেশি পছন্দ করে না। কিন্তু উনিই লিখেছিলেন যে, তুমি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটি চাও, সত্যি সত্যিই চাও এবং সত্যি সত্যিই চেষ্টা করে যাও, তাহলে সচরাচর দেখা গেছে, তুমি ওটা পেয়ে যাবে। বলতেই হবে আমিও সেইরকমই বোধ করছি। আমার মনে হয়, আমরা সাধারণত যা করতে চাই, তা অবশ্যই করতে পারি।

“তোমার পক্ষে এটা সহজ, ববি। কিন্তু তুমিই তো বলছিলে, একটা সময় ছিল যখন তুমি আফ্রিকার অস্তিত্বই জানতে না।”

“এখন তো জানি।”

“আমিও জানি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। আমার এখানে থাকার ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু আমি জানি, আমি এখানে থাকতে পারব না।”

লিভা জানালাটা বন্ধ করে দিল, আরো একটা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর বাইরের বিশাল উপত্যকার দিয়ে চেয়ে রইল।

লিভা বলল, “আমি যদি ইংরেজ না হতাম, আমি একজন মাসাই হতে চাইতাম। কী লম্বা এদের মেয়েগুলো, কী চমৎকার।”

এটা আফ্রিকাকে প্রশংসা করা হল। ববি বুঝল এটা লিভার ওর প্রতি নতুন মনোভাব। কিন্তু ও বলল, “কেনিয়ায় বসবাসকারী লোকের মতোই কথা। এই রোমান্টিক কালোরা কিন্তু পিছিয়ে-পড়া জাতি।”

“এরা পিছিয়ে-পড়া? এদের ‘মেনিয়াত্তা’ না কী বলে, সেগুলোর কথা ভাবছি। একদম ভূগোল বই-এর ছবির মতো। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, লম্বা টানা বেড়া, রাত্রি বেলা গরুগুলোকে লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ঘরে নিয়ে আসা।”

“আমিও সেই কথাই বলছি। আফ্রিকায় পিটার প্যান।”

“কিন্তু এই যে আফ্রিকার আদিম মানবের দিক, এটা কখনও তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না?”

ববি উত্তর দিল না। ওরা দুজনেই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

ববি বলল, “বলতেই হবে তোমাকে ওই ‘মেনিয়াত্তা’-য় দেখার কথা ভাবতেই পারি না।”

লিভা কথাটা মেনে নিল। কিছুক্ষণ পরে বলল, “লুটেরা কথাটা আমার ভালো লাগে।” এখন আর রাস্তাটা ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না। রাজধানীর দিকে গাড়ি যদিও এখনও কম, কিন্তু ক্রমাগত চলেছে; পুরোনো লরি, পাগড়ি-পরা শিখ তেলের ট্যাঙ্কার

চালাচ্ছে, কয়েকটা ইউরোপীয়ান ও এশিয়ান গাড়ি, আফ্রিকানরা চালাচ্ছে দেখতে প্রায় নতুন পিউজো গাড়ি, আফ্রিকান-ঠাসা, সবসময়েই জোরে চালাচ্ছে। এই পিউজো গাড়িগুলো এদেশের লম্বা সফরের ট্যাক্সি-বাস। এরকম একটা গাড়ি, হর্ণ বাজিয়ে, ববিদের অবাক করে দিয়ে একটা খাড়াই-এ ববিদের পার হয়ে এগিয়ে গেল। পেছনে বসা আফ্রিকানগুলো ওদের দিকে ঘুরে হাসল। লিভা মুখ ঘুরিয়ে নিল। হর্ণ কিন্তু বেজেই চলেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তাটা বাঁক নিল আর পিউজো গাড়ির ব্রেকের আলো জ্বলে উঠল।

“বুঝতে পারি না, কিছু কিছু লোক কেন ব্রেক দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালায়,” ববি বলল।

লিভা বলল, “যে কারণে ওরা ওদের বাড়তি টায়ারগুলো বেচে দেয়।”

প্রত্যেকটা বাঁকে, ব্রেক-লাইট জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে পিউজো গাড়িটা এগিয়ে গেল।

“আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম,” লিভা বলল, “যার সঙ্গেই দেখা হবে, সে কোনো না কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে অথবা অন্য কাউকে জানে, যার দুর্ঘটনা হয়েছে। আমাদের চতুরে কত লোক ভাঙা হাড়ের ব্যান্ডেজ বাঁধা ঘুরছে, দেখে মনে হয় আমরা ক্ষি করার জায়গায় রয়েছি।”

এটা পুরোনো রসিকতা, ববি অবশ্য এটা মেনে নিল। “বেশিদিন হয়নি, এখানেই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের একজন শিখ বন্ধু গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে, ঢালু রাস্তায় নামছিল। কিভাবে যেন, ওর স্টিয়ারিং হুইল সড়কে যায়।”

“তারপর কী হল?”

“রাস্তা থেকে হড়কে নিচে নেমে আসে এবং মারা যায়।”

“মার্টিন বলে ওরা নাকি সবচেয়ে খারাপ ড্রাইভার।”

“রাস্তার মাঝখানে যদি কখনও একটা মার্সিডিস গাড়ি দেখ, বুঝবে যে ওটা নিশ্চয়ই একজন এশিয়ান চালাচ্ছে। আসি ওদের দোকানগুলো দু'চোখে দেখতে পারি না। ওরা আফ্রিকানদের কখনও পুষ্টি প্যাকেট সিগারেট বেচবে না। একবারে, একটা কি দুটো সিগারেট দেবে। ওরা আফ্রিকানদের লুটে খাচ্ছে।”

“ওদের কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেবার সোজা রাস্তা হচ্ছে ওদের বলা, ‘হ্যালো, এই জিনিসটা দক্ষিণ আফ্রিকায় তৈরি, তাই না?’ ওরা এত ভয় পেয়ে যাবে যে, ওরা তোমাকে বিনা পয়সায় পুরো দোকান দিয়ে দেবে।”

লিভা এর পরেই একদম চুপ করে গেল, বুঝতে পারল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ওরা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকা ভূমিতে নেমে এল। সূর্য এখন ওপরে উঠে গেছে; সমস্ত প্রান্তর একেবারে উন্মুক্ত, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ো ঢাকা

গাড়ির ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে। লিভা ওর দিকের জানালাটা নিচে সামান্য নামিয়ে দিল। উপত্যকার অন্য দিকটায় গড়ানে ঢালটা একেবারে ঝাপসা দেখাচ্ছে; কোনো রঙ প্রায় নেই বললেই চলে, আলো আর দূরত্বের একটা বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। ওরা ওপাবের ওই ঢালটার দিকেই যাচ্ছে, ওখানেই ওই উঁচু মালভূমিটা। ওদের সামনে রাস্তাটা একদম সোজা চলে গেছে।

ষাট, সত্তর, আশি মাইল ঘণ্টায়; কিছু না ভেবেই ববি গাড়ির গতি বাড়িয়ে চলেছে, রাস্তাটা ওকে টানছে। পাহাড়ে বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে এখানে এসে সর্বদাই গতি, দূরত্ব আর মানসিক চাপ, সব মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু হয়ে যায়। ববি গাড়ি আর সামনের কালো রাস্তায় মনঃসংযোগ করে গাড়ি চালাচ্ছে, ওর সময়ের বোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই ও বলে দিতে পারে, পনেরো মিনিট কেটে গেছে।

একটা পরিত্যক্ত কাঠের বাড়ি; রাস্তার পাশের কাঠের তক্তায় প্রায় ধুয়ে যাওয়া লাল-সাদা রঙে ধীরে গাড়ি চালাবার সাবধান বাণী, রাস্তার ওপরেও লম্বালম্বা সাদা অক্ষরে একই সাবধান বাণী লেখা। একটা নির্জন জনশূন্য ছোট রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা সমকোণ বাঁক নিয়ে হাইওয়েটা একটা ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত উপনিবেশের জীর্ণ প্রধান রাস্তা হয়ে দাঁড়াল; টিন এবং পুরোনো কাঠ, বাঁকাচোরা বিজ্ঞাপনের তক্তা, একটা লম্বা তারের বেড়া, তাতে লাল রঙে বিপদ-সংকেত আটকানো, ধুলোয় ভরা কাঁচা শাখা-রাস্তা, ধূলি-ধূসরিত প্রাঙ্গণে গজিয়ে ওঠা গাছ, ট্যারা-ব্যাঁকা দোকানগুলো যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। তারপরেই রাস্তাটা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল, একটা আফ্রিকান জনতা।

ওদের মাথায় ছিল ফেল্টের টুপি, ওপরটা কোনাে আর ধারগুলো নিচু করে নামানো। অনেকেরই পরনে লম্বা লম্বা ঝুঁকে পড়া জ্যাকেট, বাদামি বা গাঢ়-ধূসর, দেখে মনে হয় ফেলে দেওয়া ইউরোপিয়ান পোশাক। বেশ কিছু নারী ও পুরুষের পরনে উজ্জ্বল রঙের তালিদেওয়া কাপড়। দুই তিনজন লোক, হাতে পেন্সিল ও লেখার শ্যাড, ওরা ছাউনি লাগানোর উঁচু ক্ষেত্র-ওয়ালা খোলা লরিতে আফ্রিকানদের চড়াচ্ছিল। কালো পোশাক-পরা পুলিশের লোকেরা চুপচাপ লক্ষ রাখছিল।

“ওরা আজ খুব ছটফট করছে,” লিভা বলল।

ববি খুব আশ্বে আশ্বে গাড়ি চালাতে চালাতে রসিকতাটা এড়িয়ে গেল। রাস্তা থেকে আর লরি থেকে আফ্রিকানরা তাকিয়ে রইল, ওদের কালো কালো মুখগুলো টুপির তলায় অভিব্যক্তিহীন। ববি আশ্বে আশ্বে হাত নাড়া শুরু করেই থেমে গেল। লিভা ওদের চাহনি দেখতে দেখতে নিজের মাথার রুমালটা ঠিক করল, তারপর সোজা সামনে তাকিয়ে রইল। ওরা জনতার ভীড় পার হয়ে যাবার পরও ববি আশ্বে আশ্বেই গাড়ি চালাতে লাগল, যেন ও পালিয়ে যাচ্ছে, এরকম মনে না হয়। পেছনে-দেখার আয়নাতে রঙিন তালি দেওয়া পোশাক-পরা, মাথায় টুপি কালো-মুখ আফ্রিকানরা আশ্বে আশ্বে ছোট হতে লাগল।

উপনিবেশটা পার হয়ে, একটা বাঁক নেবার পরে, ববি আবার পেছনে তাকাল, পেছনের রাস্তাটা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা।

আলোটা চোখে লাগছে। লিভা ওর কালো চশমাটা পরে নিল। যদিকে চোখ যায়, চতুর্দিকে কেবল ঝোপ-ঝাড়, মনে হয় যেন ওই দূর অস্পষ্ট পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। অনেক উঁচু আকাশে একটুখানি হালকা সাদা ধোঁয়ার মতো মেঘ দ্রুত বাড়তে লাগল। প্রথমে রূপোর মতো, তারপর কালো ঝড়ের মেঘে পরিণত হল, আবার ছড়িয়ে গিয়ে অন্য চেহারা নিল।

ববি ও লিভা কোনো কথা বলছিল না। অনেকক্ষণ পরে, ববি আবার গাড়ির গতি বাড়াল। লিভা বলল, “তুমি কি জান, ওরা কী করতে যাচ্ছে?”

ববি কোনো উত্তর দিল না।

“ওরা ওদের ঘৃণার শপথ নিতে চলেছে। তুমি জান তার মানে কী? তুমি জান ওরা কী সব নোংরা ব্যাপার করতে চলেছে? কী সব নোংরা ওরা খাবে? রক্ত, মলমূত্র, ময়লা।” ববি স্টিয়ারিং হুইল-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল, “জানি না এই সব গল্প কতটা বিশ্বাসযোগ্য।” “আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিকই জান। রাজধানীতে পুরো সপ্তাহান্তে এই সব চলেছে।”

“রাজধানীতে প্রচুর গুজব ছড়াচ্ছে। কিছু কিছু লোক এতে খুব মজা পায়।”

“রাজা আর রাজার লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা। আর তোমার বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে। এরকম মজা আমার দরকার নেই।”

“জানি, জানি। তুমি ভাবছ শপথের কথা, আতঙ্কবাদীদের কথা, পাক্স-র কথা। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজকের ব্যাপার ওটা নয়। আর তুমি তো জান যে আমি বিশ্বাস করি, ওরা শুধু একটুরো মাংস খায়। না খায়ও না, কেবল মাংসটা একটু দাঁতে ঠেকায়।”

“ভালো, আমার মনে হয়, সরকারি ভবনে গিয়ে নোংরা খাওয়া, হাত ধরাধরি করে অন্ধকারে নগ্ন হয়ে নাচা, ভবনে গিয়ে দর্শনার্থীদের খাতায় সই করার চেয়ে ভালোও নয়, খারাপও নয়।”

ও হাসল, আর মেজাজটা ফিরে এল।

“বলতেই হবে, ওখানে ওদের চাহনি আমার মোটেই ভালো লাগেনি,” ববি বলল, “মিনিট খানেকের জন্য মনে হয়েছিল আমরা বুঝি পুরোনো দিনগুলোয় ফিরে গেছি। সেক্ষেত্রে, এখানে থাকাটা আমার মোটেই পছন্দের নয়, কি বল?”

“ওঃ! জানি না। তবে মনে হয়, আমি মানিয়ে নিতে পারতাম। আমি খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারি।”

“ভাবছি, রাষ্ট্রপতি আর তার লোকদের ব্যাপারে আমরা বোধ হয় একটু বেশি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি। এইরকম সময়ে নিজেদের যেন বাইরের লোক বলে মনে হয় এবং স্বভাবতই আমরা এটা মানতে পারি না। ওরা যদি আরো একটু সহজ হত, তাহলে আমি নিশ্চিত, ওদের আমরা অনেক বেশি পছন্দ করতাম। মাসাইদের

মতো। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমি কিন্তু কোনো... ‘পক্ষপাত’ দেখতে পাইনি।”

লিভার কালো চশমার ওপর ওর সরু কপালটা কোঁচকালো। “ওঃ! তোমার পক্ষে এটা সহজ ববি।”

“তার মানে?”

“মনে হচ্ছে, আজ বিকেলে বৃষ্টি হবে। আমরা পিচের রাস্তা ছাড়বার পর। ওপরে যে মেঘ জমছে, সেটা দেখছি। মার্টিন-এর সঙ্গে প্রচুর ভ্রমণ করলে, তোমার মেঘ দেখবার চোখ তৈরি হয়ে যাবে। রাস্তার যে অংশটায় পিচ্ নেই, সেটা আমার ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্ন। মাত্র আধঘণ্টা বৃষ্টি হলেই, সব কাদা হয়ে যাবে। আর কাদায় চাকা পিছলানো আমি সহ্য করতে পারি না। মনে হয় যেন একটা ভূমিকম্পের মধ্যে পড়েছি। এই একটা ব্যাপারে আমি একদম হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত হয়ে পড়ি। এটা, আর ভূমিকম্প।”

“আমার মনে হয় না, মেঘ জমছে।”

“যাই হোক, কর্ণেলের ওখানে যদি রাত কাটাতে হয়, লেকের ওপর দিয়ে ঝড়ো বৃষ্টি বয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে, তাহলে কী রোমাঞ্চকরই না হয়?”

“উনি এমন একটা লোক, যার কাছ থেকে আমি সরে থাকতে চাই। ওঁর সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, উনি একটি সম্পূর্ণ বিরক্তিকর চরিত্র।”

“উনি একজন পাক্কা বসবাসকারী, বলতেই হবে। কারো পরোয়া করেন না।”

“তুমি বলতে চাইছ, আফ্রিকানদের।”

“ববি, ভালো করে শোন। মার্শালরা যখন প্রথম ওঁর ওখানে যায়, তখন মিসেস মার্শাল “পোর্ট আর লেমন” চেয়েছিল।”

“ওরে বাবা!”

“হ্যাঁ, ওরে বাবা। উনি ওঁর হাউসের হাত তুলে দরজা দেখিয়ে চিৎকার করেছিলেন, ‘বেরিয়ে যাও!’ এমনকি, ওঁর বার-এর ছেলেটা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেছিল।”

“ইটিকিট ইন্ সাফ্রিকা। এর জন্যে ওঁকে ক্ষমা করা যায়। এমনকি এও বলা যায় যে, এটা ওঁর অনুকূলে। কিন্তু তুমি বললে কেন, এটা আমার পক্ষে সহজ?”

“ও, ববি, এ ব্যাপারে মার্টিন-এর সঙ্গে আমি কতবার কথা বলেছি। মনে হয় যেন এর বাইরে আর কোনো কথা নেই। বিয়ের আগে যখন কুমারী মেয়ে ছিলাম আর সমারসেট মম গিলতাম আর এই মহান পৃথিবী সম্বন্ধে কত কিছু শিখতাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার বিবাহিত জীবনের একটা বিরাট অংশ আমাকে ‘চাকরির শর্তাবলী’ সম্বন্ধে দৃষ্টিশ্রুয় কাটাতে হবে।”

“ওগুণ্ডনা ওয়াঙ্গা-বুতেরে আমার উর্ধতন অফিসার,” ববি বলল, “ও হচ্ছে আমার ‘বস’। আমি ওকে সম্মান করি। এবং আমার বিশ্বাস, ও-ও আমাকে সম্মান করে।”

“দুঃখিত, কিন্তু তোমার মুখ থেকে যখন এই রকম ভাবে নামগুলো বেরিয়ে আসে, তখন শুনতে বেশ মজা লাগে।”

“আমার মনে হয়, ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রতিকূল মনোভাব থাকে, সেটা তাদের নিজেদেরই দোষ। রাষ্ট্রপতি প্রত্যেকদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর লোকদের বলছেন যে, তাঁর আমাদেরকে দরকার। কিন্তু তিনি তো বোকা নন। উনি জানেন যে, পুরোনো ঔপনিবেশিক কর্তব্যজিরিরা দক্ষিণে চলে যাবার আগে শেষ কপর্দক পর্যন্ত লুটে নিয়ে যেতে চায়। আমার হাসি পায়। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের কাছে ভাষণ দিই। কিন্তু যখন ওরা আমাদের দুর্নীতি ধরে ফেলে, তখন খুব মানসিক যন্ত্রণা হয় এবং ওদের পক্ষপাতদুষ্ট বলি। আর এটা খুব একটা কম নয়। আমরা ব্যাগেজ অ্যালাউন্স-এর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করি। যদিও সেই ব্যাগেজ কোথাও যায়নি।

“টাকাটা পেতে ভালোই লাগে,” লিভা বলল।

ও কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছে, ওর কৌতুকরস যেন হারিয়ে গেছে। ওর মাথার রুমালের নিচে পাতলা চুলের থেকে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে আসা হাড়-সর্বশ্ব কপাল এখন চক্চক্ করছে; ওর কালো চশমার ওপর দিকে চিন্তার ভাঁজ দেখা যাচ্ছে।

“বুসোগা কেসোরো আমার কাছে কাগজগুলো নিয়ে এসেছিল,” ববি বলল, “তারপর ও বলল ‘ববি,’ ডেনিস মার্শাল-এর এই ছবিটার পয়সা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, ওর শেষ ছুটিটায় ও কোনো মালপত্র নিয়ে কোথাও যায়নি। এখন কি করা যায়?” আমি আর কী বলব? আমি ভালো করেই জানি যে, কফি খেতে খেতে জোর গল্পো হবে যে, আমি ‘বিশ্বাসঘাতক’। কিন্তু কার প্রতি আমার আনুগত্য? আমি বি কে-কে বললাম, ‘আমার মনে হয় এটা মন্ত্রীর কাছে যাওয়া উচিত।’”

ও নিজের ভূমিকাটা একটু বাড়িয়ে বলল; ও বেশি কথা বলছে। ও বুঝতে পারল, লিভা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। ও হুইল-এর ওপর ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাসল, নিজের সীটে একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, “কফি খাবার জন্য কোথায় থামব?”

“হান্টিং লজ?”

ওর পছন্দ নয়, তবু বলল, “বুদ্ধিটা মন্দ নয়। শুনেছি ওটা এখন নতুন মালিকানায় এসেছে।” লিভা আনমনা ভাবেই বলল, “হ্যাঁ, সম্পত্তি-সংক্রান্ত ঝামেলার পর।”

“এসব ব্যাপারে এশিয়ানরা বেশ ভালোই কামিয়েছে।”

লিভা জবাব দিল না। ববিও চুপ করে গেল। ও বক্বক্ব বক্ব করে আগের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গম্ভীর ভাবমূর্তি আনতে চাইল। কিন্তু এখন লিভাই গম্ভীর হয়ে রয়েছে।

ঝোপ-ঝাড় ভর্তি সমতল ভূমির ওপর দিয়ে কালো রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। খানিকক্ষণ পরে ববি বলল, “আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলেছ। মেঘগুলো জমছে। এরকম সময়ে এগিয়ে যাব না পেছনে যাব, ঠিক করা মুশ্কিল।”

ও বনিবনা করে নিতে চাইছে। লিভা কোনো উৎসাহ দেখাল না। শক্ত গলায় বলল, “আমি এখন কফি চাই।”

ওরা রাস্তার দিকে তাকাল।

“আমি শুনেছি,” ববি বলল, “স্যামি কিষণেজী খুব একটা সোজা লোক নয়। কিন্তু এ-ও জানতাম না যে, মার্টিন এত অসুখী।”

লিভা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ববি একেবারে চুপ; সীটে হেলান দিল। লিভা মানসিক চাপটা বজায় রেখে, ববিকে একদম চুপ করিয়ে, অত্যন্ত আত্ম-সচেতন ভাবে ওর চুল আর রুমালটা, নতুন করে বাঁধল।

অনেক দূরে রাস্তার ওপর কিছু একটা চক্চক্ব করছে। মোটেই মরীচিকা নয়। ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দেখা গেল একটা গাড়ি চাপা-পরা কুকুরের মতদেহ।

“এটা দেখে ভালোই লাগছে,” লিভা বলল, “এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।” ওর গলার স্বর রহস্যময় হয়ে উঠল। “এই জিনিস সর্বদাই দেখা যায়।”

“তোমরা তাহলে চলে যাচ্ছ?”

“ও, ববি, তোমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার ডিপার্টমেন্টে কাজকর্ম হয় এবং সবসময়ই কিছু না কিছু করে দেখাতে পার। কিন্তু রেডিও হচ্ছে রেডিও। তাতে প্রোগ্রাম বানাতে হয়। আর তুমি যদি মার্টিন-এর মতো একজন পুরোনো রেডিও-র লোক হও, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জান যে, এই সব প্রোগ্রামে কত আজোবাজে জিনিস ঢোকানো হয়। কাজেই বি.বি.সি ছেড়ে এখানে আসার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ভালো কিছু করা। হয়তো একদিক থেকে এটা মার্টিনেরই দোষ। ও তো কখনোই চটপটে পি আর ও-টাইপ ছিল না।”

“তাই দেখছি। মানে, রেডিও-র ব্যাপারে। মনে হয় ওরা রাজনীতি এবং ভাষণ ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। এসবের ভালো মতো সম্পাদনা হওয়া দরকার।”

“যখন ভাবি, মার্টিন-কে বলা হয়েছিল আঞ্চলিক নির্দেশকের পদটা নিতে। কিন্তু ও বলেছিল, ‘না, এটা আফ্রিকান দেশ। এই পদটা স্যামি-র মতো লোকের জন্যে।’”

“শুনেছি, স্যামির নাকি ইংল্যান্ডে খারাপ কেটেছিল।”

“অবশ্য দুর্দশা কিছু হয়নি। বি বি সি-তে এখনও কিছু লোক আছে, যারা মার্টিনকে মনে রেখেছে। গতবছর আমরা যখন ছুটিতে ওখানে গিয়েছিলাম, ক্লাবে একজন মার্টিনকে বলেছিল, ‘তুমি তো ওখানে খুব উঁচু পদে আছ, তাই না?’”

“নিশ্চয়ই । কেউ এখানে এসে নিজের কর্মজীবন নষ্ট করতে চায় না । তাহলে তুমি কি ভাবছ, তোমরা ইংল্যান্ডে ফিরে যাবে?”

“ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে হবে? কিন্তু ইংল্যান্ড; জানি না । মার্টিন এখানে ওখানে খোঁজখবর করছে । কোথাও নিশ্চয়ই কিছু হবে ।”

“নিশ্চয়ই হবে ।” কিন্তু ববির প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না । ও বলল, “কোথায় হবে বলে মনে হয়?”

ও অপেক্ষা করতে লাগল ।

লিভা বলল, “দক্ষিণ ।”

ববি বলল, “আমার জীবন কাটবে এইখানেই ।”

BanglaBook.org

এই সমতল উপত্যকার শেষ প্রান্তের ঢাল পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে ঝোপঝাড় রাজত্ব করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে জমিটা এবড়ো-খেবড়ো আর বেশি সবুজ মনে হচ্ছে। শেষ ঢাল পর্যন্ত পুরো উপত্যকার দৃশ্যটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু এখন নিচু নিচু, ছড়ানো কিছু বিচ্ছিন্ন পাহাড় দেখা যাচ্ছে; দূরে কালো কালো গাছ জল এবং ঝর্ণার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে ওখানে টেউখেলানো মাঠ বলে দিচ্ছে, কিছুদিন আগেও এখানে জঙ্গল ছিল। মাটির রাস্তা এসে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে। রাস্তায় কিছু সাধারণ বোর্ড লাগানো আছে চোখে পড়ছে, যাতে বিশ, তিরিশ বা ষাট মাইল দূরের বিভিন্ন জায়গার নাম লেখা। কিছু ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-ও দেখা যাচ্ছে। যানবাহন চলাচল এখনও হালকা।

লিভা ওর রহস্যময় গলায় বলল, “ওটা আমার প্রিয় পাহাড়। দেখে মনে হয় যেন কোনো দৈত্যের হাত পাহাড়ের একটা পাশ ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত খাবলে নিয়েছে।”

বর্ণনাটা একদম সঠিক। পাহাড়টা দেখে ববিরও ঠিক এই কথাই মনে হয়। ও বলল, “ঠিক তাই।”

ওদের গাড়ির সামনে পাশের একটা রাস্তা থেকে একটা লম্বা ঢাকা ভ্যানগাড়ি হাইওয়েতে চলে এল। ভ্যানটার পেছনের তক্তার ওপর দিয়ে শিকারী কুকুরগুলো মাথা উঁচু করল। পেছনে বিশ্রিকম ঝাঁকানি খেতে খেতে দু'জন আফ্রিকান ঝুলছে, পরনে যোধপুরী, ঘোড়ায় চড়ার বুট জুতা, লাল টুপি আর জ্যাকেট।

“আফ্রিকার এ জায়গাটা কেমন অদ্ভুত,” লিভা বলল।

ও উঠে বসল, নিজের ব্যাগ থেকে জ্যানিটি কেসটা বার করল। তারপর মুখে মেক-আপ করতে লাগল। ওর ওই রহস্যময়ী ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। এখন ববি বরং বিষণ্ণ মুখ করে আছে।

“যখন আমরা পশ্চিম আফ্রিকায় কয়েক মাসের জন্য ছিলাম,” হাতের আয়নায় চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে আর মুখে পাউডার লাগাতে লাগাতে বলল, “তখন সেখানকার আফ্রিকানদের কিছুতেই বলা যেতনা যে, ওরা সামান্য হলেও ইংরেজ। কিন্তু সীমানা পার হয়ে ফরাসি অধিকৃত এলাকায় ঢুকলেই দেখা যেত আমাদেরই মতো, কালো লোকেরা রাস্তার পাশ বসে ফরাসি রুটি খাচ্ছে, লাল মদ পান করছে আর ছোট ছোট ফরাসি বেরে টুপি পরে আছে। আর এখানে এসে দ্যাখো, এরা সব কালো ইংরেজ সহিস।”

রাস্তাটা বাঁক নিচ্ছে, সামনে কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ওরা ভৌ ভৌ করা শিকারী কুকুরে ভর্তি ভ্যানটার পেছনেই রয়েছে। সহিসরা ওদের গাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। দৃষ্টি মোটেই বন্ধুত্বাপন্ন নয়। রাস্তার পাশে একটা লেখা দেখা গেল, হান্টিং লজ, দূরত্ব এক মাইল। “তাড়াতাড়ি করতে হবে” ববি বলল, “ওপরের মেঘগুলো যেভাবে জমছে, আমার সুবিধে মনে হচ্ছে না।”

“তোমাকে তো বলেই ছিলাম, এব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ।”

ওরা যে রাস্তায় বাঁক নিল, সেটা হাইওয়ের ধার থেকে সোজা নেমে গেছে। রাস্তাটা কাল্চে-লাল, সঙ্কীর্ণ, মাঝখান দিয়ে গভীর চাকার দাগ, দু’পাশে ঢেউখেলানো জমি। আগের দিন বা ঐদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ওদের গাড়ি রাস্তার চাকার দাগের ওপর দিয়ে পিছলাচ্ছে, স্টিয়ারিং হুইলটা ববির হাতের মধ্যে লাফাচ্ছে।

“এখনও শুকোয়নি,” ববি বলল, “মনে হচ্ছে, ভারী বৃষ্টি হয়েছিল।”

“আবার শিগ্গিরই বৃষ্টি হবে,” লিভা বলল। কিন্তু ওর কোনো দৃষ্টিস্তা আছে বলে মনে হল না।

লাল রাস্তাটা আবার বাঁক নিয়ে দু’দিকের ঢালু জমির মাঝখানে একটা চ্যাটালো জমির ওপর দিয়ে চলে গেছে। ববি আর লিভা এখন সবুজের মধ্যে ডুবে আছে; হাইওয়েটা আর দেখা যাচ্ছে না। ওদের সামনে, কিছু দূরে গাছের সারি, কিছু গাছ সাদা, কিছু পাতা-ঝরা, একটা ঝরনার ধারা নির্দেশ করছে। ওই জায়গাটা পার হয়ে রাস্তাটা আবার ওপরে উঠে গেছে, উদ্যান ভূমি।

“ইংল্যান্ডের মতো,” লিভা বলল।

“অথবা, আফ্রিকাও বলা যায়।”

একটা বাঁক নেওয়ার পর বাঁ দিকের জমিটায় আর দৃষ্টি নেই, একেবারে সমতল, খালি ছড়ানো-ছিটানো ঘাসের গুচ্ছ আর নলখাগড়া জমির ওপর ঠেলে উঠেছে, যেন জলাভূমি। ওই সমতল জমিটার একপ্রান্তে একটা পরিত্যক্ত কাঠের কুটির, ছাদটা খানিকটা ভেঙে পড়েছে।

“পোলো,” লিভা বলল।

“মার্টিন খেলে নাকি?”

ওরা গাড়ি চালিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধ্বংসাবশেষটা নিচে থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখল। পেছনের দেওয়ালটার ওপর দিকটায় ভাঙা তক্তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে, নিচের দিকে সিঁড়ির কাছটাতেও তক্তাগুলো ভাঙা, খুলে পড়ে গেছে, ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছে, পুরো কুটিরটা সবুজের পটভূমিতে একটা কাল্চে-ধূসর ছবির মতো লাগছে। এটা স্থায়ী ভাবে বানানো হয়নি। এটা এমন একটা কাঠামো, যেগুলো সৈন্যবাহিনীর লোকেরা বানায় এবং পরে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

“তোমার কি মনে হয় ওই শিকারী কুকুরগুলো সময় হলে বাড়ি ফিরে যাবে?” লিভা বলল, “নাকি ছাড়া পেলে বুনো হয়ে যাবে?”

লাল রাস্তাটা গাছের সারির পাশ দিয়ে চলে গেছে। কয়েকটা গাছ, যেগুলো ঝরনার ধারে গজিয়েছিল, মরে গেছে, ওদের শেকড়গুলো জলে ডুবে আছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঝরঝর শব্দে গর্জন করে জল বয়ে চলেছে। গাড়ির শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝরনাটাও চোখে পড়ছে, কূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে, কর্দমাক্ত জল।

“উরিববাস,” ববি বলল, “মনে হচ্ছে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল।”

রাস্তাটা আবার বাঁক নিল, তারপর ঐকে বেঁকে ওপরে উঠতে লাগল। এখানে ভাঙা পাথরের টুকরো রাস্তায় পিটিয়ে পিটিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছিল আর বৃষ্টির তোড়ে যেখানে যেখানে মাটি ধুয়ে গেছে, সেখানে পাথরের কোনা-খোঁচা বেরিয়ে আছে। গাড়ি বাঁকানি খাচ্ছে, কিন্তু পিছলাচ্ছে না। পাহাড়টা আস্তে আস্তে সমতল হয়ে গেল, চারদিক খোলামেলা হয়ে গেল; আর ওরা হান্টিং লজে পৌঁছে গেল। একটা আলাদা, ছোট, অফিসের ছাউনি, একটা মেকি রাজপ্রাসাদের মতো হলঘর, দু’সারি কুটির, প্রায় মাটির সঙ্গে সমতল, টালির ছাদ আর চিম্নি লাগানো, বৃষ্টিতে হেলে-পড়া ফুলের ঝাড়-এর ওপরে বাস্তু জানালা। একটা সাদা ভক্সওয়াগন গাড়ি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে, ভিজে বালির ওপর ওটার টাটকা চাকার দাগ স্পষ্ট। ববি চিনতে পারল এটা সেই ভক্সওয়াগন গাড়িটা যেটা ওদের পার হয়ে গিয়েছিল, যখন ওরা উপত্যকার দৃশ্যটা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটার ড্রাইভার যে হর্ণ বাজিয়েছিল, একজন বেঁটেখাটো শক্ত চেহারার চল্লিশ-বছর বয়সি লোক, চোখে কালো চশমা, খাকি ফুলপ্যান্ট আর একটা চলতি স্পোর্টস সার্ট পরা, দাঁড়িয়েছিল।

ববি বুঝতে পারছে ওর পাশে দাঁড়ানো লিভা একেবারে ভীষণ, তৎপর, প্রস্তুত, আর ভাবল, কি করে আমি ভুলে গেলাম। তাছাড়া ও আরো ভাবল কিভাবে ও নিজেকে সোজাসুজি হান্টিং লজে আসতে দিল। ও সিদ্ধান্ত নিল নিজেকে কঠিন রাখতে হবে।

ভুরু কুঁচকে ও গাড়ি পার্ক করল।

“কফির জন্য বড় দেরি হয়ে গেছে।” ভক্সওয়াগনের লোকটি বলল। ও আমেরিকান, মাঝামাঝি উচ্চারণ ভঙ্গী।

“কিন্তু লাঞ্ছের জন্য বোধহয় ঠিক সময়,” লিভা বলল।

ববি ভুরু কুঁচকে গাড়ি পার্ক করায় মনোযোগী ছিল, ও আপত্তি জানানোর সুযোগ পেল না।

“ববি, “লিভা বলল, “তুমি কি কার্টারকে চেন?”

ববি, গাড়ির দরজা লক করতে করতে কোনোরকমে তাকালো, “মনে হয়, না।”

“বেশ। ববি, কার্টার।”

“তুমি কি সুন্দর জামাটা পরে আছ ববি,” কার্টার ওর কালো চশমা খুলে, হাত বাড়িয়ে বলল।

ববি বুঝতে পারল, লিভা এর মধ্যেই কার্টারের কাছে ববির কথা বলে দিয়েছে।

“এরা বারোটোর সময় লাঞ্চ দেওয়া শুরু করে,” কার্টার বলল, “কিন্তু আমাদের এখনই অর্ডার দিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ, জায়গাটায় লোকজন নেই। তাহলে লাঞ্চ, কি বল? আমি এখুনি গিয়ে বলে আসছি।”

“আমি যাচ্ছি,” ববি বলল। ও হলের দিকে হাঁটতে লাগল।

“অফিস ঘরে, ববি, “কার্টার বলল,” ভদ্রমহিলা অফিস ঘরে রয়েছেন।”

ববি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল, ভাবখানা এমন যে, ও জানে, কিন্তু ভুলে গেছিল। তারপরেই ও ভাবল, হাসাটা বোকামি হয়ে গেছে; এবং তাই গম্ভীরভাবে, বাঁ হাতটা শক্ত করে ওর নরম মুখটা কঠিন করে, শূন্য দৃষ্টিতে, দেশি জামাটা দোলাতে দোলাতে, প্রাঙ্গণ পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোট অফিসের চালাটার নিচে ঢুকে গেল।

ইংরেজদের স্টাইলে চুল আঁচড়ানো রাষ্ট্রপতির নতুন ফটোটোর নিচে একজন মধ্যবয়সি সাদা-চামড়ার মহিলা একটা ছোট তাকের ওপর বাঁ হাতে কিছু লিখছিল। ওর ডান হাতটা প্লাস্টার করা, একটুকরো কাপড় বেঁধে ঝোলানো। ববি ঢুকতে মহিলা চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু তারপর আবার লেখা চালিয়ে যেতে লাগল। অন্য কোনো দেশে হলে, এব্যাপারটা তেমন চোখে পড়ত না, কিন্তু এখানে এই জিনিসটা অস্বাভাবিক। অফিসের একটা কোণায়, দরজা থেকে আসা আলোর বাইরে, একজন আফ্রিকানকে ববি দেখতে পেল। আফ্রিকানটা হাসছে। এই আফ্রিকানটার পোশাক ওই সব মজুরদের মতোই ছিল, যাদের ববির সকালে লরীতে তুলতে দেখেছিল। তবে এর পোশাকটা বেশি ব্যক্তিগত আর কম ফেলে-দেওয়া মনে হচ্ছিল। ওর ডোরাকাটা বাদামি জ্যাকেটটার নানা জায়গায় দাগলাগা আর জ্যাকেটটার চওড়া কলারের ফোলাফোলা কোণাগুলো বেঁকে আছে, কিন্তু জ্যাকেটটা ওর গায়ে বেশ ফিট করেছে। ওর গায়ের সোয়েটারটা কর্কশ, ছোট ছোট ময়লার দাগ, সেটাও ওর গায়ে বেশ ফিট করেছে। আর ওর সার্টটা, যার কলারটা তেলতেলে আর কালো হয়ে গেছে, দু'তিন জায়গায় পুরোনো শুকিয়ে-যাওয়া ঘামের দাগ, ওটা যেন ওর গায়ের দ্বিতীয় চামড়া। ওরা যখন গাড়ি থেকে দেখেছিল তখন রাস্তার সেই মজুরগুলো ছিল অভিব্যক্তিহীন, ওদের নিচে নামানো টুপিগুলোর নিচে ওদের ভাব-লেশহীন কালো মুখগুলো ছায়াচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু অফিসের এই আফ্রিকানটা তার গোল-মাথাওয়ালা টুপিটা হাতে নিয়েছিল আর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ওর মুখটা ফটোতে দেখা রাষ্ট্রপতির মুখের মতোই একটা সাধারণ মুখ, মুখে অভিজ্ঞতার চাইতে বয়সের ছাপটাই বেশি বোঝা যাচ্ছে। খালি ওর চোখ দুটো জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল।

চোখ দুটো এখন হাসছে, কাউন্টারে লিখন-রত মহিলার দিক থেকে ববির দিকে ঘুরেছে। যখন ববি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, আফ্রিকানটা সাড়া দিল না। ওর হাসিটা যেন স্থির। মহিলা চোখ তুলে চাইল।

“তিনজনের জন্যে লাঞ্চ পেতে পারি কি?”

“আমরা বারোটায় শুরু করি।”

তারপরেই, যেন ববির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাবে না, এরকমভাবে মহিলা আবার তার লেখায় ফিরে গেল, আফ্রিকানটা তাকিয়েই রইল।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর ববি, লিভা এবং কার্টার, কাউকেই দেখতে পেল না। কটেজগুলোর আর নুয়ে-পড়া ফুলগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া নুড়ি-ফেলা রাস্তাটা ধরে ও হেঁটে গেল। কটেজগুলোর প্রত্যেকটার দরজার বাইরে চ্যালা-করা ইউক্যালিপ্টাস কাঠের ছোট ছোট স্তূপ রয়েছে, বৃষ্টির জলে ভেজা। একটা বুড়ো ধূসর-কালো স্প্যানিয়েল কুকুর একটা কাঠের স্তূপ জোরে জোরে শূঁকছে আর কামড়ানোর চেষ্টা করছে। কটেজগুলোর পর ওই খোলা ঢেউ-খেলানো জমিটা, যেটা কিছুদিন আগেও জঙ্গল ছিল, ধীরে ধীরে নিচে নেমে গিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে থাকা বনভূমির মধ্যে মিশে গেছে। সেইখানে ঝরনাটা গর্জন করে ছুটছে, ওর দুপাশে সেই সব গাছগুলোর সাদা ডালগুলো পড়ে আছে, যে গাছগুলোর শেকড় ওর জলের তলায় ডুবে রয়েছে।

এটা একটা বনের ঝরনা, ভাঙা, উপড়ে পড়া গাছপালার ধ্বংসাবশেষ বয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ববি ঝরনাটার উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেখল, দুরন্ত স্রোতের লাল জলের নিচে চ্যাটালো পাথর আর বড় বড় গোল শিলাখন্ড ফেলা আছে; ঝরনাটা পার হবার সময় পা রাখার জন্য। মনে হয়, একটা সাজানো বাগানে, নরম ঋতুতে, হেঁটে হেঁটে ঝরনা পার হবার রোমাঞ্চকর স্বাদ দেওয়ার জন্য। আরও একটু ওপর দিকে জলের ধারা আটকানোর জন্য একটা ইটের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। ঝরনাটা বহুদিন আগেই এই প্রাচীর তোড়ে দিয়েছে আর এখন বন্যার মতো জলের তোড়ে একদা সাজানো বাগানের মধ্যে দিয়ে নতুন করে পথ করে নিয়েছে; যে লিলি ফুলগুলো এখন বুনো হয়ে গেছে, সেগুলোকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া সূর্যালোক কিছু কিছু সাদা লিলিফুলের ওপর পড়েছে আর সেগুলোকে জলের তোড়ে শুয়ে পড়া জলজ আগাছাগুলোর পটভূমিতে রঙিন করে তুলেছে। জল এখানে শান্ত, নিঃশব্দ, কোনো কোনো জায়গায় বন্ধ জলাশয় তৈরি হয়েছে।

হঠাৎ লিলিফুলগুলো তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলল; গাছগুলোর তলায় অন্ধকার হয়ে এল, জলাভূমি বাগানটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঝরনা বয়ে চলেছে। ঝরনার ওপারে গাছের গুঁড়িগুলো অস্পষ্ট অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে; ডাল-পাতাগুলো ঝুলে আছে। মনে হচ্ছে একটা রূপকথার পরীর গল্পের বন, বাড়ি থেকে বহুদূরে কিছুদিন আগেও যেটা মানুষের তৈরি ছিল, বন কেটে, বনের মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে তৈরি করা, যেটা একটা প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের শৈল্পিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা ছিল, সেটা আবার তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রূপে ফিরে এসেছে। যেন নিঃশব্দে বলছে এখানে এখন আর মানুষ থাকে না, সাবধান, বিপদ। ববি রাজার কথা ভাবল, আকাশ থেকে তাড়া করছে। ও ওপরে তাকাল। বৃষ্টির মেঘ জড়ো হয়েছে; সামনে রাস্তাটা একশ' মাইল চলে গেছে, কাঁচা রাস্তা, পিচ-ঢালা নয়।

বন থেকে বেরিয়ে ও বাইরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারপর পাহাড়ের উঁচুর দিকে হাঁটতে লাগল। স্প্যানিয়েলটা এখনও চ্যালাকাঠের স্তূপটার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। স্তূপটা খানিকটা ভেঙে ফেলেছে। মুখে হাসি নিয়ে আফ্রিকানটা অফিসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, টুপিটা এখনও ওর হাতে। ববি আফ্রিকানটার চাহনি ফিরিয়ে দিল, হলের ভেতর এসে লাউঞ্জ লেখা ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়ল।

মস্ত চওড়া ঘরটা, ছোট ছোট কাঁচ-দেওয়া জানালা, ছিটকাপড়ের পর্দা, বনভূমির দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দূরের পাহাড়গুলো, মাঝে মাঝে পাইনগাছের খণ্ড খণ্ড জঙ্গল। বৃষ্টির মেঘের খেলা, সব দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে, ব্যবহৃত হয়, তবে হালে ব্যবহার হয়নি। ইংল্যান্ডের দুটো দৃশ্যের রঙিন ছবির মাঝখানে রাষ্ট্রপতির সেই নতুন ফটোগ্রাফ, জঙ্গলের মানুষটি ইংরেজ স্টাইলে চুল আঁচড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু পুরোনো পত্রিকা রয়েছে ঘরে, পার্টির ফটো, নাচের, শহরতলির বাড়ির, আসবাবের ছবি। ইংল্যান্ডের এমন একটা ছবি, যা রঙানি করা যায়। খুব যত্নের সঙ্গে ফটোগুলো তোলা হয়েছে, যা কিছু দৃষ্টিকটু, সেগুলো সমত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে। ববি নিজে যে ইংল্যান্ডের শহরতলীকে জানে, সেটা হল ক্রমশঃ ছড়িয়ে যাওয়া আধা শিল্পনগরী, তার বিকাশশীল বাড়ি ঘর নিয়ে, তাঁবুর শহর, ব্যস্ত বড় রাস্তার ওপর হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বাড়ি, রেল লাইন, কারখানার ঘরবাড়ি; যেখানে প্রকৃতির অবশেষ পড়ে আছে— হয়তো একটা ছোট নদী পাশে মাথা-কাটা উইলো গাছের সারি— যেটা দেখে ওই আধা-শহরে পড়িত্ত জমির মতো মনে হয়। কিন্তু যে ঘরটায় ববি রয়েছে সেটা ওই পত্রিকার ছবিগুলোরই প্রতিচ্ছবি। তবে মাপটা ববির পক্ষে, ছোট অফিস-ঘরের আদৃত্ত মহিলাটির পক্ষে, বেশ বড়, হয়তো বরাবরই এটা এইরকম বেশ বড় ছিল।

একজন কেউ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলল, “তিনটে লাঞ্চ, তাই না?”

এই চিৎকারটা আসলে একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ ফিস্ফিসানি, একজন মধ্যবয়সি সাদা-চামড়ার লোকের গলা থেকে বেরিয়েছে। লোকটির একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত চেহারা। একটা পা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যাভেজ ও প্লাষ্টার করা, একটা হাতও তাই। কোনোরকমে ধাতুর ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছে, মুখ খুবড়ে পড়ে যাবে। “মোটর দুর্ঘটনা,” লোকটা ফিস্ফিস করে বলল, খানিকটা গর্বের সঙ্গে, লোকে বলে, একজায়গায় দু’বার বাজ পড়ে না— ও মাথা নাড়ল, “আমার স্ত্রীকে দেখলে?”

“অফিসে?”

“ও-রও একই হাল।” ও একজন কমেডিয়ান এর মতো বেঁকে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল, “হ্যাঁ, এখন সব ঠিক আছে। শুধু চুলকানি। প্লাষ্টার-এর এই একটা মজার ব্যাপার। জান, শেষকালে যখন ওটা খোলা হয়, তখনও দেখা যায়, মাঝখানে

খানিকটা জায়গা ভিজে আছে। দক্ষিণে যাচ্ছ? ওখানে কাজ কর? স্বল্প-মেয়াদি চুক্তি?”

ববি ঘাড় নাড়ল।

“তোমরা ভাগ্যবান। প্রতি মাসে লন্ডনের ব্যাঙ্কে মাইনের অর্ধেক পাঠাচ্ছ, তাই-না? টাকাটা জমাচ্ছ। কিন্তু জেলাশাসকের অফিসে অবস্থা এখন খারাপ। মনে হয়, শিগ্গিরই প্রচণ্ড ঝামেলা শুরু হবে।”

“জানি না, ঝামেলা বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ,” ববি বলল।

আহত লোকটা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল। “এখানে কোনো ঝামেলা নেই।” ও রাষ্ট্রপতির ফটোটোর দিকে ঘাড় নাড়ল। “রোজা ঠিক আছে। না, এখানে ঝামেলা নেই। পর্যটন একটা বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে। আর আফ্রিকানরা জানে যে, ওরা একা এটা সামলাতে পারবে না। যাই বল না কেন, আফ্রিকানরা বোকা নয়।”

ববি ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রেখে হাঁটতে শুরু করল। ও তাড়াহুড়ো করল না, কোনো প্রয়োজন নেই বলে। আহত লোকটা ওর পেছনে আসা শুরু করল, কিন্তু ওকে ধরতে পারল না।

এখনও আফ্রিকানটা অফিসের বাইরেই রয়েছে। স্প্যানিয়েল বুড়োটা, শূন্যচোখে অফিসের সিঁড়িতে বসে রয়েছে। কটেজের দরজার বাইরের কাঠের স্তূপটা পুরো ছড়িয়ে ফেলেছে। ওটার কাছাকাছি গিয়ে ববি দেখল, একটা পুরোনো ফুলের ঝাড়, ল্যাভেণ্ডার ফুটে রয়েছে। ও নিচু হয়ে কয়েকটা মঞ্জরী তুলতে গিয়ে দেখল, ছড়ানো কাঠগুলোর তলায় একটা টিকটিকির ল্যাজ, আলাদা হয়ে পড়ে আছে, মরা। তারপরই ও লিভা আর কার্টারকে দেখতে পেল। লিভা হাত নাড়ল। অঙ্গভঙ্গীটা বেশ বড়ই; দূর থেকে নুড়ি-ফেলা রাস্তার আর খোলা পাহাড়ী এলাকার অস্থির আলোর পটভূমিতে লিভার নীল প্যান্ট আর ক্রীম-রঙা সার্ট একেবারে স্পষ্ট ছবির মতো দেখাচ্ছিল। এবং আবার, দিনের শুরুতে যেমন হয়েছিল, তেমনি ওরা তিনজনেই যেন কল্পিত দর্শকদের সামনে একটা ফিল্ম বা নাটকের মধ্যে রয়েছে, তেমনি মনে হল। ববি ঘুরল: আফ্রিকানটার চাহনি আর জিভ দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা চাটা।

লিভা বলল, “ববি, তোমার হাতে কী?”

“ল্যাভেণ্ডার।” ববি ওর নাকের নিচে একটা ফুলের মঞ্জরী ধরল। “আমি ল্যাভেণ্ডার ভালোবাসি। এটা কি মেয়েলি?”

লিভা হাসল। এই প্রথম ববি ওর খারাপ দাঁতগুলো দেখতে পেল। “আমি মেয়েলি বলব না। আমি বলব, পুরোনো ধরণ।”

ওরা তিনজন যখন উঁচু কাঠের ছাদ-ওয়ালা খাবার ঘরে ঢুকল, তখন ওদের মধ্যে লিভাকেই সবেচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

জনশূন্য ঘরটার একধারে উঁচু আগুন জ্বালানোর জায়গাটার পাশে ওরা বসল। জায়গাটায় কাঠ সাজানো আছে। কিন্তু জ্বলছে না। পরিবেশনকারী ছেলেটাকে নার্সাস আর আনমনা মনে হচ্ছিল। ও বার বার টেবিলের ওপর কাঁটা-চামচ সাজাচ্ছিল, নাড়াচাড়া করছিল। ওর সাদা সার্টটা সামান্য অপরিষ্কার, ময়লা কালো বো-টাইটা বেঁকে আছে।

কার্টার বলল, “তোমরা ঔপনিবেশিকরা বেশ ভালোই আছ।”

“কি চমৎকার একটা শব্দ,” লিভা বলল, “কথাবার্তার মধ্যে আজকাল এই শব্দটা প্রায় শোনাই যায় না। আর তুমি কথাটা এমনভাবে বললে, শব্দটা বেশ বড় আর প্রায়োগিক শোনালো।”

“এখানে বসে আমার মনে হয়, ওরা নিশ্চয়ই খুব উঁচু দরের লোক। বলতে গেলে, দানব। হয়ত সেইজন্যেই ওরা আগুনটা জ্বালায়নি। আমরা খুব নিচু শ্রেণীর লোক।”

অথবা, খুব কুৎসিৎ, ববি ভাবল, ওর রোলটা হাত দিয়ে ভাঙল। ভীত ছেলেটা এক পেট এক পেট করে স্যুপটা আনছিল, পেটের ধারটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে। ও একটু ঝুঁকে হাঁটছিল, হাঁটু উপরে তুলে তুলে; ওর বড় বড় পা দুটো গোড়ালির কাছে যেন আলগা, থপথপ করে উঠছিল, পড়ছিল।

“ওকে দেখে আমাদের একজনের মতোই মনে হচ্ছে,” কার্টার বলল।

“ববি, কার্টার বলছে সাদার্ন কালেক্টরেটে চারটে থেকে কারফিউ। মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী ছোটোছুটি করছে।”

“আফ্রিকান সেনাবাহিনী তো এইজন্যেই আছে,” কার্টার বলল, “ওরা শুধু অসামরিক কাজের জন্যেই আছে।”

“মনে হচ্ছে, রাতটা আমাদের কর্নেল-এর ওখানেই কাটাতে হবে,” লিভা বলল, “অথবা এখানে থাকতে হবে।”

“ছেলেটা তোমার জন্যে আগুন জ্বালানোর পরে,” কার্টার ববিকে বলল।

কার্টারের কষের দাঁতে কিছু গগগোল আছে, কারণ পেটের ওপর মাথা নামিয়ে কুকুরের মতো খাচ্ছিল। প্রত্যেকবার চিবোনের সময় মুখের মধ্যে খাবারটা আটকে রাখছিল, একই সঙ্গে অল্প হিস্ শব্দ করছিল যেন প্রত্যেকটি গ্রাস খুব গরম। এক গ্রাস খেয়ে ও আবার কথা শুরু করল, বলল “এই ‘বয়’ শব্দটা আমার শুনতে ভালো লাগে না।”

“ডরিস মার্শাল নিজেরটাকে বাটলার বলার চেষ্টা করেছিল,” লিভা বলল।

“বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার, তাই না?”

“অবশ্য শেষ পর্যন্ত ও স্টুয়ার্ড কথাটা ঠিক করেছিল। আমার কাছে কথাটা এত হাস্যকর মনে হয়,” লিভা বলল।

ববি বলল, “লিউক্-এর এটা খুব গায়ে লেগেছিল। ও পরে আমাকে বলেছিল, ‘আমি স্টুয়ার্ড নই স্যার, আমি একজন হাউসবয়’।”

“ডরিস মার্শাল কে?” কার্টার জিজ্ঞেস করল।

“ও একজন দক্ষিণ আফ্রিকান,” লিভা বলল।

কার্টারকে দেখে মনে হল ও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

“লিউক হচ্ছে ববির হাউসবয়,” লিভা বলল।

“আমার মনে হয়,” ববি লিভার দিকে তাকিয়ে বলল, “ডরিস ভাবছিল ও বুঝি ওদের জন্য বেশি বেশি করেছে।”

লিভা চৈঁচাল, “ববি!”

“আমরা আমার প্রিয় বিষয়ে এসে গেছি,” কার্টার বলল, “চাকর-বাকর।”

ববি বলল, “এই ব্যাপারটা সবসময় আমাদের অতিথিদের আকর্ষণ করে।”

কার্টার খেতে লাগল।

“আমি পারি না,” খাবার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে, আরও একবার দর্শনার্থীর ভূমিকায় নেমে কার্টার পরে বলল, “এই জায়গার ইংরেজিয়ানা দারুণ চোখে পড়ে।” “আমি যখন পশ্চিম আফ্রিকায় ছিলাম,” লিভা বলল, “সবাই সব সময় বলত, আমরা কীরকম খারাপ ঔপনিবেশিক আর ফরাসিরা কত ভালো। আর সীমানা পার হলেই, কথাটা সত্যি মনে হত। দেখা যেত, আমাদের এখানকার মতো সব কালো লোকেরা রাস্তার ধারে বসে ফরাসি রুটি আর লাল মদ খাচ্ছে আর ওইসব হাস্যকর ছোট ফরাসি বেরে টুপি গুলো মাথায় পরে আছে।”

“তাহলে অন্তত,” ববি বলল, “এখানে আমাদের কথা শুনতে হবে না।”

কার্টার ববির দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি আক্রমণ করল, “তুমি তো বেশ ভালোই আছ।” বৃষ্টি শুরু হল। খাবার ঘরটা অন্ধকার হয়ে এল। হাদের ওপর বৃষ্টির রিমঝিম। “ওই কর্দমাক্ত জায়গাটা,” লিভা বলল, “কাদার ওপর গাড়ি পিছলালে আমার হিস্টিরিয়া হয়ে যায়।”

“কারফিউ-এর ব্যাপারটা সত্যি কিনা ভাবছি,” ববি বলল।

“আমার কথা তোমার না শুনলেও চলবে,” কার্টার বলল।

“কোনো কিছুই জেনেই আমার তোমার কথা শোনার দরকার নেই।”

লিভা মনে হল যেন কিছু খেয়ালই করছে না। “বেচারা রাজা” ও বলল, একটু মেয়েলি ঢং-এ, যেন কষ্ট হচ্ছে, “বেচারা আফ্রিকান রাজা।”

এরপরে আর কথাবার্তা চলল না। ওরা অস্ট্রেলিয়ান রিয়েসলিং মদের বোতলটা শেষ করল এবং তারপর ওদের লাঞ্চ শেষ করল। ছেলেটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ছেলেটা বিল আনার সঙ্গে সঙ্গেই ববি ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। কার্টার বিমর্ষ হয়ে গেল।

“অফিস,” ছেলেটা বলল, “অফিসকে টাকাটা দেবেন।”

আফ্রিকান্টা তখনও ওখানে রয়েছে। ঘরের বাইরে সঙ্কীর্ণ ছাঁচটার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টিতে দূরের পাহাড় ঝাপসা দেখাচ্ছে। কটেজগুলোর টালির ছাদের ওপর থেকে নিচে ফুলগুলোর ওপর জল ঝরে পড়ছে, নুড়ি-বিছানো রাস্তা

টা ধুয়ে দিচ্ছে। আবহাওয়াটা প্রায় কনকনে হয়ে উঠেছে। ববি ফিরে এসে দেখল, খাবার ঘরে কার্টার একা। ওরা কথা বলল না। কার্টার ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে বৃষ্টি দেখতে লাগল। লিভা যখন ফিরে এল তখনও সে আগের মতোই উজ্জ্বল।

যাবার সময় হল। ববি তাড়াহুড়ো করতে শুরু করল।

“আমি এখন এখানে থাকব,” কার্টার বলল।

“পরে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?” ববি জিজ্ঞাসা করল।

“ব্যাপারটা খোলাই থাক,” কার্টার বলল।

ববি বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গেল আর গাড়িটা চালিয়ে হলের প্রবেশ পথে নিয়ে এল। লিভা গাড়িতে উঠে বসল। কার্টার-এর পেছনে ছায়াঙ্ককারে কিছু নড়াচড়া হল, আর সেই আহত লোকটি, সামনে ঝুঁকে, যেন অতিরিক্ত আগ্রহ নিয়ে, এসে দাঁড়াল। ববি গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে দেখল, হাত-পাষ্টার করা মহিলাটি অফিস-ঘরের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। ও নিজের অক্ষত হাতটা দিয়ে আফ্রিকান লোকটার দিকে দেখিয়ে কিছু ভঙ্গী করল, বৃষ্টির মধ্যে চিৎকার করে কিছু বলল।

ববি গাড়ি থামিয়ে জানালার কাচটা নামাল।

“তুমি গাড়িটা চালিয়ে ওকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবে?”

“হায় ঈশ্বর,” লিভা নিজের জিনিসপত্রগুলো সরানোর জন্যে সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আফ্রিকানটি নিজেই দরজা খুলল। ওর গায়ের গন্ধে গাড়ির ভেতরটা ভরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে, জানালাগুলো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, ববি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল, লিভা শক্ত হয়ে বসে আছে, ববি গাড়ির সামনের কাচটা হাতের পেছন দিক দিয়ে মুছেছে। যখন ববি পেছন-দেখার আয়নাটাতে চোখ রাখল, আফ্রিকানের দুটো হাসি-হাসি চোখ ওর চোখে পড়ল।

“তুমি এখানে কাজ কর?” ববি জিজ্ঞেস করল, যে ভাবে ও দেশি আফ্রিকানদের সঙ্গে কথা বলে, সেইরকম চটপটে, বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে।

“খানিকটা তাই।”

“কী কর? তোমার কাজটা কী?”

“এন্যানিস্ট।”

“ওঃ, তুমি বলতে চাইছ ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। তুমি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ কর। তুমি নিয়োগকর্তার সঙ্গে দরাদরি কর। তুমি তোমার সভ্যদের বেশি টাকা, ভালো কাজের শর্ত পাইয়ে দাও। ঠিক কিনা?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, এন্যানিস্ট। তুমি কী কর?”

“আমি এখানে কাজ করি।”

“আমি তো তোমাকে দেখিনি।”

“আমি দক্ষিণে কাজ করি, সাদার্ন কালেক্টরেটে।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, দক্ষিণে।” আফ্রিকানটা হাসল।

“আমি একজন সরকারি কর্মচারী। একজন আমলা। আমার টেবিলে চিঠিপত্রের ইন্-ট্রে, আউট-ট্রে থাকে। আবার আমার চা-এর ট্রেও থাকে।”

“সরকারি কর্মচারী? ভালো, ভালো।”

“আমার এটা ভালো লাগে।”

ওরা পাথুরে ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল, বৃষ্টি সামনের কাচের ওপর পড়ছে, ওয়াইপার দুটো তাড়াতাড়ি মুছতে পারছে না। ঢালের নিচের দিকে একজন আফ্রিকান বাঁকের মুখে রাস্তায় এসে পড়ল। হান্টিং লজের দিকে হেঁটে যাচ্ছে ও। গাড়িটা দেখে ও রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িটাকে রাস্তা ছড়ে দেবার জন্যে। ওর টুপিটা মুখ ঢেকে নিচে নামানো আর জ্যাকেটের ফলারটা তোলা।

“ও তো পুরো ভিজে যাচ্ছে,” ববি বলল, ওর কণ্ঠস্বর তখনও বন্ধুত্বপূর্ণ।

“সে তো দেখাই যাচ্ছে,” লিভা বলল।

“গাড়ি থামাও,” গাড়ির আফ্রিকানটা ববিকে বলল।

ববি আয়নায় তাকিয়ে আফ্রিকানের চোখে চোখ রাখল।

“গাড়ি থামাও” আফ্রিকানটা আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, “ওকে গাড়িতে তোল।”

“কিস্তি ও তো আমরা যেকোনো যাক্ষি, সেদিকে যাচ্ছে না,” ববি বলল।

“তুমি গাড়ি থামাও। ও আমার বন্ধু।” ববি আফ্রিকানটার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। আফ্রিকানটার টুপির ধার বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে; ওর মুখ একটুও দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির মধ্যেই ও টুপিটা খুলল; ওকে খুব আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল। গাড়ির ভেতরের আফ্রিকান দরজা খুলে দিল। জ্যাকেট ভেতরে ঢুকল। ও ববিকে স্যার বলে সম্বোধন করে প্লাস্টিক ঢাকা দেয়াল সীটের একপ্রান্তে বসল, যখন প্রথম আফ্রিকানটা ওকে টেনে ভেতরে ঢোকাল।

দু’জন আফ্রিকান বসাতে, গাড়িটা ভীড়-ভীড় মনে হচ্ছিল। লিভা ওর দিকের জানালার কাচটা নামিয়ে দিল আর জোরে শ্বাস নিল। বৃষ্টির ধারা ওর মাথার ফ্রন্টটাকে ভিজিয়ে দিল। সমতল পোলো-খেলার মাঠটা এখন জলে ভেজা আর জমা জলের মধ্যে থেকে মাথা-তোলা শরগাছ এবং ঘাস, জমিটাকে জলাভূমি বানিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টিতে ভেঙে-পড়া ছাউনিটা কালো দেখাচ্ছে।

“তোমার বন্ধুও কি ইউনিয়নিস্ট?” ববি জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ,” প্রথম আফ্রিকানটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “এন্যানিস্ট।”

“আশা করি, এই রকম আবহাওয়ায় তোমরা বেশিদূর যাবে না,” ববি বলল।

“বেশি দূর নয়,” প্রথম আফ্রিকানটা বলল।

রাস্তায় গাড়ির চাকার গভীর খাদে লাল বুদবুদ ওঠা জল-জমা গর্তের মধ্যে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে চাকা পিছলাচ্ছে। রাস্তাটা ধীরে ধীরে হাইওয়ের ডাঁ পাড়ের দিকে উঠে গেছে।

“তুমি গাড়িটা ডান দিকে ঘোরাও,” আফ্রিকানটা বলল।

“আমরা তো বাঁদিকে যাব,” ববি বলল, “আমরা কালেক্টরেটে যাচ্ছি।”

“ডান দিকে চল।”

ওরা ততক্ষণে যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে লাল মাটির রাস্তাটায় বালি আর পাথর আর রাস্তাটা খাড়া উঁচুতে হাইওয়েতে ওঠার মুখে চওড়া হয়ে গেছে। আফ্রিকানট তখনও পেছনে দেখার আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

“তোমরা যেখানে যেতে চাও, সে জায়গাটা কি অনেক দূরে?” ববি জিজ্ঞাসা করল।

“বেশি দূরে নয়, ডান দিকে ঘোরাও।”

“ক্রাইস্ট!” লিভা বলল। ও পেছনে ঝুঁকে পেছনের দরজার হাতলে হাত দিল “বেরোও!”

ববি গাড়ি থামাল। লিভার ঠিক পেছনের ভিজে-যাওয়া আফ্রিকানটা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে লাফ দিল। একই সঙ্গে যে আফ্রিকানটা এতক্ষণ কথা বলছিল, সে ও তার দিকের দরজা খুলে বাইরে চলে এল এবং মাথায় টুপিটা পরে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই ও একজন অপরিচিত লোক হয়ে গেল। ওর হাসি এবং ভয়-দেখানে অর্থহীন হয়ে পড়ল। ববি হাইওয়ের ধারের বাঁধটার ওপর উঠে পড়ল। ওদে-ওইখানেই পেছনে ফেলে রেখে, মাটির রাস্তার দু’পাশে দু’জন, মাথার টুপিগুলো চেপে নিচে নামানো, মাথার সঙ্গে সঁটে গেছে, বস্ত্রিত ভিজছে, রাস্তার ধারে দাঁড়ানো দু’জন আফ্রিকান।

“কী গন্ধ!” লিভা বলল, “পাক্সা গুণ্ডা। আমি আফ্রিকানদের প্রতি কড়া হতে পারিনা বলে তো আর নিজেকে খুন হতে দিতে পারিনা।”

হাইওয়েতে উঠবার ঠিক আগেই ববি আবার আয়নায় তাকাল। আফ্রিকান দু’জন একটুও নড়েনি।

“মার্টিন-এর সঙ্গে যাওয়ার সময় প্রায়ই এরকম ঘটেছে,” লিভা বলল, “এসবে-জন্য ওরা যে নারকীয় শপথ নিয়েছিল, সেটাই দায়ী। ওরা ভাবে যে তারই ফতে সকলেই বুঝি ওদের ভয়ে থরহরি কম্পমান।”

“কিন্তু যাই বল না কেন, আমার নিজেকে খুব লজ্জিত বোধ হচ্ছে। এত উদ্ধত আবার তার পরেই এই হেনস্থা। শুধু বুঝতে পারছিনা, ওখানে ওর এতক্ষণ ধটে পড়ে থাকার কী দরকার ছিল। ব্যাপারটা যে কিঞ্চিৎ অশুভ, এটা বুঝবার জন্যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আসার দরকার হয় না।”

“অশুভ, না, হাতি। এটা সম্পূর্ণ বোকামি, ব্যাস্। জানালাটা খোল। ওরা যে সনোংরা খেয়েছিল, তার গন্ধ গাড়িতে আটকে আছে।”

বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায় তির্যকভাবে পড়ছে। ববি আয়নাটায় দেখল, আফ্রিকানরা হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে। কালো, প্রতীকের মতো। আয়নায় ওরা ক্রমশঃই ছোট হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিতে আর পিচের রাস্তার পটভূমিতে অস্পষ্ট থেকে আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। ওরা হাইওয়ে থেকে নেমে গিয়ে যে পথে হান্টিংলজ থেকে এসেছে, সেই পথেই হান্টিং লজের দিকে চলেছে। লিভা দেখেছে বলে ববির মনে হল না। ও-ও কিছু বলল না।

BanglaBook.org

‘ব্যাপারটা খুব করুণ,’ লিভা বলল।

“দুঃখিত। আমার একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল।”

“তুমি ওদের জন্যে দুঃখবোধ কর, দুঃখবোধ কর আর মিষ্টি মিষ্টি উৎসাহব্যাঞ্জক কথা বল এবং তুমি কোথায় আছ জানবার আগেই দেখবে তোমার ঘাড়ের ওপর একজন স্যামি কিমেনজী এসে গেছে। জানালাটা বন্ধ করতে হবে। মার্শালরা আফ্রিকার গন্ধ নিয়ে কথা বলে, তুমি শুনেছ?”

“আমার আরো শক্ত হওয়া উচিত ছিল।”

“এটা খুব বিশিষ্ট গন্ধ।”

“যে সব লোক আফ্রিকার গন্ধ জাতীয় কথাবার্তা বলে, তাদের সঙ্গে আমার মেলে না,” ববি বলল, “ও-রা যেন মাসাই-দের সম্বন্ধে বলছে বলে মনে হয়।”

“হয়তো তুমিই ঠিক। কিন্তু আমি ভাবতাম যে, আমি বোধ হয় আফ্রিকার গন্ধের ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল নই। যেটা মার্শালরা এবং প্রায় সকলেই খুব ভালোবাসে বলে। কিন্তু এবারে, ছুটি থেকে ফিরে আসার পর আমি গন্ধ পেয়েছিলাম। গন্ধটা প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল, তার বেশি নয়। গন্ধটা উদ্ভিজ্জ-পচা আর আফ্রিকানদের গায়ের গন্ধ। একটা আরেকটারই মতো।”

এটা একটা গরম বন্ধ ঘরের মধ্যকার গন্ধের মতো, ববির ভালো লাগত। ও বলল, “বোধ হয় তোমার দক্ষিণে চলে যাবার সময় হয়েছে।”

“এটা এত জঘন্য মর্মস্পন্দ ব্যাপার। তোমার মনে আছে, রাষ্ট্রপতি যখন কালেক্টরেটে এসেছিলেন? সব রোগা, শুকনো সাদা মানুষগুলো আর কালো, মোটা মোটা মানুষগুলো।”

“আমি বুঝতে পারি না, তোমার মাথায় এই কালো মানুষ হলেই মোটা, এই ধারণাটা কোথেকে এল।”

“আমি আমার বন্য মানুষদের রোগা ভাবতেই পছন্দ করি। বিশ্বাস করবে না, স্যামি যখন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এল, তখন ও একটা কক্ষের মতো রোগা ছিল। মার্টিন রাষ্ট্রপতিকে স্টুডিও ঘুরিয়ে দেখাল। স্যামি অবশ্য একটা মাইক্রোফোন আর একটা দরজার গোল হাতল, এ দুটোর তফাৎ বোঝে না। জান, পরে মার্টিন প্রথমেই কী বলেছিল? বলতে এমন অস্বস্তি হয়। মার্টিন বলল, ‘ওই রোজাটা সম্বন্ধে বলতেই হয়, ওর গায়ে খট্টাশের মতো গন্ধ।’ এই হচ্ছে মার্টিন! এ ধরনের কথা শুনে সকলের প্রতি, নিজের প্রতিও লজ্জা বোধ হয়।”

“হা ঈশ্বর!”

“কথাটা চাউর হয়ে গেলে আমাকে বহিষ্কারও করতে পারে। ভালোই হবে।”

“লাঞ্ছনের মতলবটা ঠিক ছিল না।”

“বোধ হয় না।”

“সকালের পর থেকে তোমার বিচার বিবেচনা বেশ পালটেছে মনে হচ্ছে।”

“জানি না, আমার আদৌ কোনো বিচার বিবেচনা আছে কিনা,” লিভার কণ্ঠস্বর হাল্কা।

“কাজেই আমাকে তাড়িয়ে দিলে ভালোই হবে। বুসোগা-কেসোরো-কে বলতে হবে।”

ববির এই ছাব্লামো, এই শ্রেষ ভালো লাগল না। ও জোরে গাড়ি চালাতে লাগল, ভিজে রাস্তার পক্ষে বড় বেশি জোরে।

ও বলল, “লোকে বলে, পশুটা পরে নাকি সবসময়েই দুঃখিত বোধ করে।” “কী রোমাঞ্চকর, ববি।”

ববি স্থির করল, আর কোনো কথাই বলবে না।

বৃষ্টি কমে এল। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাস্তাটা রূপালি আলোয় চক্চক করছে।

রাস্তায় দূরে একটা প্রতিবন্ধক দেখা যাচ্ছিল, কাছে এসে দেখা গেল পুলিশ জিপ, পোশাক-পরা পুলিশের দল আর দুটো জেব্রার মতো ডেইরী-আকা কাঠের বেড়া।

লিভা বলল, “আমার মনে হয়, একেই পথ-অবরোধ বলে।”

গাড়ির গতি আশ্তে করে, পুলিশদের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হয়ে ববি মুখে হাসি আনল।

“ববি, বেশি নরম হয়ো না। এই পুলিশগুলো, ওদের কালো পোশাক, ওদের টুপি, ওরা বেশি ইংরেজ। ওই মোটাটা নিশ্চয়ই ওদের কর্তা, ওই যে, সাধারণ শৌখিন জামা-কাপড় পরা লোকটা।”

ববির সামান্য একটু রাগ হল। কারণ লিভা যে লোকটার কথা বলল, ও সত্যিই ওদের দায়িত্বে আছে বলে মনে হল। লোকটা অল্প বয়েসি, আর ভূঁড়ি-ওয়ালা, একটা গাঢ় বাদামি রং এর ফেল্ট হ্যাট হাল্কা ভাবে মাথায় চাপানো; একটা পুলিশের হাতা-ছাড়া কোটের তলায় একটা ফুল-ফুল ছাপ দেওয়া স্পোর্টস জামা পরা।

দুজন পোশাক পরা সিপাই নিয়ে ও রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ির পাশে চলে এল।

ববি বলল, “আমি একজন সরকারি অফিসার। সাদার্ন কালেক্টরেটে মিঃ ওগুণ্ডা ওয়াল্জ-বুতেরে-র ডিপার্টমেন্টে আছি।”

সাদা পোষাকের লোকটা বলল, “লাইসেন্স।”

যখন ও ববির গাড়ি চালানোর অনুমতিপত্র পরীক্ষা করছিল, ওর ঠোট আর জিভ একসঙ্গে খেলা করছিল আর ও কনুই দুটো গায়ের সঙ্গে শক্ত করে সঁটে রেখেছিল, ওর ভুঁড়িটা মাঝে মাঝেই উঠছিল, নামছিল।

“আমার অফিস এলাকার পাশ-টা গাড়ির সামনের কাছে লাগানো আছে।”

“দয়া করে বনেটটা খুলুন আর চাবিটা দিন।”

ববি বনেট খোলার লিভারটা টানল আর চাবিটা দিল। পোশাক-পরা সিপাইরা বনেটের নিচে আর পেছনের মাল রাখার জায়গাটা তল্লাসি করল। ততক্ষণ সাদা পোশাকের লোকটা গাড়ির দরজা-জানালায় আবরণ আর সীটের গদি, মাঝখানের জায়গা, সব টিপে টিপে দেখল। ও লিভার সুটকেসটাও খুলল, আর ভেতরের পাতলা জিনিসগুলোর ওপর চওড়া চ্যাপ্টা হাত দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করল। “আপনাদের কষ্ট দিলাম,” ও শেষ কালে বলল।

তার মানে, ওদের কাজ শেষ। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তখন তাড়াহুড়ো করে, যেন ওদের কর্তব্যের কথা মনে পড়েছে, ও হাসল আর টুপি তুলল। টুপিটা ওর যে চুল ঢেকে রেখেছিল, সেটা দেখা গেল, একেবারে ইংরেজদের স্টাইলে আঁচড়ানো। একপাশে সিঁথি করা, অন্যপাশে চুলের ঢিবি। “ও ‘আমাদের’ একজন, এটাই সান্ত্বনা,” লিভা বলল, ববি ততক্ষণে জেরা ডোরা আঁকা বেড়া দুটোর মাঝখান দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে গেছে। “কিন্তু আমি ভাবছিলাম, ওরা রাজাকে রাজধানীতে খুঁজবে, তাই না? গতকাল রাত্রের গুজব তো এই ছিল যে, রাজা নাকি একটা ট্যাক্সিতে পালিয়ে গেছেন।”

“ওরা অস্ত্র-শস্ত্র তল্লাশি করছিল। আমি জানতে পেরেছি যে, কালেক্টরেটে অস্ত্র শস্ত্র পাচার হচ্ছে, ওপর-মহলে এই ধরনের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়েছে। পর্যটকরা, বা এই রকম লোকেরা এসব করতে পারে। রাজার প্রাসাদে নাকি একটা বিশাল অস্ত্রাগার রয়েছে, এই সব লোকে বলাবলি করে। পুলিশগুলো অতিরিক্ত নম্র ছিল, তাই না?”

পথ-অবরোধ, পুলিশ, কালো পোশাকের ওপর বৃষ্টির বিন্দু, খোলা রাস্তা ওর নিজের নিরাপত্তা: ববির গলার স্বরে উত্তেজনা। “এটা সাইমন লুবেরোর কীর্তি। জনসাধারণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, এই সবার জন্যে ও খুব ব্যস্ত। সবাই বলে যে, হব্‌স নাকি ওর মান ঠিক রাখে, কিন্তু গত বছর একটা অধিবেশনে ওর সঙ্গে আমার দেখা এবং পরিচয় হয়েছিল এবং আমি খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। ক’দিন আগে কাগজে ওর একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল, বলতেই হবে, ওটা আমার দারশন ভালো লেগেছিল।”

“আমাদের নিজেদের ‘দু’ মিনিটের নীরবতা’র মধ্যে। আমাদের সকলকে তৈরি করে রাখছে। সাইমন অত্যন্ত ব্রিটিশ।”

“খারাপ নয়। ওর সঙ্গে।”

“তাহলে ‘আপনাকে কষ্ট দিলাম,’ ” লিভা নকল করল। “মনে হচ্ছে, কারফিউ ঘোষণা হবে, তাই না? আমি জানি যে, আমরা সাদা-চামড়া আর আমরা নিরপেক্ষ, কিন্তু আমি ভাবছি, আমাদের অন্যদিকে দৌড়ানো উচিত কিনা। আমাদের বিশেষ নঙ্গী আছে বলে মনে হচ্ছে না।”

ববি অবশ্য সত্যিই গাড়ি নিয়ে দৌড়াচ্ছে, খানিকটা অভিনয়, অবশ্য, ওই পথ মবরোধের উত্তেজনার ফলে, ফাঁকা আফ্রিকান রাস্তার ওপরে একটা বিপদের এবং শালানোর নকল দৃশ্য; রাস্তাটার একপাশে লম্বা লম্বা পাতা-ঝরা শিশু গাছের শাখার ওচ্ছ; বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে, আকাশে এখন অনেক উঁচুতে মেঘ, আলো সরে সরে যাচ্ছে, জ্বলজ্বলে সবুজ আর উজ্জ্বল রঙ-এর দাগ-ধরা ঢেউ খেলানো জমি দূরের শাহাড়ের দিকে ক্রমাগত চলেছে, চলেছে।

ও গাড়ির পেট্রল গেজ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা এসার-এ থেমে গাড়িতে পেট্রল ভরে নেব।”

“এশিয়ান বয়কটের সময় এলাকায় সবাই সবসময় ট্যাঙ্কে পেট্রল ভর্তি করে রাখত, দিনে বা রাতে যে কোনো সময় সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য।”

“আরে ভাই,” ববি বলল, “এই রকম উত্তেজনা। প্রত্যেকদিন বি.বি.সি-তে চলছে, হাই কমিশন অফিসে পুনে ওঠার জন্যে সই করা হচ্ছে।”

এতক্ষণে লিভার ওপর দুপুরের খাওয়া, রিয়েসলিঙ মদ খাওয়া এবং লম্বা সফর-এর চাপ বোঝা যাচ্ছে। ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে, পরিশ্রমের ছাপ পড়েছে, চোখের নিচে কালি পড়েছে, আর ওর রঙের দুপাশে চামড়ায় যেন বাদামি-হলুদে দাগ দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ লিভা বলে উঠল, “এই নাটকীয় আলোটা আমার দারুণ পছন্দ, তোমার ভালো লাগে না? আর এই শিশুগাছগুলো। এই সমস্ত কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ততক্ষণ না তুমি ওইসব ছোট ছোট বাদামি কুটিরগুলো দেখতে পাচ্ছ। তোমার মনে হবে, এখানে কোনোদিন কিছুই ঘটেনি।” ওর গলার স্বর আবার রহস্যময় হয়ে উঠল; ও নিজে যে কথা বলছে, সেটা সিজাই শুনছে; ববি এটা বুঝতে পারছে। ‘কেউ জানতেও পারবেনা, এখানে কী ঘটেছে।’

ববি বলল, “আমরা কেউ কেউ জানি, এখানে কী ঘটেছিল।”

“কুড়ি বা তিরিশ জন লোককে এশিয়ান বয়কটের সময় এখানে খুন করা হয়েছিল। আর ওরা কেবল সেই ডেনমার্কের দুগ্ধপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরাই ছিল না, তাদের রোদের মধ্যে দৌড় করানো হয়েছিল। আমি জানিনা, এই ধরনের ব্যাপারগুলো, যেগুলো কাগজে বেরোয়না বা রেডিও-তেও শোনানো হয় না, এগুলো কোনো বিশেষ জায়গায়, যেমন কোনো ছোট কালো বই-তে অথবা বড় কালো বই-তে লিখে রাখা হয় কিনা।”

ববির মনে হল, লিভা বলছে বটে, কিন্তু এব্যাপারে ওর কোনো উদ্বেগ নেই; অন্য ব্যাপারে ও ভাবছে; বিনা কারণে ও আমাকে ছোট করতে চাইছে আর ওর

নিজের মেজাজটা আমার ওপর চাপাতে চাইছে। ববি এই সব ভাবতে ভাবতে দেখল যে ওর নিজের উত্তেজনাও কমে গেছে আর লিভা ওকে যে উজ্জ্বল করছে, এটার জন্যেই ও অপেক্ষা করছে।

“ভূমিকম্পের সময় তুমি এখানে ছিলে না,” লিভা বলল, “আমি তখন সবে এসেছি। বাড়ির কাজের ছেলেটা সকাল বেলা চোখে জল নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, যে গ্রামগুলো ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তারই একটাতে ওদের পরিবার থাকত। আমি ওকে থানায় নিয়ে গেলাম, থানায় মৃত, আহতদের কোনো তালিকা আছে কিনা দেখবার জন্যে। ওদের কাছে এরকম কোনো তালিকা নেই। আর ওখানে সকলেই খুব অভদ্র ব্যবহার করল। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমি খোঁজ করলাম। কিন্তু কোনো তালিকা নেই, আর শেষ পর্যন্ত কাজের ছেলেটাও দুষ্টিস্তা করা ছেড়ে দিল। ‘দু’ মিনিট নীরবতা’-র মধ্যেও কিছুই নেই। রেডিও-তেও কিছু নেই। সকলেই ব্যাপারটা বোধ হয় ভুলেই গেছে। ভূমিকম্প হয়েছিল নাকি? কারো কিছু যায় আসে? হয়তো ওইসব লোক মারা যায়নি, আর যদি মারা গিয়েও থাকে, কিছুই যায় আসে না। হয়তো বাড়ির কাজের ছেলেটা ওর নিজের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এটা করেছে। হয়তো এখানে যা কিছু ঘটে তার কোনোটাই আকর্ষণীয় নয়। হয়তো এরকম একটা জায়গায় কোনো খবরই তৈরি হয় না। স্যামি কিম্বেনজী প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা পাঠিয়ে বলতে পারে এটা একটা খবর।”

ববি ভাবল, মার্টিনের তিক্ত মেজাজের খানিকটা ও ধরতে পেরেছে লিভার বক্তব্যে। কিন্তু ও শুধু বলল, “তুমি যেভাবে বললে, তাতে মনে হচ্ছে কোনো জায়গাতেই কোনো খবর হয় না।” “আমি তর্ক করতে চাই না। আমার বিশ্বাস, আমি কী বলতে চাইছি, তা তুমি জান।”

“আমরা পেট্রল নেবার জন্যে এশার-এখানে।”

লিভা খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, “আমার মাথা ধরেছে।”

ও গাড়ির মেঝে থেকে ব্যাগটা তুলে ওর কোলের ওপর রাখল, তারপর হাত আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিয়ে বলল, “হা ঈশ্বর।” চট্‌জলদি ও মুখটা মেক-আপ করল, চুল আর রুমাল ঠিক করল। ওর হাত দুখানা এখনও সুঠাম, অল্পবয়েসিদের মতো, ওর জামার ছোট হাতাটা উঠে গিয়ে ওর কামানো বগলের আঁচিলটা চোখে পড়ল। তারপর ও কালো চশমাটা পরে সীটে হেলান দিয়ে বসল। এখন ওকে বেশ শান্ত মনে হচ্ছে।

ববির ওকে ঘেন্না করতে লাগল।

প্রত্যেক দু'মাইল অন্তর অন্তর মাইল-ফলকে লেখা ছিল ই.এস.এইচ. আর এখন শেষ ফলকটায়-ইংরেজদের নক্সার মতো, হয়তো ইংল্যান্ড থেকেই আনানো-লেখা রয়েছে 'এশার ।' কিন্তু আশপাশে চতুর্দিকেই এখনও উষ্ম ও নির্জন প্রান্তর ।

তারপরই তারের বেড়া দেখা গেল, তার পেছনে পুরোনো পাইন গাছ; কাঁচা মাটির ওপর ট্রাক্টরের চাকার দাগ, থকথকে কাদার মধ্যে, হাইওয়েতে এসে মিশেছে । একধারে কুঁজের মতো টিলা উঠে গেছে; হাইওয়েটা বেঁকে গেছে । একটা প্রায় ধুয়ে-যাওয়া কাঠের তক্তার ওপর 'সামনে লেভেল-ক্রসিং আছে' এই সতর্কবাণী লেখা রয়েছে; গাড়িটা ঝাঁকানি খাচ্ছে । লম্বা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ, খাড়া সোজা গাছের কাণ্ড, গাছের ছাল ছেঁড়াখোঁড়া, একটা খোলা কুঞ্জবন তৈরি করেছে, গাছ থেকে টপটপ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে; আর দূরের বিশাল পর্বতশ্রেণীর পটভূমিতে এই ছোট উঁচু টিলাগুলোতে বেড়া-দেওয়া চারণভূমি, খোলা ঢেউখেলানো জমি, ইউক্যালিপটাস গাছের সারি যাতে তীব্র হাওয়া আটকে যায়, পুরোনো খণ্ড খণ্ড জঙ্গল; একটা অসমাপ্ত ভূচিত্র, মহাদেশের গায়ে একটা আঁচড়ানোর দাগের মতো ।

রাস্তার দু'পাশ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে; বড় বড় বাগানের মধ্যে কিছু বিবর্ণ বাড়ি দেখা যাচ্ছে । রাস্তার মাঝখানে একটা গোলচক্কর, তার ভেতরের বাগানটা এখনও দেখাশোনা করা হয়, তারপরই হাইওয়েটা শহরে ঢুকে গেল । আড়াআড়ি রাস্তা গেছে, প্রত্যেকটা রাস্তার মুখে নতুন সাদা-কালো কাঠের তক্তায় রাজধানীর এক একজন নতুন মন্ত্রীর নাম লেখা, রাস্তাগুলো দু'তিনশ বছর গিয়েই কাদার রাস্তা হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে । শহরটা তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ উঠবার জন্যে । কিন্তু বাড়েনি । শহরটা হয়ে রয়েছে কতকগুলো পুরোনো টিন আর কাঠের বাড়ির, একটা ছোট নতুন ব্যাঙ্ক বাড়ির আর মোটর গাড়ি ও ট্রাক্টর এর শো-রুম-এর সমষ্টি । দেওয়ালে কাদা-ছিটকানো পুলিশ ব্যারাক, নিচু সাদা কংক্রীটের মাটির সঙ্গে লাগানো ছাউনি, এখনি মনে হচ্ছে যেন রাজধানীর আফ্রিকান এলাকার কুটির ।

যে পেট্রল পাম্পে ববি ঢুকল, সেটা স্বাধীনতার পরে এদেশে আসা একটা তেল কোম্পানির মালিকানায় । একটা উঁচু হল্‌দে আর কালো বোর্ডে বড় বড় আন্তর্জাতিক সংকেত চিহ্নে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়, লেখা আছে । কিন্তু একটা চিহ্ন, টেলিফোনের ছবি, একটুকরো বাদামি কাগজ দিয়ে খানিকটা ঢাকা রয়েছে; আর, আরেকটা চিহ্ন, আড়াআড়ি রাখা ছুরি আর কাঁটা, কেটে দেওয়া হয়েছে, ইঞ্জিন অয়েলে আঙুল ডুবিয়ে । হল্‌দে বোর্ডটার নিচের দিকে অফিসের সাদা দেওয়ালে যেমন দেখা যায়, তেলা আঙুলের, কখনো বা পুরো তেলা হাতের ছাপ, মনে হচ্ছে, ঘসে ঘসে হাতের বা আঙুলের তেল পরিষ্কার করেছে । অ্যাস্ফল্টের প্রাঙ্গণের ঢাকা জায়গাটা তেল পড়ে পড়ে কালো হয়ে গেছে আর খোলা জায়গাটা বৃষ্টির জলে ভিজ়ে, ধুয়ে জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে ।

চারজন আফ্রিকান, নীল রঙ এর পুরোনো ঢোলা পোশাক পরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলো ফেলে দেওয়া, দাঁড়িয়ে গাড়িটার ঢোকা দেখছে। ববি ঢাকা জায়গাটার বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, হর্ণ বাজাল, চার আফ্রিকানই চমকে উঠল। তারপর এ ওর দিকে তাকাল, চারজনই ইতস্ততঃ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন খুবই ছোটখাট; ওর ঢোলা পোশাকটা পা ছাড়িয়ে নেমে এসেছে, গোড়ালির কাছটা গোটানো।

“আমি ‘মহিলাদের জন্য’-তে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছি,” লিভা বলল।

ও ছোট ছোট ব্যস্ত পায়ে হেঁটে গেল, মাথা নিচু। ওর ফুলপ্যান্টটা হাঁটুর নিচে ফোলা ফোলা, আর ওর পিঠে দুই কাঁধের হাড়ের মাঝখানে জামার ওপর অনেকখানি ঘামে ভেজার দাগ।

ছোট আফ্রিকানটা আর আরেকজন আফ্রিকান গাড়ির কাছে এল, ছোটটা প্রতিবার পা ফেলার সাথে সাথে পা ছুঁড়ে, ওর ঢোলা পোশাকটা পায়ে আটকাচ্ছে বলে। ওর হাতে একটা বালতি, একটা স্পঞ্জ আর একটা ধাতুর হাতল দেওয়া পরিষ্কার করার যন্ত্র। ও চুপচাপ গাড়ির জানালাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল।

লিভা ফিরে এল। “জায়গাটা তালা লাগানো।”

বড় চেহারার আফ্রিকানটা পকেট থেকে একটা তেল-লাগা ইয়েল চাবি ওর তেল-কালি মাথা দু’আঙুলে ধরে বাড়িয়ে দিল। লিভা কোনো কথা না বলে চাবিটা নিয়ে চটপট হেঁটে গেল।

তেল, পেট্রল, জল, ব্যাটারি, টায়ার: ববি উদ্বিগ্নমুখে বড়সড় আফ্রিকানটার কাজ দেখাশোনা করল, ওকে উৎসাহ দিল। ও স্নেহ নিজের বুদ্ধিপূর্ণ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করল। প্রচুর হাসল। আফ্রিকানটা নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে, কোনো ক্রক্ষেপও করল না। যখন লিভা ফিরে এল, ববি চুপ করে গেল। আত্মমগ্ন হয়ে লিভা অ্যাসফল্ট ঢাকা জায়গাটার একধারে দাঁড়িয়ে ক্রান্ত হাড়িয়ে টিলা, পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, ওর কালোচশমা ঢাকা চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না।

শেষ হয়ে গেলে ববি টাকা দিল এবং ও আর লিভা গাড়িতে উঠে বসল। ওরা যখন ফেরৎ পয়সা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, তখন লক্ষ করল ছোট খাট আফ্রিকানটা, যেটা জানালা পরিষ্কার করছিল, একবার এ জানালা একবার ও জানালা অঙ্ককার করে দিচ্ছে। লিভার কপাল দপদপ করতে শুরু করল, ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়সড় আফ্রিকানটা ফেরৎ পয়সা নিয়ে এল। ও যদি আবার ঐ রকম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ববি ভাবল, আমি ওকে ভালো করে শোনাব। আফ্রিকানটা একটা একটা করে মুদ্রা গুণে গুণে ববির হাতে দিল। অনেক বেশি মনে হল, ববি যা দিয়েছে, তার চেয়েও বেশি।

“কি করণ অবস্থা।” লিভা ফিসফিস করল।

ছোট আফ্রিকানটা লিভার পাশের জানালাটা থেকে সরে লিভার দিকে সামনের কাচটার কাছে চলে এল। ও ওয়াইপারটা বিপজ্জনক ভাবে একপাশে টেনে সরিয়ে

পরীক্ষার করতে শুরু করল। কাচের ওপাশে ওর মুখটা লিভার মুখের পাশাপাশি, কয়েক ইঞ্চি তফাৎ। ও ভুরু কঁচকাল, নিজের কাজ করতে ব্যস্ত, লিভার দিকে তাকাচ্ছে না।

লিভা নিজের কোলের দিকে দৃষ্টি নিচু করে ফিসফিস করল, “কী করণ ব্যাপার!” ও যদি আবার এই একই শব্দ উচ্চারণ করে, আমি ওকে মারব, ববি ভাবল। ও বড়সড় আফ্রিকানটার হাতে অতিরিক্ত পয়সাগুলো গুণে গুণে ফেরৎ দিতে লাগল আর ইচ্ছা করেই বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে গুণতে লাগল। ও শেষ মুদ্রাটা ওর হাতে দিয়ে, সেটা বখশিশ ছিল, আফ্রিকানটার দিকে তাকিয়ে হাসল। বড় আফ্রিকানটা চলে গেল আর ছোট আফ্রিকানটা ববির দিকে সামনের কাচটার কাছে ওর বালতি-টালতি নিয়ে চলে এল।

লিভা বলল, “দেখ, এটা কী করছে।”

ববি লিভার দিকের সামনের কাচটার দিকে তাকাল। তারপর ও ছোট আফ্রিকানটার দিকে তাকাল। আফ্রিকানটা যে পরীক্ষার করার যন্ত্রটা ব্যবহার করছিল, ওটার হাতলের দু’পাশে একদিকে রবার আর অন্যদিকে স্পঞ্জ লাগানো ছিল। কিন্তু দুটোই ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু শক্ত লোহা পড়ে আছে আর তাই দিয়েই ও সামনের কাচ আর সব জানালাগুলো ঘসে ঘসে পরীক্ষার করছিল। সামনের কাচটায় আর সব জানালার কাছে গভীর কাটা কাটা দাগ হয়ে গেছে। ও তখনও ববির দিকে না তাকিয়ে, ভুরু কঁচকে একমনে ঘসে চলেছে।

ববি আফ্রিকানটার মুখের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য দেখল, ওর চামড়ার বিশিষ্ট, নিস্প্রাণ কালো রঙ দেখল আর ওকে রাজার উপজাতির লোক বলে চিনতে পারল। ববি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ রেগে গেল। আফ্রিকানটা বুঝতে পারল, ববি ওকে দেখছে, ও আরো ভুরু কঁচকে রইল। “এটা কী করছে?”

ববি এত জোরে গাড়ির দরজাটা খুলল যে আফ্রিকানটার গায়ে লাগল আর ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

আফ্রিকানটা কোনোরকমে সোজা হল এবং গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল। ও বলল, “কি?” আরো কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু ববির দিকে ধাক্কা-খাওয়া জল-ভরা চোখে তাকিয়ে, বাঁ হাতে ছেঁড়াখোঁড়া স্পঞ্জটা আর ডান হাতে ধাতুর তৈরি পরীক্ষার করার যন্ত্রটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

“কী করেছিস দ্যাখ” ববি চৈঁচাল, “আমার গাড়ির সামনের কাচটার, সবগুলো জানালার কাচের সর্বনাশ করেছিস। আমার গাড়িটা বেচতে গেলে এখন কয়েকশো শিলিং-এর লোকসান হয়ে যাবে। কে দেবে এই টাকাটা? তুই?”

“ইনসিওরেন্স,” আফ্রিকানটা বলল। আবার মনে হল, ও যেন আরো কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু ওর মুখে আর কোনো কথা জোগাল না।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব চালাক। তোমরা সবাই খুব চালাক। সব কিছু জান। ইনসিওরেন্স? তোমাদেরই দিতে হবে।”

ববি আফ্রিকানটার দিকে এক পা এগোল। আফ্রিকানটা পিছিয়ে গেল, ওর ঢোলা পোশাকে অস্বস্তিতে পড়েছে।

বাকি তিনজন আফ্রিকান চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ওদের ময়লা নীল পোশাকে, একজন অফিসের দরজার পাশে, সাদা দেওয়াল ঘেঁসে, একজন হল্‌দে বোর্ডটার সামনে, আর একজন পেট্রল পাম্পের পাশে।

“আমি তোমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করাব,” ববি বলল, “দেশে পাঠিয়ে দেব। এখানে ম্যানেজার কে আছে?”

অফিসের সাদা দেওয়াল ঘেঁসে যে আফ্রিকানটা দাঁড়িয়ে ছিল, ও হাত তুলল। এই লোকটার সঙ্গেই ববির টাকা পয়সা লেনদেন হয়েছিল। ও একটু ইতস্ততঃ করে ববির দিকে এগিয়ে এল। কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো পেছনে রেখে বলল, “ম্যানেজার।”

এটা নিশ্চয়ই কোম্পানির নীতি; তবু ববির সন্দেহ হল এই ম্যানেজারের অন্য কর্মচারীকে নিয়োগ করা বা বরখাস্ত করার ক্ষমতা আছে কিনা।

“আমি তোমাদের হেড অফিসে চিঠি লিখব,” ববি বলল। ও পকেট থেকে একটা খাম আর বলপেন বার করল। “তোমার ওপর-ওয়ালা কে?”

“ডিস্ সুপিনড্যান্ট, ইন্ডিয়ান।”

“দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার পুরোনো এশিয়ান কায়দা। তোমার এই ডিস্ সুপারিনটেন্ডেন্ট আজ এসেছিল?”

“আজ না। বাড়ি। তিনি ওখানে থাকেন।” ম্যানেজার শব্দের সেই দিকটা হাত দিয়ে দেখাল, যেখানটার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ববি পেট্রল পাম্প এসেছে।

“ও হ্যাঁ, ওরা সব আজ লুকিয়ে আছে। ওর ঠিকানাটা দাও। তোমার ওপরওয়ালা কোথায় থাকেন?” ও খামের ওপর অধৈর্য হয়ে লিখতে লাগল, তারপরেই থেমে গিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে শুধু আকিবুকি টানতে লাগল, কিছুই লিখল না। বলল, “এই সব লোকদের কাজে রপ্তা ঠিক নয়। এরা এবং এদের রাজা বড্ড বেশি দিন সব কিছু নিজেদের হাতে রেখেছিল। কিন্তু ওদের খেলা শেষ। আমার গাড়ির সামনের কাচটার দিকে তাকিয়ে দেখ।”

ম্যানেজার একপাশে একটু ঝুঁকে দেখল।

ছোট আফ্রিকানটা এতক্ষণে একটু গা-হাত-পা ছাড়ল। তখনও দু হাতে স্পঞ্জ আর পরিষ্কার করার হাতলটা ধরে, ওর ছোট মুখটা শক্ত করে তেলতেলে জায়গাটার দিকে মাথা নিচু করে অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ববি ওর এই অমনোযোগিতা সহ্য করতে পারল না। ও বলল, “এর জন্যে পুলিশকে ডাকতে হবে।”

আফ্রিকানটা এবার চোখ তুলল, দু'চোখে ভয়। ও আবার কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু বলল না। তারপরে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন ও স্পঞ্জটা আর ধাতুর

তৈরি হাতল-ওয়ালা যন্ত্রটা রেখে দিতে যাচ্ছে, তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

“আমি একজন সরকারি অফিসার,” ববি চিৎকার করে বলল।

আফ্রিকানটা থেমে ঘুরে দাঁড়াল, “স্যার।”

“তোর সাহস কি করে হল আমি যখন তোর সাথে কথা বলছি, তুই আমার দিকে পেছন ফিরলি?”

দেশি জামাটা দুলিয়ে, ডান হাতে ঘুসি বাড়িয়ে ববি ছোটখাট আফ্রিকানটার দিকে এগোল। আফ্রিকানটা ঘুষি এড়ানোর কোনো চেষ্টাই করল না। ওর চকচকে চোখ দুটোয় প্রত্যাশা ফুটে রয়েছে।

বাকি তিনজন আফ্রিকান, যে যেখানে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একজন হল্‌দে বোর্ডটার সামনে, একজন পাম্পের পাশে, ম্যানেজার গাড়ির পাশে।

‘ববি,’ লিভা গাড়ির দরজা অর্ধেক খুলে বলল। ওর গলার স্বর নিরপেক্ষ, কোনো ভরসনা নয়। ও ববির নামটা এমনভাবে বলল যেন কতদিনের চেনা।

“আমার দিকে পেছন ফেরার সাহস তোর কী করে হল?”

“ববি,” লিভা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসার জন্য তৈরি।

চারজন আফ্রিকানই যে যেখানে দাঁড়িয়ে। হল্‌দে রং এর দেশি সার্টটা নাচ্ছে, ববি গাড়ির দিকে দ্রুত চলে এল। আর ববি যখন গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে এবং পাম্পের বাইরে চলে এসেছে, তখনও ওরা যে যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে। ববি গাড়ি থামল।

“আরে, ঠিকানাটা কোথায় ফেললাম?” ববি বলল। ও আগত ভাবে খামটা খোঁজার ভান করল, যার ওপর ও কিছুই লেখেনি।

“আমার মনে হয়, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো,” লিভা বলল।

“ওঃ, না।”

“আরে ওদের হেড অফিসে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিও, তুমি যেমন বললে। আমার মনে হয় লোকটা যে ঠিকানা দিল, তার পেছনে দৌড়ে কোনো লাভ নেই।”

ববি তখনও খুঁজে চলেছে।

তারপরই খুব দ্রুততার সঙ্গে ইঞ্জিনে আওয়াজ তুলে, নীল ধোঁয়া ছেড়ে, টায়ারের শব্দ করে ও গাড়িটাকে বাঁয়ে ঘোরাল আর শহরের বাইরে যাবার রাস্তা ধরল। ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট এর ব্যাপারটা বাতিল করে।

চারজন আফ্রিকান তখনও যে যেখানে ছিল। সেখানেই দাঁড়িয়ে।

“অপমান,” সীটে ছটফট করতে করতে ববি বলল।

লিভা কিছুই বলল না।

শিগ্গিরই ওরা শহর ছাড়িয়ে গেল। তিনটে কি চারটে বড় কংক্রিটের ছাউনি, তথাকথিত শিল্পনগরীর ফাঁকা জঙ্গলাবৃত্ত জমিতে একটা লোহার কারখানা, উঁচু-নিচু দু'পাশওয়ালা রাস্তা, হাস্যমুখ আফ্রিকানদের ছবি আঁকা বৃষ্টিতে ধুয়ে-যাওয়া বড় বড় হোর্ডিং, তারপর আবার হাইওয়ে এবং তারপরেই একটা পাহাড়ের গায়ে সারি সারি রঙ-না-করা কাঠের বাড়ি, একটা ব্যর্থ ঔপনিবেশিক আবাদীর ধ্বংসাবশেষ।

“অপমান।”

ডান দিকের দূরের টিলাগুলোকে বৃষ্টির মেঘ কালো করে তুলেছে, আর বহুদূরের উঁচু পর্বতশ্রেণী আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাঁ দিকে, যদিকে জমিটা একদম খোলামেলা, ওদিকে আকাশ এখনও উঁচুতে আর মেঘের মধ্যে থেকে যখন সূর্য আবার উঁকি মারল, তখন ভিজে রাস্তাটা চক্‌চক্‌ করে উঠল আর বেড়া-দেওয়া চারণ ভূমিটা হয়ে উঠল তাজা সবুজ।

হঠাৎ ববি ব্রেক করল, অবশ্যই সাবধানে যাতে গাড়ি না পিছলায়, তারপর রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করাল। রাস্তা ফাঁকা, কাজেই ব্যাপারটা নিরাপদেই ঘটল।

বাঁ দিকের চাকাটা নরম ঘাসে আর কাদায় একটু বসে গেল। ও কিন্তু ডান দিকের চাকাটা রাস্তার পিচের ওপর রেখেছে। ও স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে মাথা ঝুঁকল। তার পর মাথা তুলে, ওর ডান কনুইটা হুইলের ওপর তুলে, ও ওর হাতের পাতা দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরল, আবার হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে, মুখ নিচু করল, তারপর আবার হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিল।

“ও: ঈশ্বর,” ও বলল, “কি জঘন্য ব্যাপার!”

আকাশে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট একবার ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে, আবার আলোয় ভরে যাচ্ছে। এখন যেন ঠিক গোখলির মতো; এখন বিকেল।

“জঘন্য,” ও বলল, হাতের চেটো দিয়ে নিজের মুখে আঘাত করল, “জঘন্য।”

ও দুহাতে হুইলটা চেপে ধরে ঝুঁকে রইল। ওর দেশি জামার হাতাটা ঝুলছে, সারাদিনের ধকলে, ঘামে, রংটা ফ্যাকাশে লাল হয়ে গেছে।

লিভা কিছুই বলল না, ঘুরেও তাকাল না। ওর কালো চশমার আড়ালে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ববি মুখ তুলল। “আমি রাজার লোকদের জানি,” ও বলল। “উনি বোধ হয় খ্রিস্টান, প্রতি রবিবার গির্জায় যান। জামাকাপড় খুব পরিষ্কার রাখেন। উনি নিজের দুটো জামা নিজেই কাচেন, নিজেই ইস্ত্রি করেন, খুব সাবধানে। ওঁর স্ত্রী কালেক্টরেটে নিজেদের গ্রামের একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। রাজা পড়াশোনা করেন। ওঁর প্যান্টের পেছন-পকেটে ওই বোকা-বোকা ছোট পেপারব্যাগ বইটা থাকে।” ববি নিজের কাজের ছেলেটার কথা ভাবছিল, সে-ও ছোটখাট দেখতে, চেহারা তীক্ষ্ণ, কাটা-কাটা, আর সে-ও রাজারই উপজাতি। সে-ও গির্জায় যায়, আর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ভক্তিমূলক বা শিক্ষামূলক বই-টাই পড়ে। মাসের প্রথমার্ধে মদ

খায়, প্রায়ই খোয়ারিতে ভোগে, তখন আবার চুপচাপ হয়ে যায়, ওর ব্যবহারও তখন অতিরিক্ত নম্র হয়ে পড়ে। ববি মৃদুস্বরে বলল, “ঈশ্বর।” তারপর স্টিয়ারিং হুইলের ওপর আবার ঝুঁকে পড়ে ও নিউ শোপশায়ারের ‘বার’-এর কথা ভাবল। “ঈশ্বর, ঈশ্বর।” ও আবার মুখ তুলল। “ঈশ্বর।” কিন্তু এখন ওর গলার স্বর পাল্টে গেছে, “ঈশ্বর, কী সুন্দর।” ও এখন সবুজ মাঠের ওপর সূর্যকিরণের খেলা দেখছে আর বলছে।

শেষ পর্যন্ত লিভার সাড়া মিলল। সে-ও মাঠটা দেখার জন্য ঘুরল।

ববি বলল, “এখন আমি আমার দুঃখজনক আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে ফেললাম।”

“আমার তা মনে হয় না,” লিভা বলল। ও দেখল ববির চোখে জল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যবহার পাল্টে গেল। “আমার মনে হয় ও বোঝেই নি, কী হয়ে গেল। যাই হোক, ওদের একটু কড়কানি দরকার ছিল। এতে ওদের কোনো ক্ষতি হয়নি অবশ্য। তুমি তো বাথরুমটা দেখনি। আর শোন, মনে হচ্ছে, চাবিটা আমার কাছেই রয়ে গেছে।”

“তাহলে তো ফিরে যেতে হয়।”

“কি জন্যে? ওরা তাহলে ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে। হয়ত পুলিশও ডাকতে পারে।”

“মনে হচ্ছে হয়ত কেঁদে ফেলব।” ওর দু'চোখ পরিষ্কার হয়ে এসেছিল, আবার জলে ভরে গেল। ও হাসল।

“আমার সন্দেহ আছে। মনে হচ্ছে, তুমি যদি ফিরে যাও, আর দেখ যে ওরা সবাই মিলে খুব হাসাহাসি করছে, তাহলে তুমি হয়ত আবার রেগে যাবে।”

“আমি ফিরে যাব।”

“আমার বাড়ির কাজের ছেলেদের সঙ্গে এককম আমার অনেকবার হয়েছে। এক ডজন গুঁড়ো দুধের কৌটা পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি ওদের কড়কে দিলে। একেবারে সাংঘাতিক হৈ চৈ হয়ে গেল, আর নিজের বাড়িতে তোমাকেই চোরের মতো চলাফেরা করতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হয়তো আত্মহত্যা করে বসতে পারে। কিন্তু ওদিকে কোয়ার্টারে ওদের তো দারুণ স্মৃতি। সব বন্ধুদের ডেকেছে আর হেসে মরে যাচ্ছে।”

“আমরা ওদের হাসিকে ভুল বুঝছি,” ববি বলল; ও গিয়ার-এর হাতলটা নাড়াচাড়া করছে।

“হতে পারে। এটা অস্বস্তি হতে পারে, অগ্রাহ্য করা হতে পারে অথবা এইরকমই কিছু। স্যামি কিম্বেনজী আমাকে বলেছিলেন। আর কোনো ইউরোপিয়ানই হয়ত ওকে বলেছিল। তবে আমি কিন্তু মনে করি যে, এর মধ্যে খানিকটা কিন্তু সেই পুরোনো ঢং-এর হাসিই।”

ববি গাড়ি স্টার্ট করার চাবি ঘোরাল।

লিভা একটা চিৎকার দিল, ওর সার্টটা তুলে ফেলল, আর খুব জোরে শরীরে মোচড় দিয়ে দরজার দিকে ঘুরে গেল।

“আমাকে কিছু একটা কামড়াল। দেখ, কিসে কামড়াল, আমি দেখতে পারব না।”

ও ওর বাঁ পাছার ওপর মোচড় দিয়ে ঘুরে বসে, সার্টটা ওপরে তুলে কালো চশমার মধ্যে দিয়ে গাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল আর ববি দেখতে লাগল। ওর পাঁজরের ঠিক নিচে একটা লাল ফোলা, টিবির মতো উঁচু দেখতে পেল।

“ওটা কী?” লিভা জিজ্ঞেস করল, “ওটা কী কামড়েছে?”

“কোথায় কামড়েছে, দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কিসে কামড়াল, দেখতে পাচ্ছি না।”

“হায় ঈশ্বর!”

লিভা শক্ত হয়ে বসে রইল আর ববি ওর শরীরটা, যেটা ও বাচ্চাদের মতো প্রদর্শিত করছে, দেখতে লাগল। ওর ভিজে ভিজে চামড়ায় পাতলা হলুদেটে ভাঁজ, ভঙ্গুর পাঁজরাগুলো, সেদিনের অভিযানে বেরোনোর আগে পরা বক্ষ-বন্ধনী, যার মধ্যে দুটো দীনহীন ছোট ছোট স্তন রয়েছে এবং ওর নীল প্যান্টের কোমরবন্ধনীর নিচে, ওর অন্তর্বাস, বক্ষবন্ধনীর মতোই আঁটোসাটো আর স্বাস্থ্যসম্মত।

ও নিচু হয়ে ওই লাল ফোলা জায়গাটায় চুমু খেল। লিভা গাড়ির ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে ববির মাথার ওপরে রাখল। ও এখন সতর্কভাবে ওর সার্টটা উঁচু করে আছে, যাতে ববির মাথাটা না ঢেকে যায়; আর ও একদম স্থির হয়ে রইল, যাতে ববির অসুবিধা না হয়।

ববি ফোলা জায়গাটায় আরেকবার চুমু খেয়ে বলল, “এখন কি ভালো লাগছে?”
“হ্যাঁ, এখন ভালো লাগছে।”

ববি মাথা সরিয়ে নিল। লিভা সোজা হয়ে বসল, সার্টটা নামিয়ে দিল।

“আশা করি আমার অভিপ্রায় ভুল বুঝেননি,” ববি বলল।

“ওঃ ববি, যা ঘটল, তা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ব্যাপার।”

“ওঃ প্রিয়,” ববি গাড়ি স্টার্ট করে বলল, “তুমি এমনভাবে বলছ, যেন এটা সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো ব্যাপার।”

“মেয়েরা সব কিছু বিশ্বাস করতে পারে।”

ও একটু রুঢ় ভাবেই বলল। অবশ্য ববি এটাই আশা করছিল। এতে পরস্পরের মেজাজে একটা সমতা এসে গেল। আর এভাবেই, বন্ধুর মতো, পরস্পরের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে ওরা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ বেশ অন্ধকার করে এল। কালো, জল-ভরা মেঘগুলো নিচে নেমে এসেছে; সবুজ মাঠের ওপর থেকে আলোর শেষ রেখাটুকু মুছে গেল। তারপর বৃষ্টি নামল, মুষলধারে, ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে, পীচের রাস্তাকে বৃষ্টির ধারায় সাদা করে দিয়ে। সব দৃশ্য মুছে গেছে, শুধু বৃষ্টি। গাড়ির ভেতরটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠল।

“এই আঁচড়গুলো,” ববি বলল, “জানি, এগুলো আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। একবার আমার মা’র কুকুরটা আমাকে কামড়েছিল। কী হৈ চৈ হয়েছিল, তুমি ভাবতে পার? আমার, আমার মা’র আর বেচারী কুকুরের কী দুর্দশা। ভালোই কামড়ে ছিল। অবাক কাণ্ড, শুকিয়ে যাওয়ার পর শুধু দুটো সমান্তরাল দাগ রয়ে গেল, আমার পায়ের ডিম-এর ঠিক নিচে। কুকুরটা কবে মরে গেছে। কিন্তু ওই দাগ এখনও আছে, আর জান, ওই দাগগুলো আমার ভালোই লাগে।”

খানিকক্ষণ পরে আবার বলল, “একজন ডাক্তার একবার আমাকে স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমনের ওষুধ দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আগে। আমার পুরোনো অসুখটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল আর ভেবেছিলাম, আবার হয়তো আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটে যাবে। মনে হয়, এই ভয়টা কোনোদিন যাবে না।”

“স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের ওষুধ! ওরে বাবা, তুমি এই ওষুধ খাও না কি?”

“শোন। উনি আমাকে এই ওষুধগুলো দিয়েছিলেন। দেখতে একেবারে নির্দোষ, ছোট ছোট সাদা ট্যাবলেট। আমার ওপরে এই ওষুধের ফল হয়েছিল অদ্ভুত। তিনদিন পরে— তুমি কি সত্যিই শুনতে চাও?” ও হাসল।

“হ্যাঁ।”

“তিনদিন পরে ওরা আমার লিঙ্গের ডগার দিকের চামড়াটা পুড়িয়ে দিল।”

লিভা একদম ইতস্ততঃ না করেই বলল, “কী কষ্ট হয়েছিল তোমার!”

“একদম পুড়িয়ে দিয়েছিল।” ও তখনও হাসছে।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

“এটা অদ্ভুত,” ববি বলল, “আমি এখানে আসার আগে পর্যন্ত গাড়ি চালানো শিখিনি। কিন্তু আমার অসুখের সময়, আমি একটা উদ্ভট কল্পনা করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম যে, আমি যেন একটা ঠাণ্ডা, বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, মাইলের পর মাইল, তারপর এসে পৌঁছলাম পাহাড়ের ওপর একটা কুটিরে। সেখানে আগুন জ্বলছে, ঘরটা গরম হয়ে রয়েছে আর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছি।”

“বাইরে বৃষ্টি, ভেতরে আগুন, খুব রোমাঞ্চকর।”

“সন্দেহ নেই। দারুণ রোমাঞ্চকর। কিন্তু এই কল্পনাটা আমাকে অনেক আরাম দিয়েছে।” ওর গলায় একটু ভর্ৎসনার সুর। “তারপর আমি দেখলাম, একটা ঘরের মধ্যে আছি। সব কিছু একদম সাদা। সাদা পর্দা, হাওয়াতে ফুলে ফুলে উঠছে। সাদা দেওয়াল, সাদা বিছানা। প্রচুর লম্বা-লম্বা জানালা, সব খোলা। বাইরে, সবচেয়ে সবুজ পাহাড়, আর একদম নিচে, দারুণ নীল সমুদ্র।

“এটা যেন একটা গ্রিক দ্বীপের হাসপাতালের মতো শুনতে লাগছে।”

“মনে হয় তাই। একটা ইচ্ছা, সব কিছু ছেড়ে দেবার, কিছুই না হবার, কিছুই না করার। শুধু নিজেকে একটা ভূত হয়ে যেতে দেখা। আমি রোজ ওই ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম। এবং প্রতি রাত্রেও। আমার বিছানার পাশে কোনো টেবিল ছিল না। আমার ঘড়িটা আমি মেঝেতে রাখতাম। একদিন সকালে আমার পায়ের চাপে ঘড়ির কাচটা ভেঙে গেল। আমি ওটা সারাতে চাইলাম, কিন্তু পরে মত পাল্টালাম আর ঠিক করলাম, আমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত ঘড়িটা সারাব না।”

“ব্যাপারটা বেশ ভয়ের।”

“একটা ভাঙা ঘড়ি পরে ঘুরে বেড়ানো। এক ধরনের অসুস্থতা। কিন্তু সবচেয়ে ভীতিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কত তাড়াতাড়ি তুমি মেনে নিতে পার যে তোমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। প্রথমদিকে আমি নিজেকে বলতাম, ‘আসছে সপ্তাহে আমি ভালো হয়ে যাব’ তারপর ওটা হয়ে গেল আসছে মাস, তারপর, আসছে বছর।”

“বিদ্যুতের শক্ দিয়ে একটা চিকিৎসা আছে না?”

“স্নায়বিক উত্তেজনার ওষুধের মতো। আমি কোনো কিছুই জানতাম না। আমি ভাবতাম মানসিক রোগের চিকিৎসা একটা আমেরিকান রসিকতা আর একজন মনোবিদ হচ্ছেন, ‘স্পেলবাবউন্ড’ সিনেমার ইনগ্রিড বার্গম্যানের মতো কোনো লোক।

“মিলে যাচ্ছে। সিনেমাটা দারুণ ছিল, না?”

“ছিল তো। অবশ্য তুমি শক্-এর ব্যাপারটা ঠিকই বলেছ। ওতেই আশ্বে আশ্বে ভালো হতে লাগলাম। এই যে মনস্তত্ত্ববিদের কাছে যেতাম, উনি নিজের বাতরোগ সারিয়েছিলেন, নিজেকে দিনরাত নিজের মৃত্যুভয়ের কথা বলে বলে। একদিন উনি আমাকে বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রী আপনাকে পাড়িতে করে শহরে পৌঁছে দেবে।’ আমি ওঁর স্ত্রীকে কখনও দেখিনি। আমি বসবার ঘরে বসে বসে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন ওইরকমই। কোনো চিকিৎসা করার ঘর নেই, শুধু ওঁর বাড়িটাই। হুমত আমার অন্য কোনো জায়গায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আমি মহিলাকে অন্য কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম। আমি শুনলাম উনি বেশ স্পষ্ট গলায় বলছেন, ‘আমি আপনাকে নিতে পারব না। আর্থার-এর একজন কমবয়েসি খ্যাপা-কে নিতে হবে’ মহিলা জানতেন না যে, আমি ওখানে বসে আছি। আমি ভেবেছিলাম, ডাক্তারকে আমি যা কিছু বলেছি, সবই গোপনীয়। আমার জীবনে আর কাউকে আমি এত ঘৃণা করিনি। আমি সত্যি সত্যিই ওদের দুজনের মৃত্যুকামনা করছিলাম। যদিও এটা ঠিক নয়, কারণ উনি আমার ভালোই চিকিৎসা করেছিলেন। মনে হয়, না জেনেই আমি ভালো হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই শক্টা, তুমি যেমন বললে, আমাকে প্রয়োজনীয় ধাক্কাটা দিয়েছিল।”

লিভা আঁচড়-কাটা কাচের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকাল।

“আর্থার-এর একজন কমবয়েসি খ্যাপা,” ববি হাসল।

লিভা কোনো কথা বলল না।

ববি বুঝল, ও লিভাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে আর ওর মনে কষ্ট দিয়েছে। ও একটু আক্রমণাত্মক ঢং-এ বলল, “মনে হয় না, তোমাকে অবাক করার মতো কিছু বলেছি।”

“আমরা মারাত্মক সব জিনিস করি,” ববি কিছুক্ষণ পর বলল, ওর মুখের হাসি মুছে গেছে, গলার স্বর পালটে গেছে, “আমরা মারাত্মক সব জিনিস করি, নিজের কাছে এটা প্রমাণ করতে যে, আমি একজন ঝাঁটি লোক। আমাকে রীতিমতো ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

“জনসাধারণের মনোভাব প্রচুর পালটে গেছে।”

“জানিনা কেন। ইংরেজ খ্যাপাদের আমি ঘেন্না করি। ওরা ভয়ঙ্কর, অশ্লীল। তারপরই অবশ্য, আমি থ্রেপ্তার হয়ে যাই। এক শনিবার রাতে, সচরাচর যেখানে যেতাম, সেই জায়গায়। পুলিশটা অবশ্য খুব ভালো ব্যবহার করেছিল। ও আমাকে ‘সংস্কার’ করতে চেয়েছিল। ব্যাপারটা হাস্যকর। ও আমার মনে কাম জাগাতে চেয়েছিল। যেন ধর্ষণ করার জন্য উত্তেজিত করছিল। এক সময় আমার এমনও মনে হয়েছিল যে, ও হয়ত পকেট থেকে ওর মানিব্যাগ বার করে তার মধ্যে থেকে অশ্লীল ছবি বার করে আমাকে দেখাবে। কিন্তু ও সাধারণ ব্যাপারগুলোই করেছিল। আমার কাছ থেকে খুব সাবধানে আমার রুমালটা নিয়ে নিয়েছিল। আমার রুমাল! আমার লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত ছিল, আমার রুমালটা ছিল এত ময়লা। সোমবার সকালে আমার মামলাটা কোর্টে উঠল। বেশ্যাগুলোর পর। দোষী, দোষী, দোষী; দশ পাউন্ড, দশ পাউন্ড। আমি হাকিমকে বললাম, আমি ‘মুহুরের উত্তেজনা’য় করে ফেলেছি। এতে একটু চাপা হাসির আলোড়ন উঠল আর আমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, আমি বোকামি করে ফেলেছি। তা সত্ত্বেও, আমাকে তাড়াতাড়িই মুক্তি দেওয়া হল আর আমি প্রথম ট্রেনটা ধরেই অক্সফোর্ড-এ চলে এলাম। ও হ্যাঁ, আমার এই লন্ডনের দুরন্ত সপ্তাহান্তের পর আমি সময়মতই অক্সফোর্ড-এর হলে লাঞ্চে হাজির হতে পেরেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ডেনিস মার্শাল তোমাকে সব বলেছে। আমি ‘ভেঙে পড়ে’ ওর কাছে কিছুদিন আগে ‘স্বীকার’ করেছিলাম। আমি সবসময়েই বিপদের মধ্যে পড়ি, তারপর ভেঙে পড়ি এবং শেষকালে দোষ স্বীকার করি। আমার চরিত্রের এটাই মেয়েলি স্বভাব। ডরিস মার্শাল সাউথ আফ্রিকায় আমার মতো লোকেদের সঙ্গে কী করে, তা কি বলেছে? ওরা আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দেয়, আমাদের দেশি আদমি বলে শ্রেণী বিভাগ করে, তারপর আমাদের পোশাক পরিয়ে দেশি আদমিদের কোয়ার্টারে বসবাস করবার জন্যে পাঠায়।”

লিভা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল।

“দুঃখিত, সমানে বকবক করে গেলাম আর তোমার মন খারাপ করে দিলাম।”

“আমি রাস্তার কথা ভাবছিলাম,” লিভা বলল, “কাদা খুব বেশি না হলেও, রাত আটটা-নটার আগে আমরা এলাকায় পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমি ভাবছি, আমাদের দ্রুত মনস্থির করতে হবে, কর্নেল এর ওখানে ঘুরে যাব কিনা।

আমার মনে পড়ছে, উপনিবেশ স্থাপনকারীদের একটা প্রবচন আছে যে, কোথাও যাবার লক্ষ্য স্থির করলে, সেখানে চারটের মধ্যে পৌঁছতে হয়। আর এখন আড়াইটা বাজে।”

“এখনও পর্যন্ত শুনি নি যে, কালেক্টরেটে যাওয়ার পথে কেউ উপোস করে মরেছে।”

“আমাদের শিগগিরই মনস্থির করতে হবে। রাস্তার বাঁকটা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।”

“এ ব্যাপারে অন্যজনেরও কিছু মতামত থাকতে পারে, সেটা জানার দরকার নেই, তাই না?”

“আমি বরাবরই ভাবতাম যে, বুড়ো কর্নেল বেশ মজার লোক,” লিভা বলল, “আর এই রকম বাজে আবহাওয়ায় লেকটা আমি দেখতে চাই।”

“একথা ভেবে ভালো লাগছে যে, আমি অশ্রুত তোমার মন খারাপ করে দিইনি। এটা বেশ ভালো, তাই না?” ববি বলল, দ্বিতীয় বাক্যটা বাইরে নিসর্গদৃশ্য দেখে। “বৃষ্টির মধ্যেও, যেমন তুমি বলছ।”

“‘সারারাত্রি’ গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ের ওপর তোমার ছোট বাড়িটায় যাওয়া।”

“হা ঈশ্বর, দেখছি কথাটাকে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। ডেনিস মার্শাল-এর চুক্তিটা যে নবীকরণ হচ্ছে না, তার জন্যে আমার যে দুঃখ হচ্ছে, একথা বলব না। কিন্তু আমার মনে হয়না যে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, একথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব।

“আমার মনে হয়, এতে কিছুই যায় আসে না, ববি।”

“বুসোগো কেসোরো আমার কাছে কাগজগুলো এনেছিল। তা, আমি কী বলতে পারি? আমরা আফ্রিকানদের ভেতর কত দুর্নীতি, তাই নিয়ে কত কথা বলি। আর তাছাড়া, আমার আনুগত্যই বা কার প্রতি?”

“ডরিস মার্শাল বেশ মজার লোক হতে পারে। কিন্তু ও কী বলে, তাতে অন্যরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না।”

“আমার এতে হাসি পায়। কিছু লোক আছে যারা সারাক্ষণ দেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে লোকের সমালোচনা করে বেড়ায়। আর তাদের নিজেদের যখন চলে যেতে হয়, সেটা হয়ে যায় অন্য গল্প।”

“আমার মনে হয়, কথাটা আমার পক্ষে সত্যি।”

“আমি তা ভেবে বলিনি। তোমাকে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।”

“তুমি কেন দুঃখিত হবে?”

ববি বলতে পারল না যে, ও দুঃখিত, কারণ, ওরা একসঙ্গে গাড়িতে রয়েছে এবং কারণ, ও ওর কাছে স্বীকারোক্তি করেছে, আর কারণ, ও এখন ববি কীরকম লোক, তার সঠিক ধারণা সবসময়ই করতে পারবে।

ও বলল, “আমি দুঃখিত, কারণ, এটা তোমার কোনো কাজে এল না।”

“তোমার কাছে এটা আলাদা, ববি।”

“তুমি এই কথাই বলে চলেছ।”

“শোন, আমার মনে হচ্ছে, রাস্তাটা বোধ হয় ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।”

দুই রাস্তার সংযোগস্থলে, রাস্তার ওপরেই এবং রাস্তার দু’পাশের মাঠে পোশাকধারী পুলিশ হাতে রাইফেল নিয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। সংযোগস্থলের পরেই ঘননীল রঙের পুলিশের জীপগুলো কালেক্টরেটে যাবার হাইওয়ে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাদা কাঠের বেড়া থেকে একটা লাল লন্টন ঝুলছে; আর একটা লম্বা সাদা তক্তার ওপরে আঁকা একটা কালো তির পাশের রাস্তাটার দিকে নির্দেশ করছে, যেটা সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

পাহাড়ে যাবার রাস্তাটা পরিষ্কার। কোনো পুলিশম্যানই ববিকে দাঁড় করালো না। কিন্তু ববি নিজে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার অবরোধের বেড়া আর পুলিশের জীপগুলোর প্রায় পঞ্চাশ ফুট পেছনে দুটো ভারী কাঠের তক্তা হাইওয়ের ওপর আড়াআড়ি ফেলা আছে। তক্তা দুটোর ওপর ছ’ইঞ্চি লোহার কাঁটার দুটো সারির ওপর বৃষ্টির ফেনা নাচছে। তারও প্রায় একশ গজ পরে, হাইওয়েটা বাঁক নিয়েছে আর নিচু নিচু ঝোপের আড়াল পড়ে গেছে, সেখানে প্রায় আধডজন সেনাবাহিনীর লরি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পেছনদিকের তক্তায় রেজিমেন্টের চিহ্ন আঁকা আছে।

ববি মুখে একটা হাসি টেনে এনে জানালার কাচ দিয়ে বাইরে আরম্ভ করল। জানালার ফ্রেম থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে, বৃষ্টিও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। একজন পুলিশম্যানও নড়ল না; একজনও জীপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল না। তারপর একজন মোটা লোক, একটা জীপের পেছন দিকে বসে আছে, খুবই অল্পবয়েসি, সামনে ঝুঁকল, ওর ঢোলা কোটের নিচে চকোলেট আর হলুদে ফুলফুল ছাপ সার্ট, আর অধৈর্যভাবে ববিকে হাত তুলে চলে যেতে নির্দেশ দিল; মনে হচ্ছিল, ও তখন খাচ্ছে।

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,” লিভা বলল। “আমার ভয় হচ্ছিল, আরেকটা তল্লাশী না হয়।”

“এসব ব্যাপারে ওরা খুব ভালো,” ববি বলল, “আমরা কারা, সে সম্বন্ধে ওদের বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে।”

“যাই হোক, অন্তত আমাদের মনটা ওরা তৈরি করে দিয়েছে,” লিভা বলল, “এখন কর্নেলের ওখানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার মনে হয়, সাইমন লুবেরো-র বিধি-সম্মত অধিকার এখানেই শেষ, তাই না? সেনাবাহিনী পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, মনে হচ্ছে। আশা করি, ওদের কোনো লরির সাথে আর আমাদের দেখা হবে না। ওরা ভীষণ শয়তান।”

“আমি সবসময়েই সেনাবাহিনীকে সম্মান দিয়ে থাকি।”

“মার্টিন বলে, যখনই তুমি কোনো সেনাবাহিনীর লরি দেখবে, তুমি রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে, যতক্ষণ না ওটা চলে যায়। ওরা স্রেফ মজা করার জন্যেও তোমাকে চাপা দিয়ে যেতে পারে।”

“ওরা এটাকে পুলিশের হাতে রাখলেই পারত,” ববি বলল, “আমি জানি যে, সাইমন নিজেও তাই চাইত।”

BanglaBook.org

কয়েকমাইল পর্যন্ত পাহাড়ের রাস্তাটা পিচঢালা এবং যে হাইওয়েটা ওরা ছেড়ে এল, সেটার মতোই চওড়া আর নিরাপদ। কিন্তু এই রাস্তাটা কোনো বাঁধের ওপর তৈরি করা নয়; এটা জমির সঙ্গে একই সমতলে চলেছে; আর এখানে, পাহাড়ের কাছে, জমিটা একেবারে সমতল হয়ে গিয়ে একটা হাল্কা ঢাল তৈরি হয়েছে, মসৃণ, একেবারে ফাঁকা, কোনো গাছও নেই। এই খোলামেলার মধ্যে, বেড়ার খুঁটি দেখা যাচ্ছে আর বৃষ্টি ধোওয়া রাস্তাটা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা, চাষের জমিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে সামনে। বৃষ্টিতে পাহাড় ঝাপসা হয়ে গেছে কিন্তু ওরা দৃষ্টিকে আড়াল করছে না; ওরা দৃষ্টিকে ওপরে তুলে ধরছে।

মাঠ, বেড়া; একটা মাটির রাস্তা আড়াআড়ি কেটে গেছে, একটা ধুয়ে-যাওয়া সাইনপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছড়ানো-ছিটানো উপনিবেশ, কংক্রিট আর রোদে শুকোনো ইটের রং-এর কাঠ; গাছ আর ঝোপঝাড়। রাস্তাটা এঁকেবঁকে ওপরে উঠছে। ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর তারপরেই, আর পিচঢালা নয়, কেবল অসমতল পাথুরে জমি।

চড়াই-এ উঠতে উঠতে ওরা যে উঁচু সমতল ভূমি এইমাত্র ছেড়ে এল, সেটা ওদের চোখে পড়ল। আর বৃষ্টির মধ্যেও ওরা বুঝতে পারল যে, জমিটা তারপরেই নিচে নেমে গেছে। কিন্তু তারপর যখন ওরা পাহাড়ের গভীরে ঢুকে পড়ল, তখন রাস্তার দু'পাশে কেবল ঝোপঝাড় ওদের নজরে এল। বাকগুলো এখন তীক্ষ্ণ, মাথার ওপরে ঝুলে পড়া শেকড় আর মাটির মধ্যে ভিজে পাথর চকচক করছে। মাঝে মাঝে অগভীর আগাছা-ভরা খাদে মাটি ধবসে পড়েছে, কখনও বা রাস্তার ওপরই অল্প-স্বল্প ধবস নেমেছে।

“সত্যিই, কোনটা বেছে নেব, সেটা বোঝা খুব শক্ত, “ববি বলল,” হাইওয়েতে একশ মাইল কাদার মধ্যে চলা, অথবা এইটা।”

শিগগিরই ওরা পাহাড়ের বেশ ভেতরে এসে গেল। মাঝে মাঝেই ওরা বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখতে পাচ্ছিল। যার ফলে, মাত্র আধঘণ্টা চড়াই ওঠার পরই মনে হল যেন ওরা পৃথিবীর ছাদের ওপর পৌঁছে গেছে, মহাদেশের হৃদপিণ্ডের মাঝখানে। সূর্য এবং ঝোপঝাড়, সোজা কালো রাস্তা, টায়ারের হিস্ শব্দ, উজ্জল সবুজ মাঠের ওপর আলোর খেলা; এসব যেন অন্য দেশের, অন্য পৃথিবীর। গাড়ি পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফাচ্ছে, কখনও দীর্ঘ পথ ছাই ঢাকা রাস্তা, গাড়ির চাকায় প্যাচপ্যাচ শব্দ হচ্ছে, গাড়িতে আওয়াজ হচ্ছে, নিচু

গিয়ারে গাড়ি ঘটঘট শব্দ করছে, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে উঠছে। কেউ কোনো কথা বলছে না, অন্য গাড়ির শব্দ শোনার চেষ্টা করছে, প্রতিটি অন্ধ বাঁকের মুখে সেনাবাহিনীর লরির আশঙ্কা, ববি আর লিভা আবদ্ধ রাস্তার ওপর মনঃসংযোগ করছে।

এখন মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে কুটির দেখা যাচ্ছে আর ছোট ছোট বৃষ্টির জলে ভরা পুকুরে বুনো লিলি ফুল চোখে পড়ছে। কখনও রাস্তার একদিকে জমিটা হঠাৎ নেমে গেছে আর রাস্তার ধারের গাছগুলোর কালো কালো কাণ্ড আর নিচের দিকের ভিজে, কালো ডালপালা, পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে, একটা ধূসর-সবুজ উপত্যকার দৃশ্য যেন ফ্রেমের মধ্যে ধরা আছে;’ মাঝখানে ধাপ-কাটা টিলা, প্রত্যেকটা টিলার ওপরে একটা ছোট বেড়া-দেওয়া ঘাসের কুটিরের দিকে উঠে যাওয়া লাল মাটির রাস্তা, অন্য গোপন কোনো উপত্যকার দিকে ঐক্যবাক্যে চলে যাওয়া রাস্তা।

“এর কথাই আমি ভেবেছিলাম,” লিভা বলল, “আমি কখনোই আশা করিনি যে, এখানে মাঠ-প্রান্তর থাকবে অথবা ওই সমস্ত টিলা, একেবারে চূড়া পর্যন্ত ধাপ কেটে রাখবে। আমি ওইসব রাস্তার কথা ভাবিইনি, আর কখনোই ভাবিনি যে, এটা দেখতে এত পুরোনো এবং অধ্যুষিত মনে হবে।”

“এই জমি আমরাই ওদের জন্যে রেখেছিলাম,” ববি বলল।

লিভা সীটে হেলান দিয়ে বসে, কালো চশমাটা খুলল। ববি দেখল যে, ও বৈঠক কথা বলে ফেলেছে এবং ওর কথার ভুল অর্থ হতে পারে।

“এখন এ সব ভাবা অর্থহীন,” ও সঙ্গে সঙ্গেই বলল, “আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আমি আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওরা লোহা নিয়ে কাজ করছে। কেউ আমাকে এসব কথা বলেইনি। আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি জান যে, যদি তুমি একটুকরো ধাতু ফেলে রাখ—”

“অত পুরোনোও নয়। এক রাতের মধ্যেই তোমার গাড়ি হাওয়া হয়ে যেতে পারে, শুধু সীটগুলো পড়ে থাকবে, গাড়িটা যে ওই জায়গায় ছিল, তারই নিদর্শন হিসাবে। এরা এক সপ্তাহের মধ্যে একটা বোয়িং প্লেন হাতিয়ে নিতে পারে।”

ববি রসিকতাটা জানত, তবু হাসল, “মনে হয় আমি যখন এখানে এসেছিলাম, আমার একটু একটু মনে হয়েছিল যে, এরা আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে, কারণ আমি সাদা চামড়ার লোক আর ইংরেজ এবং অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এই রকম ব্যাপারের জন্যে।”

“এরা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে গ্রাহ্যই করে না।”

“ঠিক তাই। চূড়ান্ত মার্জিত রুচি বোধ। ওরা হাসে।”

“স্যামি কিষণজী আমায় বলছিল যে, এর কারণ হল, ওরা দারুণ রেগে আছে।”

“স্যামি বাড়িয়ে বলে, রাজনীতিবিদদের মতো। স্যামি মাঝে মাঝে এই জাতিগত ব্যাপারগুলো করতে ভালোবাসে। আসলে ও একটু পরীক্ষা করে দেখে। অবশ্য এটা বিরক্তিকরও বটে। এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক, তৃতীয় বিশ্বের ঢং আমি সহিতে পারি না। তুমি পারো? এই ব্যাপারটা ও ইংল্যান্ডে থাকার সময় শিখেছে। এটা ওর বৈশিষ্ট্য নয়। লোকে বলে, স্যামির নাকি ইংল্যান্ডে সময়টা ভালো কাটেনি।”

“তার ফলে ওর মধ্যে এই সাদা চামড়ার মেয়েদের ব্যাপারটা এসে গেছে। অন্ধ, কানা, খোঁড়া, কেউই নিরাপদ নয়।”

“ব্যাপারটা খুবই মর্মস্বন্দ। জানি না, আমরা এরকম কত স্যামি তৈরি করছি।”

“মর্মস্বন্দ? এটা ভয়াবহ। স্যামি ভাবে, ওর আকর্ষণ সাংঘাতিক, কারণ ও কালো আর মোটা। ও মনে করে ইংল্যান্ডে থেকে ও ইংরেজদের কী করে ‘কায়দা’ করতে হয়, শিখে গেছে। সত্যিই ও কিন্তু বিশ্রিভাবে জড়িয়ে গেছে।”

“স্যামি হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম। আমি মনে করি, সাধারণ আফ্রিকানদের আমি এই জন্যে পছন্দ করি যে, ওদের ভেতর এই পরীক্ষা করে নেওয়ার ব্যাপারটা নেই। তুমি যেমন, ওরা তেমনভাবেই তোমাকে গ্রহণ করবে। ডরিস মার্শালই সঠিক। এর জন্যে আমি ডেনিস-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। ওই আমাকে এখানে আনিয়োগেছে। যখন বয়স কম থাকে, তখন আমরা কত কী করি। এল সি সি পরীক্ষায় বসি, কারণ সবাই এই পরীক্ষা দিচ্ছে, হেডলে-তে আবেদন করি, কারণ সবাই আবেদন করছে। মনে হয়, এটা এক ধরনের হিস্ট্রিয়া। কত জিনিস আমরা সঠিকভাবে, সুন্দরভাবে করতে পারি। কত জিনিস, জানি যে, যথেষ্ট নয়, তবুও করি। দেখে মনে হয় একদম স্থির, কিন্তু আসলে ভেসে যাচ্ছি। আমি যথেষ্ট লড়াই ছিলাম না। অক্সফোর্ড-এর পরে, আমি আরোগ্য লাভ করেই খুশি ছিলাম। কখনো ভাবিনি যে, নিজেকে একটা মানুষ হিসাবে পুরোপুরি ব্যবহার করতে চাইব। জানি, এটা ঠিক বোঝানো যাবে না, আর যা কিছুই বলি না কেন, এখানে তার অর্থ মনোভাবে করা হবে। আশপাশে এমন প্রচুর লোক আছে, যারা জানে কীভাবে সঠিক আওয়াজ তুলতে হয়।”

“ব্যাপারটাকে কত কঠিন করে তুলছ, ববি।”

“কীভাবে?”

“লোকে নানারকম কারণে চাকরি নেয়। শুধু অবাক হয়ে যাই, লোকে যে জায়গায় বাস করে, সে জায়গা সম্বন্ধে কি এত কথা বলে, যতটা তারা আফ্রিকা সম্বন্ধে বলে?”

“অক্সফোর্ড। অক্সফোর্ডে থাকা ছাড়া লোকে অন্য কোনো কথাই বলত না।”

“মনে হয়, আমরা সঠিক আওয়াজ তোলার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছি। প্রথম দিন থেকেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এই দেশটা আমাদের জন্য নয়, আর তাই, আমাদের সাহস করে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।”

“কিন্তু তোমার তো এখানে ছ’বছর হয়ে গেল।”

“যেমন মার্টিন বলে, যে সমস্ত মিথ্যা কথা আমরা নিজেদেরকে বলি, কেবল সেই সব মিথ্যার জন্যই আমরা শাস্তি পাই।”

“আর, তোমরা সত্যিই দক্ষিণে চলে যাচ্ছ?”

“এটা একটা ভাবনা মাত্র। আর চারবছর বাদে মার্টিনের বয়স হবে পঞ্চাশ। মনে হয়, আমরা ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারব, আর তারপর মার্টিন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। মার্টিন বলে, যদি তুমি মনে কর তুমি একজন ভাড়াটে, তাহলে তুমি তাই। কিন্তু তাই বলে, ছে’চল্লিশ বছর বয়েসে তুমি নতুন করে কিছু শুরু করতে পার না। আর মার্টিন আসলে স্বাধীনচেতা শ্রেণীর লোক নয়। তাছাড়া, ও ঠিক লড়াই-ও নয়।”

গাড়ি ঝাঁকানি খাচ্ছে, লাফাচ্ছে। গাছ থেকে জল ঝরে পড়ছে। কালো, ঝুলে পড়া পাতার মধ্যে দিয়ে ওদের চোখে পড়ল বহুদূরের পাহাড় চূড়ার মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ি লেক, ধূসর-বর্ণ, আকাশটার মতো। রাস্তার ধারের একটা জ্যাকারাণ্ড গাছ থেকে সম্প্রতি তার বেগুনি-লাল ফুল ঝরে পড়েছে, যেন পাথরের আর কাদার ওপর সূক্ষ্ম রঙ-এর তুলি বোলানো হয়েছে; ওরা তার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

“আমার জীবন তো এখানেই।”

“ববি!”

রাস্তাটার ঠিক ওপরে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের গায়ে একটা পায়-চলা পথে প্রায় এক ডজন আফ্রিকান চকচকে নতুন সুতির গাউন পরে একজনের পেছনে আরেকজন, এমনিভাবে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিল, বড় বড় পাতা দিয়ে মাথা ঢেকে। ওদের সুতি কাপড়ের চকচকে রঙ আর মাথার ওপর পাতা, ওদের প্রায় ছদ্মবেশধারীর মতো চোখে পড়ছিল না। ওরা গাড়িটার দিকে তাকিয়েও দেখল না।

“এই রকম জিনিস দেখলেই আমার নিজেকে দেশের থেকে বহুদূরে আছি বলে মনে হয়,” লিভা বলল, “আমার মনে হয়, এই শরণের জঙ্গলের জীবন অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।”

“তুমি বড় বেশি কনরাড-এর বই পড়ছ। ওই বইকে আমি ঘেন্না করি, তুমি কর না?”

“তুমি কি মনে কর, ওরা হয়ত কোনো বিয়েতে যাচ্ছে অথবা কোনো বার্ষিক সাধারণ সভাতে?”

“এখন আবার তুমি ডরিস মার্শাল-এর মতো কথা বলছ।”

“ঠিক আছে।”

“আমি ডেনিসকে ভালোবাসতাম। ও আমার জন্যে যা করেছে, তার জন্যে আমি চিরজীবন ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কলেজের অনুষ্ঠানে ওর সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটাই আমার জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। আমার মনে হতে লাগল যে, আমি আবার নিজেকে ব্যবহার করতে পারি। ও আমাকে এখানে চাকরি করে দিল, আর আমার মনে হয় ও-ই আমাকে শিখিয়েছিল, এই দেশটাকে কেমনভাবে দেখতে

হবে। কিন্তু ও চেয়েছিল আমাকে অসহায় করে রাখতে, যাতে ওর মাধ্যমেই আমাকে চলতে হত। ও ক্রমাগত বলত যে, আমি আফ্রিকানদের বুঝতে পারিনা আর আমার হয়ে ও-ই ওদেরকে সামলাবে। কিন্তু আমি যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করলাম আর সর্বত্র ঘুরতে লাগলাম, তখন সেটা ওর পছন্দ হ'লনা। এমন শিশুর মতো সরল লোক। ও আমাকে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে চেয়েছিল। যখন ও আবিষ্কার করল যে, আমি আফ্রিকানদের সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শে আসতে কোনো আপত্তি করিনা, তখন ও পাগল হয়ে গেল।”

“তোমাদের দুজনের কেউই বিচক্ষণতার পরিচয় দাওনি।”

“ও আফ্রিকার সেবা করার কথা খুব বলত। আমার যে কীরকম মন ভেঙে গিয়েছিল, বলে বোঝাতে পারব না। আর তারপরেই ও আমার বিরুদ্ধে এই প্রচার আরম্ভ করল। আমি ভেবেছিলাম, আমি খতম হয়ে গেছি। কিন্তু তখনই আমি ওগুণ্ডা ওয়াঙ্গা-বুতেরে এবং বুসোগো-কেসোরোকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করলাম। ওরা বুঝতে পেরেছিল, ডেনিস কী করতে চায়।”

“আমি আর শুনতে চাই না।”

“ওরা সব ওই রকম।”

হঠাৎ ববির উত্তেজনা মরে গেল। ওর মনে হল, ও স্বীকারোক্তি করার আর বন্ধুত্বের মেজাজটাই নষ্ট করে দিয়েছে, আর লিভাকে হারিয়ে ফেলেছে। ও বড় বেশি বলে ফেলেছে; কাল সকালে ওর যথেষ্ট অনুশোচনা হবে; লিভা হবে সেই রকম একজন লোক, যার কাছ থেকে ওকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। ও মুখটা শক্ত করল, একটা নির্বাক লোক হয়ে গেল।

পাহাড়ের ধারে ওরা আরো আফ্রিকানদের পার হয়ে গেল। লিভা বিস্ময়সূচক কোনো আওয়াজ করল না, বা ওদের দিকে আঙুল তুলে দেখাল না। ববি পুরোনো মেজাজ ফিরিয়ে আনার জন্য কথা খুঁজতে লাগল। আধঘণ্টা আগেও ওর কত কথা বলার ছিল; আর এখন নতুন কোনো কথা অসহায় আসছে না। ও বুঝতে পারছে লিভা ভর্তসনার মেজাজে ওর পাশে বসে আছে, আর তাই ও যা যা এতক্ষণ বলেছে, সেই কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছে, কোন কথাগুলো লিভাকে খুশি রেখেছিল।

“আমার মনে হয়,” ও বলল, “আমি এই রকম গাড়ি চালানোরই স্বপ্ন দেখতাম। পাহাড়, বৃষ্টি, বন-জঙ্গল। আমার কাছে এটা বার্গমান দেশ।”

রাস্তার পাশে হলুদে কাঁচা মাটির টিবি দেখা যেতে লাগল। কখনও কখনও রাস্তার ওপরেও। কিছুক্ষণ আগে ভারী গাড়ি চলে গেছে এবং তাদের চাকায় মাটির টিবিগুলোকে চটকে ছিটকে দিয়ে পুরো রাস্তা কদমাজ্ঞ করে দিয়েছে। সর্বত্র হলুদ রঙের ছোট ছোট নদী। অনেক নিচে একটা ধূসর-সবুজ উপত্যকা, বৃষ্টিতে ঝাপসা। উপত্যকার মধ্যে অনেক ছোট ছোট ছুঁচলো টিলা, প্রত্যেকটাতেই ধাপ-কাটা, প্রত্যেকটাতেই ঘাসের বেড়ার পেছনে একটা করে ঘাসের কুটির; আর কুটিরগুলোর

দিকে, উপত্যকার নিচের অংশ জুড়ে অস্পষ্ট বাদামি রং-এর পথ-রেখা দেখা যাচ্ছে, যেন পরীর দেশের পথ-ঘাট।

“আমি দিনের পর দিন এই রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে গেছি আর ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি সেই সাদা ঘরটিতে—”

“ববি!”

ওরা হড়কাচ্ছে, পিছলাচ্ছে, গড়াচ্ছে, প্রথমে বাঁ দিকে, গাড়ির পেছনটা একটা মাটির ঢিবিতে ধাক্কা খেল, পাহাড়ের গা-টা যেন ওদের দিকে ছুটে আসছে, তার পরেই ডান দিকে, উপত্যকাটা একেবারে পরিষ্কার সোজা ওদের নিচে, আর তখনই শুধু এইটুকু জানা যে, ওই মাটির ঢিবিগুলোই রাস্তার প্রাপ্ত থেকে নিচে পড়তে দেবে না, ববিকে আতঙ্কগ্রস্ত হতে দিল না। তারপর গাড়ির গতিটা হয়ে উঠল, অবাস্তব, খামখেয়ালি; গাড়িটা সহসা মনে হল ভঙ্গুর; প্রত্যেক দোলানির সময়ই মনে হচ্ছে, এইবার বুঝি উলটে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত যখন গাড়িটা থেমে গেল, তখন গাড়িটা পাহাড়ের দেওয়ালের পাশে একটা খানাতে কাত হয়ে পড়ে আছে, যে দিক থেকে আসছিল, সেই দিকেই গাড়ির মুখ, রাস্তার ধারের কোপঝাড়-এর মধ্যে, গাছের ভাঙা কালো কালো ডালপালা আর ভিজে পাতার রাশি বাঁ দিকের জানালার কাচ ঢেকে ফেলেছে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে; ওরা গাছের পাতায় আর গাড়ির ওপর বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

ববি গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল, গিয়ার দিল। গাড়িটা একটু লাফিয়ে উঠল আর ওরা শুনতে পেল, কাদার মধ্যে ঘুরে যাওয়া চাকার আর্দ্র শব্দ। ও আবার চেষ্টা করল। এবার আর গাড়িটা লাফাল না, কেবল চাকার মৃদু আর্দ্র শব্দই শোনা গেল।

ববি নিজের দিকের দরজাটা খুলল। বৃষ্টি, পাহাড়, হাওয়ার সমবেত কলরোল উঠল। নিচু হয়ে ঝুঁকে ও রাস্তার ওপর উঠল, জ্বর হল্লে দেশি জামা, প্রথমে ওর চটপটে নড়াচড়ায় নাচ করতে শুরু করেছিল, শিগগিরই নেতিয়ে গেল আর বৃষ্টিতে ভিজে কালো হয়ে উঠল।

“গাড়িটার কোনো ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না,” ও লিভাকে বলল। “মনে হচ্ছে একটু ধাক্কা মারলেই হবে। তুমি হুইল ধর।”

“আমি গাড়ি চালাতে জানিনা।”

“কাউকে তো ধাক্কা মারতেই হবে।”

“যে সব আফ্রিকানদের আমরা যেতে দেখেছিলাম, ওদের কেউ আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না?”

“ওরা কত মাইল পেছনে পড়ে আছে। ওরা যতক্ষণে এখানে এসে পৌঁছবে, ততক্ষণে আমরা এখানে একদম আটকে যাব।”

লিভা ববির দিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে এল, আর ওই ঘুরন্ত চাকাগুলোর পেছনে খাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ও গাড়িটা ধাক্কা দিল, তারপর ববির নির্দেশে

গাড়িটাকে দোলানোর চেষ্টা করল, আর তারপর স্রেফ গাড়িটাকে চাপড় মারতে লাগল। ববি ঠিক করল, ব্যাক গিয়ার দিয়ে চেষ্টা করবে। লিভা সামনে থেকে ঠেলতে লাগল। ব্যাকগিয়ারেই শেষ পর্যন্ত কাজ হল। গাড়ির চাকাগুলো কাদা থেকে মুক্ত হল আর ববি গাড়িটাকে ফের রাস্তায় নিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে ববি যখন গাড়িটার মুখ ঘুরিয়ে যে দিকে যাচ্ছিল, সেদিকে করার চেষ্টা করছে, লিভা রাস্তার এদিকে একবার, ওদিকে একবার, ঘুরে ঘুরে গাড়ি ঘোরানোর নির্দেশ দিচ্ছে, ওর হাঁটু পর্যন্ত কাদায় কাদা, সার্ট ভিজে, ব্রেসিয়ার দেখা যাচ্ছে, চুল ভিজে সঁয়াতসেতে, দুই হাত কাদায় মাখামাখি, চটচটে হয়ে আছে, সেই সময় গাড়ির ধোঁয়া বোরোনোর পাইপটা একটা কাদামাটির স্তূপে ধাক্কা খেল আর গাড়িটা থেমে গেল। ওরা দুজনেই তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাইপটা পরিষ্কার করবার জন্যে একটা সরু লাঠি খুঁজতে লাগল। ফাঁকা গাড়িটা ওই সংকীর্ণ রাস্তাটায় একটা অসমঞ্জস কোণা করে আটকে আছে, গাড়ির আরোহীরা জলে ভিজে, পাগলের মতো আলাদা-আলাদা ঝোপে কাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছে, ববি সেনাবাহিনীর লরি আসতে পারে ভেবে উদ্ভিগ্ন, লিভা শেষ পর্যন্ত এমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, খালি ঝোপঝাড় খামচাচ্ছে আর ছিঁড়ছে, আর ছোট ছোট ডালপাতা ববির হাতে গুঁজে দিচ্ছে, যেন ওর হাতে ভেষজ ওষুধ তুলে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত যখন গাড়িটা ঠিক হল আর ওরা দুজন গাড়িতে উঠে বসল, ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। বাইরের দৃশ্যটা আগের মতোই আকর্ষণীয় আছে, কিন্তু ওরা কোনো গ্রাহ্য করছে না। গাড়িটা ভিজে ভিজে আর সঁয়াতসেতে লাগছে; প্লাস্টিক সীটের ওপর, রবার ম্যাটের ওপর, মেঝেতে, ড্যাশবোর্ডে কাদায় কাদা।

“কোন্ মূর্খ রাস্তার ওপর এই জিনিস গাদা করে রেখেছে, জানি না,” ববি বলল।

লিভা কিছু বলল না।

মাইলের পর মাইল, এই কাদার স্তূপ রাস্তার ওপর রয়েছে; আর যখনই ওরা ওই চটকানো হল্‌দে জিনিসটার ওপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, ওরা অপেক্ষা করছে, আবার কখন চাকা পিছলাবে। কোনো কথা না বলে ওরা বেগুনি-লাল জ্যাকারান্ডা ফুলগুলো কাদার মধ্যে পিষে দিচ্ছে। তারপরে, আর কোনো মাটির স্তূপ নেই আর বৃষ্টিও থেমে গেল। আকাশ হাল্কা হয়ে গেল, পশ্চিম দিক প্রায় রূপালি হয়ে উঠল; আর ওরা দেখল, জঙ্গল আর বৃষ্টির গোধূলির পর, যে, আসলে তখনও অপরাহ্ন বেলা।

উপত্যকায় তখন সেই আশ্চর্য নীরবতা, যেটা দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির পর উঠে আসে। পথগুলো সব ফাঁকা; ফুরিয়ে-যাওয়া মেঘগুলো, কম কালো, এখন অনেক উঁচুতে, নড়াচড়া করছে না; ঝোপ ঝাড়, গাছপালা সব স্থির, শান্ত। ধূসর আকাশটাও স্থির। সূর্য আর দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপর ওরা গাড়ি চালাতে চালাতে দেখল, পথে লোকজন নেমেছে, বেড়া-ঘেরা জায়গাগুলোয় মানুষজন। কিছু কিছু কুটির থেকে ধোঁয়া উঠছে সোজা ওপরে।

রাস্তাটা সবসময়ই পাহাড়ের দেহ বরাবর চলেছে। সবসময়ই একপাশে পাহাড় ও বন রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে ওই সব বনে, পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া বাদামি কালো শৈলশিরার পথ ধরে, ওরা আফ্রিকানদের যেতে দেখল, চকচকে নতুন জামা কাপড় পরে। আফ্রিকানদের কালো চামড়ার জন্যে আর ওদের নানা রঙের সুতি পোশাকের জন্য বনের মধ্যে ওদের সহজে চোখে পড়ে না। আর এখন ববি আর লিভা দেখল, পুরো পাহাড়ের ঢালটা, যেখান দিয়ে ওরা গাড়ি চালিয়ে আসছিল, আফ্রিকানে ভরে গেছে। যেকোনো তাকায়, সেদিকেই আরো আফ্রিকানদের দেখে। পাহাড়ের গায়ে কাটা একটা চওড়া তাকের মতো জায়গায় একটা নিচু পাতা-ছাওয়া কুটির। রুম্ব্ব, শুকনো পাতার ছাউনি এবং কালো কালো খুঁটি, সমান করে কাটা গাছের ডাল, এগুলো প্রথমে বনেরই একটা অংশ বলে মনে হচ্ছিল; এখন ওখানে আফ্রিকানরা বসে আছে, ঠাসা ভীড়, সকলেই নতুন জামা কাপড় পরা। ছাউনিটার ওপর দিকে ও নিচের দিকে, আঁকাবাঁকা পথের ওপর আরো অনেক আফ্রিকান দাঁড়িয়ে আছে।

“এটা বিয়ে-টিয়ে নয়,” লিভা বলল, “এটা সেই প্রতিশোধের শপথ নেওয়া।”

“এরা রাষ্ট্রপতির উপজাতির লোক নয়।”

“প্রায় কাছাকাছি। ওপরে কোথাও, এরা এদের চমৎকার নতুন জামাকাপড় খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে হাত ধরাধরি করে নাচছে আর গোবর খাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি নিজেই হয়ত এদের খুব ভালো গোবর পাঠিয়েছে। এখানে চিহ্নমাত্র না রেখে তুমি হাওয়া হয়ে যেতে পার। ওই দিকে কী ঘটেছিল, তুমি তো জান, জান না? নদীর জল লাল হয়ে গেছিল। কিন্তু ওটা আবার এমন একটা ব্যাপার, যেটা কখনোই ঘটেনি।”

“ওখানে ওরা ছিল ক্রীতদাস,” ববি বলল, “ওরা রাষ্ট্রপতি-ক্রমশই চড়ে যাচ্ছে ‘ওরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যাচারিত হয়েছিল।’”

“ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত!” লিভা বলল।

ববি রাস্তার দিকে মনঃসংযোগ করল।

“ওদের পক্ষে অদ্ভুত নয়। আমার পক্ষে অদ্ভুত। এখানে থাকাটা।”

ওরা একটা শৈলশিরার চূড়ার দিকে যাচ্ছিল; আকাশটা আরো খোলা মনে হচ্ছে। ওরা বন থেকে বেরিয়ে অনাবৃত শৈলশিরাটার ওপর এল, ওর অন্যদিকের উপত্যকাটা চোখের সামনে আকর্ষণীয় ভাবে খুলে গেল। একটা ছোট শহর নিচে বিছিয়ে আছে, প্রত্যেকটা কোণায় ধাপকাটা টিলা আর পাতা-ছাওয়া কুটির, রান্নার আগুনের ধোঁয়া উঠছে, ভিজে আঁকাবাঁকা পথ; একটা দৃশ্য, নিজেরই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিতে শেষ হয়েছে, কুয়াশায় আবৃত। দৃশ্যটা বিস্ময়কর।

কিন্তু লিভা শুধু বলল, “বার্গম্যান।”

ববি মুখ শক্ত করল।

ওরা নিচে নামতে লাগল, দৃশ্যটা হারিয়ে গেল। শৈলশিরার এই পাশটায়, গাছপালা অন্যরকম, ঘাস অনেক বেশি। কিছু কিছু পাহাড়ের গায়ে চমৎকার

বাঁশবন, যেন পালক-ছাওয়া। ওরা যে লেকের দিকে যাচ্ছে, সেটাকে এক নজর চোখে পড়ল, স্নান আলোয় শুয়ে আছে। তারপর নিচে নামতে নামতে, ওরা আবার বনের মধ্যে ঢুকল এবং আবার আবছা অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। রাস্তাটা বেঁকে যাচ্ছে, নিচে নামাটা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ না ওরা একসারি কুটির দেখতে পেল, ততক্ষণ কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখা যায়নি এবং তারপরই একটা পরিষ্কার করা জায়গায় একটা ভিলা, জায়গাটা আবার বন্য হয়ে উঠেছে, বোঝা গেল, লেক-শহরটা কাছেই। ততক্ষণে, গাড়ির ভেতরে ওরা দুজনে নীরবতা এবং বিরক্তি, দুটোই শেষ করে ফেলেছে। ওদের জামাকাপড়ও শুকিয়ে গেছে, গাড়ির সীটের আর ড্যাশবোর্ডের ওপরকার কাদাও খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে।

ববি বলল, “কর্ণেল কি গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করতে পারবেন?”

“আশা করি,” লিভা মৃদুস্বরে বলল।

পাথুরে রাস্তায় আরেকটা বাঁক নেওয়ার মতো। কিন্তু তারপরেই বন আর আবছা আঁধার পালিয়ে গেল আর ওরা একেবারে খোলামেলায় আর শেষ বিকেলের আলোতে চলে এল। ওদের সামনে লেক, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, আকাশ থেকে জলকে তফাৎ করা যাচ্ছেনা। আর ওরা আবার পিচঢালা রাস্তায় এসে গেছে, একটা ছোট রাস্তা, যেটা মনে হচ্ছে পাহাড় থেকে সোজা নেমে লেকের দিকে চলে গেছে, কিন্তু তারপর বাঁক নিয়ে শহরটাকে দেখাচ্ছে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা দুই লেনের প্রশস্ত উদ্যানপথ হয়ে গেছে, মাঝখান দিয়ে বাতিস্তম্ভ আর ঊঁচু ঊঁচু পাম গাছ, আমদানি করা, উষ্ণমণ্ডলীয় স্বাভাবিক বৃদ্ধি নয়, কোনো ঊঁচু দেশের কম তাপমানের গাছ রোপণ করে তাকে লালনপালন করা হয়েছে।

এই প্রশস্ত উদ্যানপথটিও বেশ বন্ধুর। একটা বাতিস্তম্ভ ভেঙে পড়ে আছে। একটা পার্ক উদ্যানপথকে লেক থেকে আলাদা করে রেখেছে। সামনে অন্ধকার কয়েকটা খাবারের দোকান, একটা ছোট, ফাঁকা জোটি। উদ্যানপথের অন্যপাশে সব ভিলা, বিশাল বিশাল বাগানের মধ্যে, কত রঙের খেলা, বন থেকে বেরিয়েই চমকে যেতে হয়। একটা মরা শুকনো গাছে ছেয়ে আছে লাল বোগেনভিলিয়া। একটা পুরোনো পেট্রল পাম্প স্টেশন, একটাই মাত্র পাম্প; একটা পর্যটকদের জন্য দোকানের ছোট জানালা, হাতির দাঁতের আর চামড়ার সামগ্রীতে ঠাসা; একটা নিচু, ফাঁকা বাড়ির বাইরে, একটা বিলবোর্ডে সাদা, হাতে লেখা ইশতিহার-এ ফিল্মের আর অভিনেতাদের নাম দেওয়া।

আর তারপরেই, খুবই দ্রুত, যে শহরটাকে আস্ত মনে হচ্ছিল, সে তার পরিত্যক্ত রূপ দেখাল। ভিলাগুলোতে যাবার রাস্তাগুলোয় আগাছা জন্মেছে, খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে বালির আর ময়লার স্রোত নেমে এসেছে। পার্কটিতেও আগাছা ভরে গেছে। দেওয়ালে লাগানো কাচের গ্লোবগুলো আর নকল ঘোড়াগাড়ির বাতিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে এখন খালি পড়ে আছে। সর্বত্র জং-ধরা লোহা। উদ্যানপথ এখন পুরো অসমতল, ঢেউ খেলানো। মাঝে মাঝে রাস্তা ফেটে গেছে, ভেঙে গেছে, বড় বড়

ফাটল দেখা দিয়েছে। কংক্রিটের ড্রেনগুলো বালি, ময়লা আর আগাছায় রুদ্ধ হয়ে গেছে; দুপাশের পায়ে-চলা রাস্তাতেও আগাছা জন্মেছে। কোনো কোনো ভিলার ছাদ ভেঙে পড়েছে। একটা বারান্দার ছাদ, ঢেউ-তোলা টিনের ছাউনি, একটা পাখির ছড়ানো ডানার মতো ঝুলে আছে।

যে জমিটা অসমতল ছিল, তাকে কেটে সমান করে মসৃণ করে, একসময় ওই উদ্যানবীথি আর পার্ক সমতল করে তৈরি করা হয়েছিল। ওই উদ্যানপথের একদম শেষ মুখে একটা লম্বা কংক্রিটের দেওয়াল, ছাতা পড়ে গেছে, উল্টোদিকের মাটির স্তূপের চাপে হেলে পড়েছে, ওখানে একটা গেটের ওপর লম্বালম্বি একটা কাঠের তক্তা, তিরের আকারে বানানো, তার মাথাটা বাঁকা, সেখানে লেখা আছে 'হোটেল'। ওরা ওখানে এসে কংক্রিটের ঢাল রাস্তা দিয়ে একটা নুড়ি-বিছানো উঠানে এসে দাঁড়াল, যেখানে একটুকরো পুরোনো বাগানের পাশে, যেটা ওই কংক্রিট দেওয়ালের সমান্তরালে চলে গেছে, একটা বড় দোতলা কাঠের বাড়ি, একটা বারান্দা সমেত, এখনও অটুট দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা যখন থামল, জলের শব্দ শুনতে পেল। ওটা লেক থেকে আসছে। বাড়িটার ভেতর থেকে, যেখানে ওরা থেমেছিল, তার পাশে একটা ছোট ঘর থেকে ওরা একজন ইংরেজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, চিৎকার করে কিছু বলছে।

“এই হচ্ছে কর্ণেল,” লিভা বলল, “মনে হচ্ছে, মেজাজে আছে।”

BanglaBook.org

চিৎকারটা হয়েই চলেছে; ববি আর লিভা গাড়ি থেকে সুটকেশগুলো নামাল, ববি গাড়ির বিপদ-সংকেতটা চালু করল, সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটার চ্যা চ্যা আওয়াজ আর তারপরেই ববি যখন গাড়ির দরজাটা তালা লাগাল, তখন একটা ভাঁক করে আওয়াজ করেই চূপ হয়ে গেল। চিৎকারটা কিন্তু হয়েই চলেছে, কিন্তু যে আফ্রিকানটা অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, তার হাতে টুপি, মুখে হাসি। ও যখন ববি আর লিভাকে দেখল, তখন ওর হাসিটা আরও চওড়া হয়ে গেল। তারপরে ও যখন টুপিটা মাথায় পরল, সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়হীন হয়ে গেল আর মুখের হাসিটাও মুছে গেল। ওর ইউরোপিয়ান ঢং-এর জামা-কাপড় ঝোলা-ঝোলা, ময়লা, ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে; ওর পায়ের ক্ষয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর বুটজুতা উঠানের ভিজে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে টেনে টেনে হাঁটছে।

ববি লিভার সঙ্গে অফিস ঘরে ঢুকে, মুখটা কঠিন করল। কর্ণেল গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন; অন্ধকার মতো অফিসে, লেজার, খাতা-পত্র, লেখার প্যাড, ক্যালেন্ডার চারদিকে ছড়িয়ে আছে বিশৃঙ্খল অবস্থায়, তার মধ্যে বসে তিনি অপেক্ষা করছেন। একটা কঠিন মুখ আরেকটা কঠিন মুখের মুখোমুখি ববি যা ভেবেছিল, কর্ণেল তার চেয়ে উচ্চতায় খাটো। উনি একটা ছোট-হাতের জামা পরে আছেন আর ওঁর প্রসারিত হাত দুটো কাউন্টারের ধারে চাপ দিয়ে রয়েছে। ওঁর হাতের মাংস-পেশিগুলো সংকুচিত হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও ওঁর পজিটিভিটি এখনও বেশ শক্তিশালী। উনি লিভাকে অগ্রাহ্য করলেন; ওঁর কালো সজল চোখ, ওঁর চিৎকারের পুরো উত্তেজনা, আর ক্রোধ ওই দুই চোখে বিদ্যমান, ববির ওপর রাখলেন।

কর্ণেল প্রথমে নিজে থেকে কথা বলবেন না। লিভাও, প্রায় অচেনার মতো চূপচাপ।

“আমরা রাত্রের জন্য দুটো ঘর চাই,” ববি বলল।

কর্ণেল-এর দৃষ্টি ববির মুখ থেকে সার্টির ওপর নেমে এল।

পেছনের দেওয়ালে, একটা পুরোনো লোহার সিন্দুকের ওপর খোপ থেকে একটা বেলজিয়ান ক্যালেন্ডার ঝুলছে। রাষ্ট্রপতির কোনো ফটোগ্রাফ নেই, কেবল ফ্রেমে বাঁধানো একটা লেক ও হোটেলের জল-রঙা ছবি, ১৯৪৯ সালের তারিখ দেওয়া আর শিল্পীর দ্বারা ‘জিম্-কে’ উৎসর্গ করা।

কোনো কথা না বলে কর্ণেল একটা লেজার খুলে ববির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ববি নিজেও নীরবে, মুখটা একইভাবে শক্ত করে, লিখল। আর লেখার সময়েই

বুঝতে পারল যে, কর্ণেল একজন বুড়ো মানুষ। কর্ণেলের হাত দুটো বিবর্ণ, দাগ ধরা, চামড়া টিলা হয়ে গেছে; কাউন্টারে চেপে রাখা অবস্থাতেও হাত দুটো কাঁপছে। ববি আরও সচেতন হল যে, কর্ণেল এর শরীর থেকে গন্ধ ছাড়ছে। ও দেখল কর্ণেল-এর গেঞ্জিটা ময়লায় বাদামি হয়ে গেছে; ও কর্ণেলের গলার চামড়ার তেলতেলে ভাঁজে ময়লা জমে আছে দেখতে পেল।

ববি লেজারটা লিভার দিকে বাড়িয়ে দিল। কর্ণেল কাউন্টার থেকে পিছিয়ে গিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে, ছেলেটাকে চিৎকার করে ডাকলেন। তখন ওঁর হাত কাঁপা বন্ধ হয়ে গেছে, আর যখন উনি আবার ববির দিকে ঘুরলেন, ওর মুখও পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমন কি, ওঁর দুই চোখে বিদ্রোহের ছোঁয়া।

উনি বললেন, “মনে হচ্ছে, আপনারা ডিনারও নেবেন?”

“একজন তৃতীয় ব্যক্তিও আসতে পারেন,” লিভা বলল, “উনিও বোধ হয় রাস্তার ওই কাদার স্তূপে আটকে গেছেন।

ববির কাছে এটা একটা খবর। আর এখন, যে কঠিন মুখ ও নীরবতা ও কর্ণেলের দিকে বাড়িয়েছিল, তা এখন লিভার দিকেও প্রসারিত হ’ল।

ছেলেটার পেছন পেছন হোটেলের প্রধান বাড়িটায় ঢুকবার সময় আর সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ও ওরা কোনো কথা বলল না। ছেলেটা অল্পবয়েসি, যে কালো প্যান্ট আর লাল কোটটা ও পরে আছে, সেটা ওর গায়ে একরকমের আফ্রিকান পোশাকই হয়ে গেছে। প্রতি পদক্ষেপে, ওর কালো জুতার মধ্যে থেকে ওর খালি পায়ের গোড়ালি বেরিয়ে আসছে। সিঁড়ির দেওয়ালে, রং চটে গেছে; সিঁড়ির চাতালে পুরোনো বিবর্ণ কাঠের তক্তা গাদা করা বোধহয় খুলে ফেলা তাক; দোতলার অন্ধকার করিডোরে যেখানে পাটের গদি স্ন্যাতসেতে আর ছাতা-পড়া গন্ধযুক্ত, সেখানে একটা বিছানা খাড়া করে রাখা আছে। কোনো কথা না বলে, লিভা আর ববি নিজের নিজের ঘরে ঢুকে গেল, করিডোরের দুই পাশে দুটো ঘর। লিভার ভাগ্য ভালো; ওর ঘর থেকে উদ্যানপথ আর লেকটা দেখা যায়।

ববির ঘরটা একটা বন্ধঘর, প্রায় অন্ধকার। বৃষ্টির জল লাগা জানালা দিয়ে হোটেলের জলের টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে, গাছপালা, ঝোপঝাড়, এর পরের রাস্তার ওপরকার বাড়িঘরের ছাদ, এমনকি, নিচে উঠানে, হোটেলের পরিচারকদের নিচু, চুণকাম করা কোয়ার্টারগুলো, সব দেখা যাচ্ছে। ববি শুনতে পেল ওদের বুনো ভাষার চড়াসুরের কিচিরমিচির, বাসনপত্রের আওয়াজ, ওদের বিস্ময়সূচক চিৎকার, যেগুলো শুনতে আত্ননাদের মতন লাগছে। শহরের বাকি অংশ থেকে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, সেখানে একটা হাল্কা ঝাপসা নীল কুয়াশা, যেন ছড়ানো-ছিটানো রান্নার আগুনের ধোঁয়ার মতো।

বিছানাটা অনেক আগেই পাতা হয়ে গেছে, ছোট ছোট ফুল তোলা নক্সা কাটা চাদরটা বিছানার প্রতিটি শিরা, প্রতিটি খাঁজ, গর্ত-র সঙ্গে সেটে আছে। ওপরের

আলোটা মৃদু; কাঠের সিলিং-এ কাঠের শক্ত দানা আর গিঁটগুলো সাদা রঙ এর মধ্যে থেকে পোড়াদাগের মতো ফুটে বেরিয়েছে। বাথরুমের কল-টলগুলো পুরোনো আমলের, ভারী, মুখ-ধোওয়ার বেসিনটা খুব সূক্ষ্ম ফাটা দাগে ভর্তি, যেখানে কল থেকে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ে, সেখানে দাগ হয়ে গেছে। প্লাগ এর গর্তে পেতলের ফিটিংগুলো কালো হয়ে গেছে। আর ববি যখন কল খুলল, তখন লাল-বাদামি রঙ এর কাদা-মেশা জল বেরোল। বৃষ্টির পরে লেকের জল। জলটা কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছেনা, একই ঘোলা কদমাক্ত জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে খানিকক্ষণ পরে গরম জল বেরোল। ববি মুখ হাত পা ধুয়ে নিল।

নিচে কেউ রেডিও চালিয়ে দিয়েছে। একটা আফ্রিকান কণ্ঠস্বর এই ফাঁপা কাঠের বাড়িটার মধ্যে দিয়ে গাঁক গাঁক করে রাজধানী থেকে ছ'টার সংবাদ হোঁচট খেতে খেতে পড়ছে; কণ্ঠস্বরটা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি শব্দাংশ সমানভাবে পড়ে যাচ্ছে। কখনও আটকে যাচ্ছে, আবার কখনও অধৈর্য হয়ে শব্দাংশ বাদ দিয়েই পড়ছে' সামন্ততান্ত্রিক... আতঙ্ক... বাদী... বিচ্ছিন্নতা-বাদী,... আব্রা'ম লিঙ্কন... নিরাপত্তা বাহিনী... মেরে ফেলা হচ্ছে... পোকা মাকড়।' কথাগুলো ববির কানে ত্রুন্ধ তোতলামির মতো মনে হচ্ছিল। আর রেডিও-র এই আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হোটেলের বয়গুলোও হৈচৈ করছিল, জোরে জোরে হাসছিল আর নিজেদের বুনো ভাষায় আরো জোরে, অনেকক্ষণ ধরে তীব্র আতর্নাদের মতো শব্দ করছিল।

বাদামি রঙ এর জলটা কল থেকে বের হয়ে কালো পেতলের বাইরে বেরোনোর মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালো গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল, যার ভেতরে ছোট নদীর তলদেশে যেমন ফার্নগাছগুলো জন্মায়, তেমনি শ্যাওলা জমে জমে একটা পচা গন্ধ ছড়চ্ছিল। বাথরুমের সাদা তোয়ালেটা জীর্ণ, ব্যবহারে পাতলা হয়ে গেছে আর ছাতা ধরার মতো গন্ধ বেরোচ্ছে। হঠাৎ-ই, মুখ ধুয়ে, মুছে নিয়ে, তোয়ালেটা দিয়ে চোখ চেপে ধুয়ে, ববির নিজেকে একেবারে নিঃশেষ মনে হল, দীর্ঘ মোটর গাড়ি চালানোর পর মাথাটা একেবারে খালি খালি মনে হল; আর এই বেড়াতে আসার শহরটায়, যেটার সম্বন্ধে ও প্রায় কিছুই জানে না, লেকের ধারে, এই হোটেলের ঘরে, দিনের এই সময়ে, ওর নিঃশেষিত অবস্থা বিষণ্ণতায় পরিণত হল।

এই বিষণ্ণতাটা কিন্তু খুব খারাপ নয়। নির্জনতা, ও এখন একা থাকতে চায়। ওর এই একলা থাকার ইচ্ছাটা ও বেশ উপভোগ করল। একটা লম্বা দিন কাটল; ও বড় বেশি কথা বলেছে আর অনেক ভুল সিদ্ধান্তও নিয়েছে। ওর হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। এটা ওর গোমড়ানো মানসিকতার শুরু; এটা এমন, যাতে ও নিজেকে শান্তি দেয় ও পরে তাজা হয়ে ওঠে।

ও প্যান্ট পাল্টালো না। আগের দিন রাজধানীতে বুফে লাঞ্চ-এ ও যে ধূসর রঙ-এর সার্টটা পরেছিল, সেই সার্টটা পরল, তারপর নিচে এল। বার-এ যেখানে

রেডিও-টা চলছিল, ভাষ্যকার তখনও রাগতস্বরে হিংস্র শব্দগুলো বলে যাচ্ছিল, কোনো আলো ছিল না। লম্বা কংক্রিটের দেওয়ালটা এই দিকে একটা নিচু পাঁচিলের চেয়ে উঁচু নয়, তার ওপারে, উদ্যানপথের ওপর কাঁটাওয়ালা চওড়া পামগাছের পাতাগুলো লেকের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে, ওপরে নিশ্চল মেঘরাজি। পার্কের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে দেওয়ালটা ঢাকা পড়ে গেছে, যার ওপরে লেকের জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বাতাসে হাল্কা ধোঁয়া ভেসে আছে। দিনের আলো প্রায় নেই বললেই চলে।

ববি হোটেলের গেটে দাঁড়িয়ে। উদ্যানপথে ও যেতে চাইছে না। ও প্রাঙ্গণে হাঁটতে লাগল। হোটেলের ছেলেগুলোর আবাসে রান্না-করার আগুন দেখতে পেল; মেয়েরা, বাচ্চারা ওর দিকে চোখ তুলে চাইল; ওরা সংখ্যায় এত হবে, ও ভাবতে পারেনি। ও ফিরে গিয়ে আবার হোটেলের গেটে দাঁড়াল। ওর মনে হল, ওকে কেউ লক্ষ করছে। ঘুরে দেখল, কর্ণেল আলো-না-জুলা বার এর একটা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ববি উদ্যানপথেই বেরিয়ে গেল।

ও হোটেলের কংক্রিট দেওয়াল পার হয়ে গেল, একটা খালি বাড়ি, একটা বিশাল গাছের তলায়, সঁয়াতসেতে সবুজ হয়ে আছে, বাড়িটার বারান্দায় মাটির ঢেলা, ইটের ভাঙা টুকরো আর জমাট সিমেন্ট ছড়িয়ে পড়ে আছে, বাড়িটার সামনের বেরোনোর পথে আগাছা জন্মে, বালি আর মাটিকে জমাট বেঁধে দিয়েছে, সেই বাড়িটাও পার হয়ে গেল। তারপর পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। এই রাস্তাটা ছোট; শহরটায় মাত্র তিন সারি বাড়ি। একটা ভিলার বারান্দায় কিছু আফ্রিকান একটা রান্নার আগুনের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে আছে। ববি যখন ওদের পার হয়ে যাচ্ছে, একটা লোক, একটা ছেঁড়াখোঁড়া সৈন্যদের কোট পরা, উঠে দাঁড়াল। ববি মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু লোকটা ওর পকেট থেকে কিছু একটা বার করে রান্নার পাত্রটার ভেতরে ছুড়ে দেবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শহরটায় লোক বাস করে। অনেক বাড়ি, যেগুলোকে দেখে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল, আফ্রিকানরা দখল করে আছে, যারা জঙ্গল থেকে এসেছে এবং অনেক বেচপ জিনিস, যেসব ওদের হাতে পড়েছে, যেমন, দেওয়াল, দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, এসব ব্যবহার করে ওদের জঙ্গলের গোল কুটির-এর মতো আশ্রয় তৈরি করার চেষ্টা করেছে। বসার ঘরের মধ্যেও ওরা ছাউনি বানিয়েছে; বারান্দার অর্ধেক দেওয়ালের ওপরও ওরা ছাদ বানিয়েছে। ঢেউতোলা টিনের ওপর ওরা আগুন জ্বালিয়েছে; ইট দিয়ে ওরা রান্নার বাসন রাখবার পাথর বানিয়েছে। লোকগুলোর মধ্যে অনেকেই ছেঁড়াখোঁড়া সৈন্যদের জামা পরে আছে, তখনও বৃষ্টিতে ভিজ়ে সপ্সপ্ করছে, জামার পকেটগুলো ঠাসা, বুলে আছে। একটা পাল্লাহীন দরজা হাঁ করে আছে, তার গায়ে একটা বাই-সাইকেল ঠেকানো, যেমন ওদের কুটিরের খুঁটি-পোঁতা বেড়ার গায়ে ঠেকানো থাকে।

বাড়ির পাশের গলিগুলোতে, বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনার ওপর ঘাস গজিয়েছে; ভাঙা, ফাটা ছবির কাচ, গদিওয়ালা চেয়ারের ভাঙা অংশ, ভেতর থেকে স্প্রিং বের করে নেওয়া গদি, বই, পত্রিকা, যেগুলোর পাতা জুড়ে গিয়ে শক্ত প্যাডের মতো হয়ে গেছে। ববির চোখে পড়ল একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট, চেপটানো, হাল্কা লাল রাস্তার ওপর কালো রঙ, প্যাকেটের ওপর নাম লেখা, 'বেলগা'। এটা দেখে ববির ইউরোপে কাটানো ছুটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল; যেন বেলজিয়াম আর ইউরোপ কোনোসময় জলের ওপারে ছিল, আর এই লেকটা ইংলিশ চ্যানেলেরই আর একটা রূপ। এই আবাসনটা আফ্রিকায় পর্যটকদের জন্যে তৈরি করা হয়নি, এটা সৃষ্টি করেছিল সেই সমস্ত মানুষ, যারা ভেবেছিল তারা আফ্রিকায় এসেছে বসবাস করবার জন্যে, আর এই আবাসনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ফেলে-আসা দেশের স্বাদ পেতে চেয়েছিল; একটা পার্ক, একটা জেটি, একটা জলের ধার দিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণের রাস্তা। আর এখন, লেকের ওপারের গুপ্তগোলের জন্যে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এবং ভূ-সম্পত্তির লেনদেনের ব্যাপারে ভীতি, সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের পরে, সাদা-চামড়ার মানুষদের দলে দলে দক্ষিণে চলে যাওয়ার এবং এশিয়ানদের বহিষ্কারের পরে, এত মানুষের মৃত্যুর পরে, এই পর্যটন আবাসনের আর কোনো কার্যকারিতা নেই।

বহুদূরের থেকে খুব মৃদু একটা তালে তালে শব্দ শোনা যাচ্ছিল, যেন সমবেত নাচের শব্দ, কিন্তু এত মৃদু যে, ববি যখন একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তখনও নিশ্চিত হতে পারছিল না, ও হেঁটে চলল। একটা পাশের গলির ঝোপঝাড়-ওয়ালা শেষ মুখে এসে ও একসারি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল; যেগুলো একসময় দোকানঘর ছিল। তখন ও একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল; আর একটু পরে একটা মোটর গাড়ি ভাঙা-চোরা রাস্তায় লাফাতে লাফাতে এল। একটা শেডে গাড়ি, একটা ভারতীয় মেয়ে চালাচ্ছে। ও একটা দোকানের সামনে থামল। ও ববির দিকে মোটে তাকালই না, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। ওর উঁচু হিলের জুতা রাস্তা ও কংক্রিটের ওপর খটখট শব্দ তুলল। দোকানের ভেতরটা অন্ধকার, কিন্তু দোকানটা চালু আর ব্যবসার জন্যে খোলা রয়েছে। দোকানের তাকগুলো চক্চকে টিনের কৌটো দিয়ে ভরা; একটা মধ্যবয়সি লোক কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

ছন্দবদ্ধ শব্দটা কিন্তু হয়েই চলেছে। ওটা আরও পরিষ্কার হল; আর ওই শব্দটা ছাপিয়ে এখন একজন লোকের চিৎকার শোনা গেল। ববি লেকের খোলামেলা দিকটার দিকে ঘুরল, কালো কালো ঝোপগুলোর মধ্যে দিয়ে লেকের জলটা খাঁটি রূপার মতো লাগছে। কিন্তু ও শব্দটার দিকে হাঁটতে লাগল; শব্দটাও ক্রমশ: ওর কাছাকাছি আসতে লাগল। যখন ও উদ্যানপথটায় পৌঁছল, ও দেখল যে গাছপালার সারির ভেতর থেকে এক কোম্পানি সৈন্য দৌড়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে, ওদের চক্চকে কালো চামড়ার পটভূমিতে, সৈন্যদের সাদা-পোশাকগুলো সাদা ঢাল-এর মতো দীপ্তি দিচ্ছে; ওদের সাদা ক্যানভাস-এর

জুতাগুলো পায়রার ডানার মতো ঝাপ্টাচ্ছে। যে গোঁফওয়ালা লোকটা চিৎকার করতে করতে ওদের সঙ্গেই মার্চ করে দৌড়াচ্ছে, ওর পরনে ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর পোশাক।

প্রতি সারিতে তিনজন করে সৈন্যরা এগিয়ে আসছে, খাকি প্যান্ট, সাদা জুতা, সাদা হাতা বিহীন কোট, মুখহীন। ওরা বেশ স্বচ্ছন্দে ছন্দবদ্ধ দৌড়ের মধ্যে মার্চ করে যাচ্ছে। ইস্রায়েলী লোকটা, মার্চের পা-ফেলার লেফট-রাইট চিৎকার করে বলতে বলতে, সৈন্যদলের সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে ও দাঁড়িয়ে গেল, চিৎকার করেই যাচ্ছে, নিজের পা-ও উঁচু করে মার্চ করছে, পুরো কোম্পানিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল, আর ওরা ওর পাশ দিয়ে দৌড়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু ইস্রায়েলীটা এক জিনিস করছে, আফ্রিকানরা আরেক জিনিস। ইস্রায়েলীটা তার সারা শরীরকে কাজে লাগাচ্ছে, ব্যায়াম করছে, শরীরের কর্মক্ষমতার প্রদর্শন করছে। আর আফ্রিকানরা, ওদের চোখ আধ বোঁজা, ওরা যেন ওদের জঙ্গলের নাচের মতো ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। ওদের হাঁটু উঠছে না; ওদের মুখ চরমানন্দে পুলকিত, ওরা ইস্রায়েলী-র পাশ দিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে এগিয়ে গেল, ওদের ন্যাড়া মাথা থেকে যে ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের চোখে পড়ছে, সেই ঘাম চোখ কুঁচকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেল। যখন ওরা সবাই ওকে অতিক্রম করে গেল, তখন ইস্রায়েলীটা পুরো ঘুরে গেল, মুখে তখনও চিৎকার 'লেফট রাইট, তারপর শিকারী কুকুরের মতো ও আবার সৈন্যশ্রেণীর মাথার দিকে দৌড় লাগাল, আফ্রিকানদের দিকে চিৎকার করতে করতে। আফ্রিকানগুলো সৈন্যবাহিনীর খাবার খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেছে, হাতগুলো গোলগোল হয়ে গেছে; ইস্রায়েলী নির্দেশক কিন্তু ছোটখাট, রোগা, ঝরঝরে শরীর।

নির্দেশক এবং সৈন্যরা উদ্যানপথের একটা পথ দিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলল; অন্য পথটা ধরে ববি ওদের অনুসরণ করতে করতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। দৌড়-লাগানো সাদা কোটগুলো অন্ধকারে এক হয়ে গেল, সাদা জুতাগুলো ঝাপ্টাতে লাগল; তারপরেই ওরা উদ্যানপথের মাঝখানে গজানো কালো ঝোপঝাড়, গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে পদশব্দ দূরে সরে যেতে থাকল। কিন্তু সব কিছুর ওপরে ওদের নির্দেশকের চিৎকারটা পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল।

এবং তারপরেই আবার পদশব্দ আর চিৎকার, দুটোই জোর হয়ে উঠতে লাগল। সৈন্যরা ঘুরে এবার উদ্যানবীথির অন্য রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোড়ন, কালোর মধ্যে থেকে সাদা বেরিয়ে আসা; ববি থেমে গিয়ে দেখতে থাকল। কিন্তু সৈন্যরা যতই এগিয়ে আসতে লাগল, সাদা হাতাবিহীন কোটের ওপরে কামানো মাথাগুলো ওঠানামা করছে, দেখা যেতে লাগল, ববি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওদের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকাটা ঠিক নয়; ওকে দেখে রাখবে। সেইজন্যে, সোজা সামনে তাকিয়ে নাচের ছন্দকে উপেক্ষা করে, ও ঘাম ঝরা, চোখ পিটপিটানো সৈন্যদের এবং তাদের নির্দেশককে, যে মাত্র

কয়েক ইঞ্চি তফাতে ‘লেফ্ট রাইট’ চিৎকার করতে করতে এগোচ্ছে, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ রাত হয়েছে। একটা-দুটো বারান্দাতে আফ্রিকান রান্নার আগুন এখন মৃদু। কিছু কিছু রাস্তার আলো জ্বলেছে, নীলজ্যোতির আলো। একটা ভিলায় স্নান আলো জ্বলছে। উদ্যানবীথির অন্য পাশে জংলা পার্কটার রঙ-ও লেকের মতোই হয়ে গেছে, একটা সমতল কালো রঙ। ববি আবার সেই বিশাল গাছটার নিচের বাড়িটার কাছে চলে এল, হোটেল প্রাঙ্গণের হালকা আলোর আভায়ে গাছটার বিশালত্ব বোঝা যাচ্ছে। কংক্রিটের দেওয়ালটার তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। হোটেলের গেটের ভেতর থেকে আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে; নুড়ি-বিছানো উঠানটায় আলো-ছায়ার কাটাকুটি। বার-এর আলোগুলো জ্বলছে। বারান্দায় লিভার কালো ছায়ামূর্তি।

“ববি?”

ওর অনুপস্থিতি অনুভূত হচ্ছিল। লিভার কণ্ঠস্বরে একাকীত্ব আর প্রতীক্ষার সুর ছিল। ও পোশাক পাল্টেছে, একটা সাদা বা ঘি-রঙ এর ট্রাউজার্স পরে আছে। ও ফিসফিসিয়ে বলল, “একটা পোর্ট এবং লেমন খাবার ইচ্ছা হচ্ছে।”

কিন্তু বার-টা ছিল নিঃশব্দ এবং জনশূন্য; আর রসিকতাটা, যেটা কর্নেল ও ডরিস মার্শাল এর সঙ্গে সম্বন্ধিত, মাঠেই মারা গেল।

ওরা কোনো কথা না বলে বসে শেরী-তে চুমুক দিতে লাগল, দেওয়ালের চারকোণা তক্তাগুলো থেকে ঝোলানো ফটোগ্রাফ আর জল-রঙা ছবিগুলো, আর ওদের টেবিলে ধুলো-পড়া জনিওয়াকার ছবিটা দেখতে থাকল। কর্নেল, এখন রূপার ফ্রেমের চশমা চোখে, একটা সিলিং-এর বাতির নিচে বসে, পাতলা মলাটের বই পড়ছেন। ইনি জিন পান করছেন। লাল কোট পরা ছেলেটা কাউন্টারের পেছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে নুড়িপাথরে, কংক্রিটের ধাপে, বারান্দায় পায়ের শব্দ হ’ল, তারপরই একজন লম্বা, রোগা আফ্রিকান বার-এর দরজায় এসে দাঁড়াল। সৈন্যবাহিনীর একটা ছেঁড়া বর্ষাতির তলায় ও পরেছে একটা কালো সুট, একটা ময়লা সাদা জামা আর কালো বো-টাই; ওর সৈন্যদের মতো বুটজুতায় কাদা মাখা। যতক্ষণ না কর্নেল ওর দিকে তাকালেন, ততক্ষণ ও দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝুঁকে অভিবাদন করে বলল, “শুভসন্ধ্যা, কর্নেল, স্যার।”

কর্নেল মাথা নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে আবার বই-এ মন দিলেন।

বুট-পর পা টিপে টিপে, আফ্রিকানটা, ঘরের কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে, দ্রুত বার-এ এসে দাঁড়াল। ছেলেটা ওকে হইস্কি আর সোডা দিল। আফ্রিকানটা ওর রোগা, লম্বা আঙুল দিয়ে গ্রাসটা আঁকড়ে ধরল। তারপর ও মুখে ঢালার জন্য গ্রাসটা ওপরে তুলে একবার ববি ও লিভার দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল।

কর্নেল পড়েই চলেছেন। ঘরের নৈঃশব্দ আর বাইরের নৈঃশব্দ একই মনে হচ্ছে। দূরে একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই ওটা উদ্যানপথটায়

চলে এল। ওটার আওয়াজটা ক্রমশঃ কাছে আসছে, ওটার হেডলাইটের আলোয় উদ্যানপথটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। তারপরেই ওটা বাইরে প্রাঙ্গনে এসে ঢুকল। দুটো দরজা খোলার শব্দ হল। লিভা, ববি আর বারের ছেলেটা বারান্দার দিকে তাকাল। দু'জন ইস্রায়েলী, ছোটখাট পাতলা চেহারা, সাধারণ জামাকাপড় পরা। ওরা কর্নেলের দিকে মাথা নাড়ল, কিন্তু ববি বা লিভার দিকে তাকাল না। যখন বারের ছেলেটা ওদের টেবিলে গেল, ওরা ছেলেটার দিকে না তাকিয়েই নিজেদের খাবারের নির্দেশ দিল; এবং তারপরে ওরা মৃদুস্বরে প্রায় ফিসফিস করে নিজেদের ভাষায় কথা বলা শুরু করল, এমনভাবে, যেন ওদের ওপর হুকুম আছে লোকজনের সঙ্গে না মেশার, কোনো মন্তব্য না করার বা না দেখার।

একটা হাত পকেটে, আফ্রিকান ওর মদ্যপান শেষ করল। খুব সাবধানে, বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে একটা মুদ্রা ও কাউন্টারের শেষ প্রান্তে রাখল। তারপর কর্নেলের টেবিলের কাছে একটু থেমে, যাতে কর্নেল ওকে মুখ তুলে দেখেন, একটু ঝুঁকে বলল, “শুভরাত্রি, কর্নেল। ধন্যবাদ স্যার।”

আফ্রিকানটা চলে গেলে, কর্নেল ববি আর লিভার দিকে হাতের গ্লাসটার ওপর দিয়ে তাকালেন, আর একটু হাসি মুখে ঝুলিয়ে বললেন, “আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পোশাক পরে।”

লিভা হাসল।

ববি মুখ শক্ত করল আর দেখে সন্তুষ্ট হল যে, কর্নেলের মুখের হাসি মুছে গেল। “তোমাদের ঘরগুলো কেমন, আমাকে বলতে হবে না,” কর্নেল বললেন, “গত তিন-চার মাস আমি ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাইনি।” উনি কোমরে একটা হাত রাখলেন। “এখন পিটার এই সব দেখাশোনা করে। আমার প্রধান পরিচারক। ওর আবাসস্থলটা তোমাদের দেখা উচিত। আগে মাসে একবার পরিচারকদের আবাসনগুলো নিরীক্ষণ করত। কয়েক বছর হ'ল সেটা আর করে না। সহ্য করতে পারত না। কী দরকার?” বইটা দুহাতে ধরে মেরুদণ্ডটা টান টান করলেন, তারপর আবার বইটা পড়তে লাগলেন।

পাশের ঘর থেকে একজন লম্বা পোশাক পরা ছেলে এসে ঢুকল আর কর্নেলকে বলল, “ডিনার, স্যার।”

ইস্রায়েলী দুজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল আর ওদের মদের গ্লাস হাতে নিয়েই পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

লিভা বলল, “আমি একটু ওপর থেকে আসছি।”

ববি আর বারে অপেক্ষা করল না। ও খাবার ঘরে চলে গেল। একটা বড় খোলা মেলা ঘর, মাঝখানে দুটো চারকোণা থাম আর চওড়া চওড়া জাল দেওয়া লেকের দিকে মুখ করা জানালা। পাশের খাঁজ-কাটা তক্তা-ওয়ালা দেয়ালে আরো জল-রঙা ছবি ঝুলছে। বারোটা টেবিল পাতা রয়েছে আর প্রত্যেকটা টেবিলই খাবার মতো করে সাজানো। কর্নেলের টেবিলে রয়েছে আধ-ডজন মদের বোতল, একটা লম্বা

রূপার তৈরি কাঁটা চামচ রাখার স্ট্যান্ড এবং একগাদা বই আর পত্রিকা। পরিচারক যে টেবিলে ববিকে নিয়ে গেল, সেটা তিনজনের খাবার মতো করে সাজানো।

খাওয়ার ঘরের পরিচারকটি বেশ বড়-সড় আর ও খুব চটপট নড়াচড়া করছে, আর একটা গন্ধের টেউ ছড়াচ্ছে। ওর পরনের লাল কোটটার হাতার সামনের দিক আর কলার একদম তেলচিটে কালো, ওর গালে আর গলায় তেল চক্চক করছে। যে মেনু-কার্ডটা ও ববিকে দিল, সেটা পুরোনো ঢং-এর হেলানো অক্ষরে লেখা; পাঁচ পদের ডিনার।

লিভা ফিরে এল।

“এত তাড়াতাড়ি” ববি বলল।

ও মেনুটা হাতে নিয়ে চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে বলল, “আমি তোমার ঘরে কাউকে যেন দেখলাম।”

ও চোখ কুঁচকে দেখতেই থাকল আর ববি বুঝল যে, ও শুধু একটা খবরই দিল না, ওকে গিয়ে দেখতে বলল। ববি এই মেয়েলি দাবীতে বিরক্ত হল। কিন্তু খাওয়ার ঘরের বাইরে আসতেই ওর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সিঁড়ির ওপরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। ওপরের বারান্দায় কিন্তু কোনো আলো নেই। ও যখন নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল, ওর ঘরের জানালা একটা কালো প্রতিফলন ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে দিল। বিছানা গোটানো রয়েছে, ওর খোলা সুটকেশটা যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি রয়েছে; একটা চেয়ারের পেছনে ওর হলুদে দেশি জামাটা ঝুলছে। কোথাও কোনো গুণগোল হয়নি, কোনো জিনিসের পরিবর্তন হয়নি। শুধু একটা জোরদার গন্ধ নাকে লাগছে।

ও করিডোর পার হয়ে উল্টোদিকে লিভার ঘরে ঢুকল। একটা তুলনায় ছোট ঘর, কিন্তু ঘরটা বেশ ফিটফাট আর পরিষ্কার; বোঝাই আছে, কর্নেল লিভাকে সুনজরে দেখেছেন। একটা আরাম-কেন্দারায় লিভার সন্ধ্যার পরা ব্রেসিয়ার, সার্ট, কাদা-মাখা নীল ট্রাউজার্স পড়ে রয়েছে। ট্রাউজার্স ভাজে ভাজে, কোমর বন্ধনীতে আর মসৃণ পশ্চাদ্দেশে পরিধানকারীর-র শরীরের আকৃতির কিছুটা যেন রয়ে গেছে। ওর বিছানার পাশের টেবিলে একটা চকচকে রূপালি বস্তু পড়ে রয়েছে। একটা ধাতুর পাত-এর মতো, কোনোরকমে ছেঁড়া একটা সুগন্ধির ছোট্ট পাউচ; শ্যাম্পু নয়, একটা অদ্ভুত নাম-এর যোনিদেশ সুগন্ধিত করার জিনিস।

নাংরা মেয়েছেলে, ববি ভাবল, একটা বেশ্যা।

খাওয়ার ঘরে ফিরে আসার পথে ও মেঝের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু ও যখন টেবিলে বসল, তখন ওর মুখে আর হাসি নেই, ওর মুখ কঠিন। ও দেখল যে, তৃতীয় জনের জন্য টেবিল সাজানোটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এবং আবারও, বেশ কিছু পরে, ও লিভার চাহনির প্রকৃতিটা বুঝতে পারল, যেটা ও এতক্ষণ অগ্রাহ্য করছিল। ও চুপচাপ থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; কিন্তু এখন লিভারই মতো, ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গীতে ফিসিফিসিয়ে বলল, “কাউকেই তো দেখতে পেলাম না।”

লিভা ঠিক সম্ভ্রষ্ট হতে পারল না। ও কপাল কুঁচকে একটা অধৈর্য শ্বাস ফেলল এবং ওখান থেকে সরে গেল।

ববির তখন সব কিছুর ওপর ঘেন্না এসে গেল।

একটু পরে কর্নেল ঢুকলেন, আড়ষ্ট, থামা-থামা পদক্ষেপে। একটা বই-এর ভাঁজে আঙুল রাখা। ওঁর মুখ লালচে, জিন-এর দৌলতে উনি বেশ খুশি খুশিভাবে সারা ঘরটা তাকিয়ে দেখলেন, ভাবখানা এমন যেন, ঘরভর্তি লোক। উনি সদয় দৃষ্টিতে লিভার দিকে তাকালেন।

“এই বইটা পড়েছ?” উনি বইটা তুললেন; নাওমি জ্যাকবের লেখা বই; লিভা বই-এর নামটা পড়তে পারল না। “হুনদের মানসিকতা নিয়ে ভালোই লিখেছে। এই, আমাকে মেনুটা দেখিও না,” উনি পরিচারককে বললেন, “আমিই তো ওটা লিখেছি। আমাকে স্যুপ দিও। ওরা এখানে আসত। ফ্রান্সফোর্টের পর্যটক দলগুলো। ওদেরকে আসতে মানা করে দিয়েছি।”

তার মানে, ওরাই তোমার এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে, ববি ভাবল।

“ওরা তোমার লাভ খেয়ে নেবে,” কর্নেল বললেন। “আক্ষরিক অর্থেই, খেয়ে নেবে। আমরা ওদের জন্যে বুফে-র ব্যবস্থা করতাম। শোচনীয় পরিস্থিতি। হুন জাতিদের কক্ষনো বুফে খাবার দিতে নেই। ওরা শেষ কণাটুকু পর্যন্ত চেটেপুটে সাফ করে তবে তৃপ্ত হবে। ওরা ভেবে নেবে, নতুন করে যে শুয়োবোঁক মাংসটা টেবিলে রাখা হ’ল, সেটা বুঝি তার একার জন্যে। ওদের ভেতর ধর্ষণের গুরু হয়ে যেত। আমি দু’জন মেয়েলোককে, লড়াই করতে দেখেছি। না, না; হুনদের আসতে দেখলেই, বুফে খাবার বন্ধ করে দাও। তারপর ঘরে ঢুকবার আগে দরজাতেই ওদের আটকিয়ে বল যে, ভদ্রমহোদয়গণ, আজকে প্রত্যেকের জন্য শুধু নির্দিষ্ট খাবার আছে।”

“ওরা সাংঘাতিক খাইয়ে,” লিভা বলল।

“বেলজিয়ানদের মতো। কী ভীড়ই না হত। ওধার থেকে ওদের অনেক লোক এখানে আসত। বেলজিয়ানদের সপক্ষে অবশ্য একটা কথা তুমি বলতে পার যে, ওরা ভালো বার্গাণ্ডি মদটা ভালোই চেনে। যদিও এখন আর ও জিনিস পাওয়াই যায়না। অবশ্য এই সব”— উনি তারের জাল লাগানো জানালাগুলো, অন্ধকার আর লেকের দিকে হাত নাড়িয়ে বললেন— “এই সবার অনেকটা ওদেরই অবদান। ওরা ভেবেছিল, ওরা ছোট বেলজিয়াম থেকে এখানে আসবে, আর একটা সুন্দর, সুখী জীবন কাটাবে, যেখানে কোনো কাজ করতে হবে না, কিছু না, শুধু একটা সুন্দর জীবন।” গগুগোল শুরু হবার ঠিক আগে, একজন মহিলা আমাকে বলেছিল, “আরে এটা তো আমাদের জমিদারি। ‘রাজা এটা আমাদের দিয়েছেন।’ দেখে এস, সেখানে ওরা কী জিনিসই না বানিয়েছে। বড় বড় জমিদার বাড়ি, প্রাসাদ, সাঁতার

কাটার পুকুর। তোমাদের দেখা উচিত। ওদের ভেতর আবার দুটো উপজাতি আছে—”

“ফ্লেমিংস, আর ওয়ারলুন্স,” লিভা বলল।

“এদের নামগুলো শুনলে যা মনে হয়, এরা ঠিক তার উল্টো। ওয়ারলুন্সদের হওয়া উচিত ছিল মোটাসোটা, কিন্তু এরাই রোগা পাতলা চেহারার আর সংস্কৃতিবান। আর ফ্লেমিংস-দের হওয়া উচিত ছিল রোগা পাতলা, কিন্তু ওরা মোটাসোটা। একদল ফ্লেমিংস-কে কখনো খাবারের পাত্রের সামনে দেখেছ? ওরা রাত দশটায় খাবে বলে ডিনারের অর্ডার দেবে আর চলে আসবে সাতটার সময়। সন্ধ্যা সাতটার সময়। তারপর ওরা মদ খাওয়া শুরু করবে। যাতে খিদেটা চনমনে হয় তার জন্য। রাত আটটায় ওরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়বে আর হাতের কাছে যা পাবে, তাই দাঁতে কাটবে, আর ছেলেগুলোকে দৌড় कराবে আরও নোস্তা খাবার, ভাজা-ভুজি আনবার জন্যে। যখন বেলজিয়ানরা আশেপাশে থাকবে, তখন কিন্তু এই নোস্তা ভাজাভুজির ওপর কড়া নজর রাখতে হয়। আর ওরা মদ খেতে থাকবে, খেতেই থাকবে, আরো বেশি, আরো বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়বে। খাবার প্রস্তুত, ছেলেরাও প্রস্তুত। কিন্তু ওরা যে বলেছে, দশটায় ডিনার; তো দশটাতেই আসবে, তার আগে নয়। দশটা বাজা পর্যন্ত ওরা ওদের খিদে বাড়িয়ে যাবে। ঝগড়া করবে, চিৎকার করবে, তাস খেলবে। বাচ্চারা চিল-চিৎকার করবে, আর প্রত্যেকেই আমার ছেলেদের ওপর আরো নোস্তা আনো, ভাজা-ভুজি আনো, বলে চিৎকার করতে থাকবে। বারের মধ্যে রীতিমত হল্লা শুরু হয়ে যাবে, মাত্র একটা ছোট ফ্লেমিংস পরিবারের পার্টিতেই এই সব হচ্ছে। তারপর দশটা বাজতেই ওরা খাবার ঘরে ঢুকবে আর দেড়ঘণ্টা ধরে প্রাণপণে খেয়ে যাবে। সবাই একসঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করবে, ভোঁস ভোঁস করবে। মা, বাবা, বাচ্চা। প্রত্যেকেই যেন এক একটা চর্বির বল। এই রকম উদাহরণ ওরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কাজেই আফ্রিকানদের দোষ দেওয়া যায় না। আফ্রিকানদের চোখ আছে, ওরা দেখতে পায়। এদিক থেকে ওরা বেশ মজার লোক। একজন আফ্রিকানকে তুমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রচুর পরিশ্রম করাতে পার, কিন্তু একদিন ও তোমাকে নিয়েই পালিয়ে যাবে।”

রান্নাঘরে একটা কিছু ভাঙ্গার শব্দ হ’ল, তার সঙ্গে উচ্চস্বরে সমবেত কিচির-মিচির। তার মধ্যে একটা গলার স্বর চিৎকারে পরিণত হল, যেটা হাসির মতো মনে হচ্ছিল; তারপর রান্নাঘরের সব কণ্ঠস্বরই চিৎকারে সামিল হল।

কর্নেল যেন কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। উনি আর লিভার দিকে তাকাচ্ছেন না। ইস্রায়েলীরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। লম্বা ছেলেটা ববির আর লিভার পুটগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে এল, আর ওর গায়ের গন্ধ পেছনে রেখে গেল।

“সান্ধ্য-পোশাক পরা লোকটাকে দেখেছিলে?” কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন।

ববি ভুরু কৌঁচকাল। লিভা হাসতে গেল, কিন্তু দেখল, কর্নেল হাসছেন না।

“ও গত প্রায় একমাস যাবৎ এখানে আসছে। যেদিন থেকে ও এই পোশাকগুলো পেল, সেদিন থেকে। আমি ওর কোনো পরিচয়ই জানিনা।”

লিভা বলল, “ও কিন্তু অসাধারণ বিনয়ী।”

“ও; হ্যাঁ, খুব বিনয়ী। কিন্তু জেনে রাখ, ও আসে আমাদের নিজের জায়গায় রাখতে। ঠিক কিনা, টিমোথি?”

লম্বা ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল আর মাথা তুলে বলল, “স্যার?”

“ও আমাদের খুন করতে চায়, তাই না?”

টিমোথি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, ওর হাতে ট্রে, আর ও খুব গম্ভীর ভাব করতে চাইল। কিছু বলল না। যখন কর্নেল আবার নিজের খাবারের দিকে মন দিলেন, কেবল তখনই ও একটু টিলা হল।

“একদিন ওরা তোমায় তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে,” কর্নেল বললেন।

লম্বা, দ্রুত পা ফেলে টিমোথি রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে আর একটা নতুন কণ্ঠস্বর সমবেত চিৎকারে সামিল হল; আর তারপর হঠাৎ-ই, সেই কণ্ঠস্বর চুপ করে গেল, আর একটা রাগত চিৎকার উঠল।

টিমোথি আবার বেরিয়ে এল, এখনও চটপটে, এখনও গম্ভীর আর ইস্রায়েলীদের টেবিলের দিকে গেল।

“আমার মনে আছে, আমরা স্যালোনিকা, ভারতবর্ষ আর এই ধরনের দেশের জন্যে কেমনভাবে লোকদের প্রশিক্ষণ দিতাম,” কর্নেল বললেন। “কখনও কখনও ওদের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিতাম। আঃ-ওয়া-ওয়া, মাঠের অন্যপ্রান্ত থেকে চিৎকার করত। ওদের মধ্যে কারো কারো চোখে এক ইঞ্চি পুরু ফুস্‌কুড়ি উঠত। কিন্তু ওদের আমরা ঘোড়সোয়ার বানিয়ে ছাড়তাম। তারপরে ওদের পাঠিয়ে দিতাম স্যালোনিকা, ভারতবর্ষ, এইরকম কোনো জায়গায়।”
উনি এবার সোজাসুজি লিভার দিকে তাকালেন। “এই নামগুলো তোমার কাছে নিশ্চয়ই বিদেশি মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এই জায়গায়টার নামও শিগগিরই বিদেশি মনে হবে।”

রান্নাঘরের চিৎকার থেমে গেল।

কর্নেল আবার আনমনা হয়ে গেলেন, খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

একটা লম্বা, রোগামতো আফ্রিকান, গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি, কালো নয়, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরে এল। চলাফেরায় চটপটে, একজন খেলোয়াড়ের মতো। ও ইস্রায়েলীদের দিকে, ববি ও লিভার দিকে মাথা নাড়িয়ে হাসল এবং কর্নেলের টেবিলে চলে গেল। ওর চলাফেরার স্বচ্ছন্দ গতিময়তা আর ওর মুখের খোলামেলা ভাব দেখে ওকে আফ্রিকান-এর চাইতে, একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বা আমেরিকান বর্ণসঙ্কর বলে মনে হয়। ও সাধারণ কাপড়চোপড়ই খুব কেতাদোরস্ত ভাবে পরেছে। ওর ভালো দর্জির বানানো খাকি ট্রাউজার্স পরিষ্কার এবং ইস্ত্রি-করা; ওর ধুসর রঙ এর সার্ট এর কলার পরিষ্কার ও শক্ত। ওর ঘি-রঙা সোয়েটারটা দেখে মনে হয়, ও

একজন ক্রীড়াবিদ, টেনিস-খেলোয়াড় অথবা ক্রিকেটার। ওর চূলে সিঁথি কাটা আর ওর বাদামি জুতা চকচক করছে।

ও কর্নেলের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রয়েছে, কতক্ষণে কর্নেল ওকে চোখ তুলে দেখবেন। তারপর ও-ই বলল, “আপনাকে শুভ রাত্রি জানাতে এসেছি, স্যার।” ওর উচ্চারণে কর্নেল এর উচ্চারণ ভঙ্গীরই প্রতিধ্বনি।

“হ্যাঁ পিটার, তোমার ছুটি। আমরা রান্না ঘরের আওয়াজটা শুনতে পেয়েছি, তোমার চিৎকারও শুনতে পেয়েছি। তা, এবার কোথায় যাওয়া হবে?”

“সিনেমায় যাব, স্যার।” ওর অশুদ্ধ ইংরেজি বিস্ময়কর।

“তুমি আমাদের স্থানীয় ছারপোকা-ঘরটা দেখেছ?” কর্নেল লিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

“মনে হয় সেনাবাহিনী চলে গেলে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সেনাবাহিনী যায়।”

ইস্রায়েলী-রা শুনতে পেল না।

“তাহলে তুমি কী দেখতে যাচ্ছ, পিটার?”

প্রশ্নটা পিটারকে হতবুদ্ধি করে তুলল। ও কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখে আধো-হাসি এবং তারপরেই মুখটা আফ্রিকান ভাবলেশহীন হয়ে গেল।

ও বলল। “ঠিক মনে পড়ছেনা, স্যার।”

“এই হচ্ছে তোমার আফ্রিকান,” কর্নেল বললেন। কথাগুলো লিভার জন্য বলা, কিন্তু লিভাকে সম্বোধন করে নয়।

পিটার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কর্নেল নিজের খাবার নিয়েই ব্যস্ত। পিটার আবার শান্ত হয়ে গেল, ওর মুখে সেই আধো হাসিটুকি ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত পিটারই কথা বলল, “আমি যাব স্যার?”

কর্নেল মুখ না তুলে মাথা নাড়লেন।

পিটার ওর হালকা খেলোয়াড়-সুলভ পদক্ষেপে চলতে লাগল। ওর জুতার চামড়ার হিল্ বার-এর মেঝেতে, বারান্দায় শব্দ তুলতে লাগল। যেই না সেই জুতার শব্দ কংক্রিটের ধাপে পৌঁছেছে, কর্নেল একটা সসের বোতল সশব্দে টেবিলের ওপর ফেললেন আর চিৎকার করলেন, “পিটার!”

ববি লাফিয়ে উঠল। টিমোথি ওর মুখটা সোজা করে রাখল যেন এইমাত্র কেউ ওকে চড় মেরেছে। এমনকি ইস্রায়েলীরা পর্যন্ত মুখ তুলল। খাবার ঘর, বার রান্নাঘর, সব চুপচাপ।

তারপর ওর চামড়ার হিল নিয়েও যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে পা ফেলা যায়, সেইভাবে পিটার খাবার ঘরে ফিরে এসে কর্নেলের টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

কর্নেল বললেন, “পিটার, আমার ভক্তওয়াগনের চাবিটা দে।”

“চাবি অফিসে আছে স্যার।”

“বোকার মতো কথা বললি, পিটার। চাবি যদি অফিসে থাকত, তাহলে আমি তোকে চাবির কথা জিজ্ঞাসাই করতাম না, করতাম কি?”

“না স্যার।”

“তাহলে ওটা বোকার মতো কথা।”

“বোকার মতো স্যার।”

“তাহলে তুই একটা বোকা।”

পিটার চুপ।

“পিটার?”

“বোকার মতো, স্যার।”

“বেশি অহংকার করে এ কথা বলিসনা, পিটার। তুই যদি বোকা হস, তাহলে তুই বোকা, আর কাজ করিস বোকার মতো। কোনো রোজাই তোর এই অসুখ সারাতে পারবেনা।”

পিটার এখন আর ঘরের চূর্তদিকে তাকাচ্ছে না; ওর দৃষ্টি কর্নেলের ওপরই নিবদ্ধ। ওর হাড়-বেরোনো কাঁধ দুটো কুঁজো হয়ে আছে, আর মনে হচ্ছে, ও ঝুঁকে পড়ছে।

“ও, ওকে দেখতে কী চমৎকার লাগছে,” কর্নেল বললেন, যেন আবার লিভাকেই বলছেন; কিন্তু উনি লিভার দিকে তাকাচ্ছেন না। “কেমন সভ্য ভব্য।” উনি ওঁর হাতের চেটেটা মেলে ধরে ওপর-নিচ করলেন। “ওর কোয়ার্টারের দরজার পাশ দিয়ে যাও আর দেখ, কেমন করে তুমি অসুস্থ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পার।”

ওর পাতলা মুখমণ্ডলে পিটারের চোখ দুটো চকচক করছে লাগল। ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঠোঁট দুটো একটু ঢিলা।

“চাবিটা দে পিটার।”

“চাবি ভুল্লওয়াগনে লাগানো স্যার।”

ববি ওর পেটটা একপাশে সরাল। লিভা টেবিলের তলায় ববিকে পা দিয়ে লাথি মারল। ববি আবার স্থির হয়ে গেল। কর্নেল দেখলেন এবং পিটারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে মেঝেতে ববির পায়ের কাছাকাছি তাকালেন আর তারপরেই আনমনা হয়ে গেলেন।

উনি তর্জনী দিয়ে একটা ভঙ্গী করলেন। “এই হোটেলটা কত চওড়া, পিটার?”

“একশ পঞ্চাশ ফুট, স্যার।”

“আর লম্বা?”

“দুশো ফুট।”

“এই তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফুটের মালিক কে? আমি। বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমার কিছুই যায় আসে না। আমি এখানকার কর্তা। আমি যা করি তা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তুমি বেরিয়ে যেতে পার। বেরো, এক্ষুণি বেরো।”

ববি টেবিল ঢাকার ওপর থেকে আঙুল দিয়ে একটা খাবারের কুচি তুলল।

“আমার সম্বন্ধে তোর কী ধারণা, পিটার?”

“আমি আপনাকে পছন্দ করি, স্যার ।”

“ও আমাকে পছন্দ করে । পিটার আমাকে পছন্দ করে ।”

“আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, তখন আপনি আমাকে নিয়েছিলেন । আপনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন, কোয়ার্টার দিয়েছেন । আপনি আমার ছেলেমেয়েদেরও দেখাশোনা করেন ।”

“ওর চোদ্দটা ছেলেমেয়ে । আর এখনো ওই জানোয়ারদের তিনটেকে নিয়ে এখানে থাকে । কী সভ্য-ভব্য । কী চমৎকার । কী সুন্দর কথা-বার্তা । বিশ্বাস করবেনা, ওর ওই দু’খানা হাত দিয়ে কী করে কলম ধরতে হয়, ও তাই জানেনা । বিশ্বাস করবেনা, কী নোংরার মধ্যে থেকে ও আসে । কিন্তু নোংরা তুই পছন্দ করিস, তাই না পিটার? তুই তো পছন্দ করিস, কোনো অন্ধকার গর্তে ঢুকে নোংরা খেতে আর ন্যাংটো-নাচ নাচতে । আর এর জন্যে তুই চুরিও করতে পারিস, মিথ্যা কথাও বলতে পারিস, তাই না?”

“আমি কোয়ার্টার পছন্দ করি, স্যার ।”

‘আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তুই ওখানে থাকবি । হোটেলের ভেতর তোকে থাকতে দেব না, পিটার । আমি মরলে তোরা উপোস করবি পিটার । তুই আবার সেই জঙ্গলে, ঝোপে ফিরে যাবি ।’

“সত্যি কথা স্যার ।”

“আর তুই আমাকে পছন্দ করিস । আমি তোর ভালো করি । কিন্তু আমি নাকি তোর ভালো করিনি । এই ঘরে আমরা দেখেছি লোকেদের, তাকে খতম করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে । তোর মনে নেই?”

“আমার মনে নেই ।”

“তুই মিথ্যেবাদী ।”

“আমি আপনাকে পছন্দ করি, স্যার ।”

“ওই ছেলেটার কী হয়েছিল, যাকে সেফিয়ারেটরের ভেতর বন্ধ করে রাখা হয়েছিল?”

“সেটা অন্য জায়গায় ।”

“তাহলে সেটা তোর মনে আছে ।”

“এই সব বিষয়ে আমি কথা বলিনা, স্যার ।”

“চাবুক মারা? সেসব তো প্রচুর হয়েছিল । তোদের যে চাষ করতে, ফসল ফলাতে দেওয়া হয়নি, সে ব্যাপারে কী বলবি? সেটা মনে আছে? তুই বলছিস, তুই আমাকে পছন্দ করিস?”

“আমি আপনাকে ঘেন্না করি, স্যার ।”

“নিশ্চয়ই তুই আমাকে ঘেন্না করিস, আর আমি জানি, তুই আমাকে ঘেন্না করিস । গত সপ্তাহে তুই সেই দক্ষিণ আফ্রিকানকে খুন করেছিস । বুড়ো, অসহায় । করিসনি? এখানে কুড়ি বছর ছিল । তোদেরই এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল ।”

“চোর ওকে খুন করেছে, স্যার ।”

“ওরা সবসময় এই কথাই বলে, পিটার । কিন্তু আমরা জানি, কে খুন করেছে । এমন একজন যে ওকে ঘেন্না করত ।”

“না, স্যার ।”

“তোর বৌ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তোর মনে আছে, পিটার?”

“আপনি তো সেটা জানেন, স্যার ।”

“তুই বল আমায় আবার ।”

পিটারের বড় বড় চোখ দুটোয় আগুন জ্বলল, রাগে চোখে জল এসে চোখ ভিজে উঠল । ওর আধখোলা মুখ বন্ধ হয়ে গেল, ওর মুখের ওপরদিকটা শক্ত হয়ে গেল ।

“এই গল্পটা তো তুই সবসময়েই বলিস্” কর্নেল বললেন, “লোকেরা সবসময়ই শোনে ।” ঘরটার মাঝখানে একটা চতুষ্কোণ থামে ঠেস দিয়ে টিমোথি দাঁড়িয়েছিল, মাথাটা একপাশে একটু পেছন দিকে হেলিয়ে, সোজা তাকিয়ে আছে ।

“আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়েছিল,” পিটার বলল, ওর গলা বুজে আসছিল রাগে ।

“তোর আরো তিনজন বৌ ছিল । বলে যা ।”

“প্রতি রাতে ও কোয়ার্টারের মধ্যে কাঁদত ।”

“নোংরা মেখে, কালো হয়ে, গন্ধ ছড়াত ।”

“এক রাতে ও খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ল । আমি একটা গাড়ি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম । ওরা বলল, এখানে হবে না । হাসপাতাল শুধু ইউরোপিয়ানদের জন্য । আর দেশি আদমিদের জন্য কুড়িঘর । ওকে ভারতীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও । বড় দেরী হয়ে গেল, স্যার, ও মরে গেল ।”

“আর পরদিন তুই বাইরে বেরোলি, আর তোর স্ত্রীর বৌদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলি কাঠ কাটতে । আর ওরা কাঠ কেটে পিঠে বেঁধে সন্ধ্যাবেলা তোর কাছে নিয়ে এল । এটা বেশ ভালো একটা গল্পো, বিশেষ করে যারা কেঁদতে আসে, তাদের জন্যে ।”

“এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি কখনোই কোনো কথা বলিনা, স্যার ।”

“তুই কাকে বেশি ঘেন্না করিস? ভারতীয়কে, না, আমাকে?”

“আমি ভারতীয়দের ঘেন্না করি ।”

“তুই বেস্‌মান । কাকে বেশি ঘেন্না করিস ভারতীয়কে, না, আমাকে?”

“আমি সবসময়ই আপনাকে ঘেন্না করব, স্যার ।”

“একথা কখনো ভুলবিনা । তোর ঘেন্নাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে । একদিন রাতে, পিটার, তুই আমার দরজায় ধাক্কা দিবি—”

“না স্যার ।”

“তোর গায়ে থাকবে একটা বর্ষাতি অথবা জ্যাকেট । তুই তোর কনুই দুটোকে শরীরের দুপাশে সঁটে রাখবি—”

“ন্যা স্যার, না স্যার ।” পিটার চোখ বন্ধ করেছে, খুলছে ।

“আমি দক্ষিণ আফ্রিকানটার মতো ব্যবহার করব না, পিটার। যখন তুই বলবি, ‘শুভ সন্ধ্যা, স্যার, আমি বলব না, আরে পিটার, বেটা আমার, আয়, আয়, পিটার। বোস্ চা খা, কেমন আছিস? বাড়ির সব ভালো তো?’ তোর জন্যে চা-ও আসবেনা, আর আমিও এরকম ব্যবহার করব না। আমি অপেক্ষা করব, বলব, ‘এই যে পিটার। পিটার আমাকে ঘেন্না করে।’ আর তুই দরজা পার হয়ে ভেতরে আসতেই পারবিনা। আমি তোকে খুন করব। আমি তোকে গুলি করে মেরে ফেলব, পিটার।”

পিটার চোখ খুলল, কর্নেলের মাথার ওপর দিকে তাকাল।

“এইভাবে আমি শপথ করি,” কর্নেল বললেন, “এই আলোর নিচে, খোলামেলায়, সাক্ষীদের সামনে। তোর বন্ধুদের বলবি।”

কিছুক্ষণ পিটার কর্নেলের মাথার ওপরে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখ বন্ধ হয়ে গেল, আবার শক্ত হয়ে গেল: ওর রাগী চোখে এখন আর জল নেই। সে তার খাকি ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো চাবি সমেত একটা চাবির রিং বার করল। সে ওটা টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্নেল হাত বাড়ালেন আর পিটার কর্নেলের হাতের চেটোয় চাবি রাখল। এরপর আর কিছু করার নেই; আগের মতোই খেলোয়াড়-সুলভ হালকা চটপটে পায়ে ও খাবার ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল ঘরের কারো দিকে তাকালেন না। উনি একগ্লাস জল হাতে নিলেন, কিন্তু ওঁর হাত কাঁপতে লাগল, উনি গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিলেন। ওঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

টিমোথি থাম থেকে সরে দাঁড়াল আর অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যখন কর্নেল নিজেকে সামলে নিলেন, আর ওঁর মুখের রঙ ফিরে এল, উনি লিভার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আজকে ওদের উৎসবের রাত। সারা সপ্তাহ ধরে ওরা প্রস্তুতি নিয়েছে। মি. পিটার হোটেলের ভিক্সওয়াগনে চেপে ওখানে উপস্থিত হতেন। ওদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, পিটার ইতিমধ্যেই হোটেলের দখল নিয়ে নিয়েছে। ও, ওখানে বাইরে, ওদের কাছে, একজন দারুণ রাজনীতিবিদ, মি: পিটার। যাই হোক, সেটা ওর সমস্যা। তাই না, টিমোথি?” কর্নেলের বাঁপুনি থেমে গেছে; উনি টিমোথির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

টিমোথিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, হাসল।

রান্নাঘরে আবার কিচির মিচির শুরু হয়েছে। একটা জোর গলায় চিৎকার শুরু হয়েছে আর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

“ওর গলা শুনতে পাচ্ছ?” কর্নেল লিভাকে বললেন।

কাঁটা দিয়ে খাবার মুখে তুলতে তুলতে লিভা মাথা নাড়ল।

“এই হচ্ছে পিটার, অবশ্য তোমরা বিশ্বাস করবে না। ওরা কী বলছে, জান? মনে হচ্ছে, ওরা প্রচণ্ড তর্কাতর্কি করছে। কিন্তু আসলে ওরা কিছুই বলছে না। যখন

কিচিরমিচির করতে শুরু করে, তখন ওরা পাখিদের মতো। যখন টিমোথি পুরো মেজাজে থাকে, তখন ওকে শুনলে বুঝতে পারবে।”

টিমোথি ইস্রায়েলীদের পেটগুলো সরাচ্ছিল। ওর প্রশংসা শুনে হাসল, কিন্তু কাজটা সঠিকভাবে করে যেতে লাগল। কপালে ভাঁজ ফেলে ও ওর বন্ধ মুখের দুই কোণ টেনে রাখল। রান্নাঘর থেকে হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

“ওই হচ্ছে পিটার,” কর্নেল বললেন, “ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে চালাতে পারে। সব অর্থহীন ব্যাপার। যাই হোক, ডিনার কেমন লাগল?”

“ভারী চমৎকার,” লিভা বলল।

“এতে আমার কোনো অবদান নেই। রাঁধুনি ছেলেটাই সব করে। আমাকে বলে আর আমি মেনুটা লিখি। ওকে দেখলে তোমরা হাসবে।” কর্নেল হাসলেন। “জঙ্গল থেকে সদ্য এসেছে। এখানে আসার আগে পর্যন্ত ও কোনোদিন চেয়ারে বসেনি। জানিনা, আমি চলে গেলে ওর কী হবে। কিন্তু এসব ভেবে কী লাভ?”

“আপনি কি চলে যাবার কথা ভাবছেন?”

“আমি এছাড়া অন্য কিছু ভাবিই না। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। আমেরিকানরা এসে আমাদের সবাইকে কবে কিনে নেবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি না। সেটা হয়তো হবে, কিন্তু আমার জন্যে বড় দেরী হয়ে যাবে।”

ইস্রায়েলীরা হাতের ইশারায় বিল চাইল। টিমোথি ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে খুচরো ফেরৎ দিল। কর্নেল ওদিকে তাকালেন না। ইস্রায়েলী-রা যখন কর্নেলের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন একটু ইতস্তত করে সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন করল। কর্নেল কিছু বললেন না, উনি চোখ তুলে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন, তারপর শূন্যে তাকিয়ে রইলেন, যেন ওদের চোখে যাওয়াতে ওঁর চিন্তাস্রোত ব্যাহত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইস্রায়েলী-রা মুড়ি-ফেলা উঠানে পৌঁছে জোরে কথা বলতে শুরু করল, উনি তাকিয়েই রইলেন।

“ওই লোকগুলো জানেনা, ওরা কত ভাগ্যবান,” কর্নেল বললেন।

একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। একবার, দুবার। একটা ইঞ্জিন চালু করার শব্দ হল।

“ইউরোপিয়ানরা যদি এখানে পঞ্চাশ বছর আগে আসত, ওদের জন্তু-জানোয়ার শিকার করার মতো শিকার করে মেরে ফেলা হত। বিশ, ত্রিশ বছর পরে— আরবরা হয়ত এখানে প্রথমে আসত, কিন্তু তাদেরও সবাইকে দড়ি বেঁধে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বেচে দেওয়া হত। এই হচ্ছে আফ্রিকা। ওরা হয়ত রাজাকে মেরেই ফেলবে। এই সব শেষ হওয়ার আগেই ওরা হয়ত রাজার উপজাতিদেরও শেষ করে দেবে। তোমরা রাজাকে চেন? তোমরা কি খবর শুনছনা?”

“আমি কেবল ওঁকে দেখেছিলাম একবার,” লিভা বলল।

“একবার এখানে দুপুরের খাবার খেতে এসেছিলেন। খুব ভদ্র, সংস্কৃতিবান। আমার বয়স যদি আরো কম থাকত, আমি গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতাম।

যদিও সেটারও কোনো মানেই হত না। অন্যদের থেকে তাঁর কোনো তফাৎ নেই। সামান্য সুযোগ পেলেই, তিনি ওইসব রোজা-টোজাকে খতম করতেন। লোকে বলে, ভালো আর মন্দ, সব জায়গাতেই আছে। এখানে কোনো ভালো-মন্দ নেই। ওরা শুধু আফ্রিকান। ওদের যা করবার, তাই করে। তোমার নিজেকে এটাই বোঝাতে হবে। তুমি ওদের ঘৃণা করতে পার না। এমনকি তুমি ওদের ওপর রাগতেও পার না। সত্যিকারের রাগ।”

ডিনার প্রায় শেষ। যে সব টেবিল সাজানো ছিল, কিন্তু লোক বসেনি, টিমোথি সুগলো পরিষ্কার করছে।

“খুব দেরী হয়ে গেছিল” কর্নেল বললেন, টেবিলের বই, পত্রিকাগুলো গুছিয়ে নিলেন। “সেই দক্ষিণ আফ্রিকানের পক্ষে বড় দেরী হয়ে গেছিল। ওর শেষ হার্ট স্ট্রোকটা না হওয়া পর্যন্ত ও এখানে আসত। ওটাই ছিল ওর বড় ভুল। একজন সত্যিকারের পুরোনো ওলন্দাজ বংশধর। ও মারা যাবার পর দেখা গেল, ওর চায়ের পটটা ছিল অর্ধেক ভর্তি, দুটো কাপ মেঝেতে পড়েছিল, আর সর্বত্র চা আর রক্ত। একবার কি দু’বার, ও নিজের বৌ-কেও এখানে নিয়ে এসেছিল। যত কুৎসিত হতে হয়, ততটাই ওই মহিলা। যেন একটা চামড়া কুঁচকে যাওয়া সুখী বুড়ি বাঁদর।” উনি থামলেন। “গত কয়েক বছরে আমি এখানে এমন এমন ব্যাপার দেখেছি, যা শুনলে তোমাদের কান্না পাবে।”

হঠাৎ কথাগুলোর মধ্যে মিথ্যার গন্ধ পাওয়ায়, একটা লোক, তার কাছ থেকে যে ধরনের কথাবার্তা আশা করা যায় বলে ভাবে, সেই রকম কথাবার্তা বলার কণ্ঠস্বর শুনে, ববি মুখ তুলে তাকাল। ও দেখল, কর্নেল ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ববি কফিতে চুমুক দিতে দিতে গরম কাপট্য ফুঁ দিল। কর্নেল চোখ ঘুরিয়ে নিলেন।

রান্নাঘরের চিৎকার, কিচিরমিচির বন্ধ হয়ে গেছে।

এটা যেন কর্নেলের কাছে একটা সঙ্কেত মনে হল। উনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। “তোমরা কাগজে যেমন পড়ে থাক, তেমন ব্যাপার নয়। হাইকমিশন অফিসের লোকেরা যে সব কথা শুনতে চায়, তেমন ধরনের কোনো ব্যাপারও নয়। ওদের জন্য এখন সব কিছুই মিষ্টি আর হালকা। রোজাদের অসম্মান করা চলবে না।” নিজের পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উনি পত্রিকাগুলোকে আবার গুছিয়ে নিলেন, সস্ এর বোতলগুলোকে নতুন করে সাজালেন, বইটা তুললেন আর বুকের কাছে চেপে ধরলেন। “এই জায়গায় এখন আর বেশি ভোটও পাওয়া যাবে না।”

প্রস্থানের আগের শেষ কথাটা যেন বললেন। হেঁটে চলে যাবার সময় উনি নিজেকে অতিরিক্ত সোজা রাখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিজের কোমরের চোট লুকোতে পারলেন না। বারের মধ্যে এবং তারপর বারান্দা দিয়ে হেঁটে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়, তাঁর পা ফেলাটা ধীর হয়ে গেল, একটা পায়ের শব্দ হালকা, আর একটার, ভারী।

টিমোথি, এখন বেশ হাসিখুশি, টিলাঢালা, খেলাচ্ছিলে চটপট টেবিল-ঢাকা কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলল। ও এখন বড়সড় চটপট ভঙ্গীতে, লম্বা লম্বা পায়ে চলাফেরা করতে লাগল। ওর গায়ের গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

তখন সাড়ে আটটাও বাজেনি।

“বেলজিয়ানদের স্বপক্ষে কিছু বলার ইচ্ছে হচ্ছে,” লিভা বলল, “দশটার আগে কখনও থাকে না।”

“ফ্লেমিংস-রা,” ববি বলল, “মোটারা।”

টিমোথি তিনটে আলোর দুটো নিভিয়ে দিল।

“স্থানীয় বিনোদনের ব্যাপারে তুমি তো অভিজ্ঞ,” ববি বলল।

“বার-এ আমার জন্য অপেক্ষা কর,” লিভা বলল, “আমরা হয়তো একটু বেরোতে পারি।”

লিভার এই আত্মবিশ্বাসী, অন্তরঙ্গ ভাবটা ববির ভালো লাগল না। ভাবখানা এমন যেন, এই হতাশা এবং অন্ধকার, এই দুটোতে মিলে লিভার মধ্যে তার পত্নীত্ব-ভাব জাগিয়ে তুলেছে এবং সে ববিকে তার স্বামী মার্টিন এর জায়গায় বসাতে চাইছে। অবশ্য ববিও একলা থাকতে চাইছিল না। ও বার-এ ঢুকল। টিমোথি খাবার ঘরের শেষ আলোটাও নিভিয়ে দিয়েছে আর রান্নাঘর থেকে ওর আর অন্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। বার-এর ছেলেটা বার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ঝুঁকে আছে, যেন কাউন্টারটা পড়ছে; পরে ববি দেখল, ও একটা বই পড়ছে। খানিকক্ষণ পর লিভা নেমে এল, ওর কাঁধের ওপর একটা কার্ডিগান বুলছে। ও একটা হাস্যকর কাঁপুনি দিল, যেন ঠাণ্ডার চেয়েও অন্য কিছুতে ও কাঁপছে।

উদ্যানপথটায় এসে ওরা আর রান্নাঘর বা কোয়ার্টার থেকে কোনো কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল না। ওরা কেবল উদ্ভাসের রাস্তার নুড়ি আর বালির ওপর নিজেদের পদশব্দ আর মাঝে মাঝে অদৃশ্য লেকটার জলের ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল। পেছন দিকের কোয়ার্টারের আলোর আভায়ে হোটেলটার পুরো চেহারাটার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। বার-এর থেকে আসা আলো, উঠানে ছড়িয়ে পড়েছে, আর অন্ধকার খাবার ঘরের জানালা দিয়েও সামান্য দেখা যাচ্ছে, তাতে হোটেলের কংক্রিটের দেওয়ালটার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। তারও পেছনে বিশাল বিশাল গাছ আর ফাঁকা বাড়িগুলোর অন্ধকার।

লিভা বলল, “এখানে একা একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

সামনে একটা রাস্তার আলো জ্বলছে, একটা ছড়ানো ছিটানো সাদা আলোর বৃত্ত, বৃষ্টির পরে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। রাস্তার পাশের সব কিছু আশ্বে আশ্বে দৃশ্যমান হচ্ছে, ছায়াও দেখা যাচ্ছে। একটা ভাঙা ইটের দেওয়ালে আলো পড়েছে। ভিজে পাম গাছের পাতাগুলো চকচক করছে। পার্কেও কিছু কিছু চকচক করছে।

“ব্যাপারটা বিস্ময়কর,” লিভা ফিসফিস করল, “এই সব বাড়িঘরগুলো কি ভুলে যাওয়া যায় আর এটা কি ভেবে নেওয়া যায় যে, লেকটা আবিষ্কৃতই হয়নি?”

“আবিষ্কার বলতে তুমি কী বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি না,” ববি বলল, ফিসফিসিয়ে নয়, “এখানকার লোকেরা চিরকালই লেকটার অস্তিত্ব জানত।”

“শুনেছি। শুধু ভাবছি, ওরা তো অন্যদের সে কথা জানাতে পারত।”

ওরা সেই বাড়িটার কাছে এল, যেটার ডাঙা ঢেউতোলা টিনের ছাদ ভেঙে পড়ে একটা পাখির ছড়ানো ডানার মতো দেখতে লাগছে। বারান্দায় একদল লোক একটা ছোট আগুন ঘিরে বসে আছে।

লিভা বলল, “আমি শেষ বার যখন এখানে এসেছিলাম, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ওরা উদ্যানপথটাতে যায়নি।”

কথাটা বলতে বলতে লিভা হেঁচট খেল। একটা নুড়ি ছিটকে গেল। একজন আফ্রিকান বারান্দায় উঠে দাঁড়াল, ওর খালি পা আর জীর্ণ জ্যাকেটটা আগুনের আলোয় ছায়াছায়া মূর্তির মতো লাগছিল। লিভা ও ববি সোজা সামনে তাকিয়ে রইল।

ওরা বাড়িটা পার হয়ে যাবার পর লিভা বলল, “ও ঠিক বলেছে। ও ঠিক বলেছে। ওরা ওকে মেরে ফেলবে।”

ওরা পেট্রল পাম্পটা পার হয়ে গেল। পর্যটকদের জন্য দোকান, সিনেমা হল, সব খালি এবং বন্ধ। ওরা পথের শেষপ্রান্তে এল এবং সকালে মার্চ করা সৈন্যরা যে গাছের সারি দেওয়া রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই রাস্তায় হাঁটতে থাকল। এই রাস্তায় পিচ-ঢালা নেই; ভিজে বালি, নুড়ি-পাথর আর পাথরের ওপর ওদের পা পড়ছে। খুব তাড়াতাড়িই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। অন্ধকারাচ্ছন্ন জংলা বাগানের ভেতর ভিলাগুলোর ধূসর দেওয়াল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। বারান্দাগুলো যেন আশপাশের অন্ধকারের অংশ। এখানে কোথাও আগুন জ্বলছে না। গাছগুলো রাস্তার ওপর নিচু হয়ে আছে, খোলামেলা ভাবটা হৃদয়ে গেছে।

একটা কুকুর, ভৌ ভৌ করল, নিচু, গম্ভীর স্বর। তারপরেই ওটা ওদের পাশে চলে এল, বেশ বড় সড় আর গরগর করছে। ওরা হেঁটে চলল, কুকুরটা নিজের বাড়ির সীমানা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেল। সামনেও রাস্তার দুপাশেই কুকুর ডাকতে লাগল। শীগগিরই ওরা কুকুরের দলের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এই কুকুরগুলো সীমানা বোঝে না। একটা মৃদু, বিদ্যুতের আলো, আগুন নয়, একটা ভিলার ভেতরের ঘরে জ্বলছে। ওই ভিলা থেকেও কুকুররা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। এরা ভৌ ভৌ করছেন, পা দিয়ে নিচের ঝোপঝাড় ছিন্নভিন্ন করে, নিচু কাঠের বেড়া লাফ দিয়ে টপকে, রাস্তার বালির ওপর দিয়ে ছোট ছোট নুড়ি পাথর ছিটকিয়ে হাঙ্কা পায়ে দৌড়ে এল। আর অন্ধকার কালো রাস্তায়, সামনের দিক থেকে ক্রমাগত আরো কুকুরের ডাক ভেসে আসতে লাগল। কোনো মানুষের কণ্ঠস্বরই কুকুরগুলোকে ডেকে নিচ্ছে না।

“খুব যাচ্ছেতাই ব্যাপার,” লিভা বলল।

ওরা পেছন ফিরল। কিন্তু আগে যেমন কুকুরগুলো ওদের রাস্তার মাঝখানেই রেখেছিল, এখন ওরা ওদের সামনে, পেছনে রাস্তা পার হয়ে যাতায়াত করতে লাগল। ওদের পায়ের খাবাগুলো বালির ওপর প্রায় ধাতব শব্দ তুলছে; ওদের ডাক গম্ভীর, হঠাৎ হঠাৎ ডাক, কিন্তু কখনোই তীব্র নয়। আর সারাক্ষণই দূর থেকে ভৌ ভৌ ভেসে আসছে। কুকুরের দল ক্রমশ: বড় হচ্ছে।

“হায় ঈশ্বর,” লিভা বলল, “এই কুকুরগুলোর কোনো মালিক নেই। এরা বুনে হয়ে গেছে।”

“কথা বোলো না,” ববি বলল, “আর ঈশ্বরের দোহাই হোঁচট খেও না।”

ওদের কথাবার্তা কুকুরগুলোকে আরো খেপিয়ে তুলল। এখন কুকুরগুলো পুরো রাস্তাটা দখল করে নিয়েছে আর ওদের চলাফেরাও খুব ঘন এবং চকিত। ওরা কোনো একটা সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে; দলের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কুকুরটার প্রথম লাফ, ববি বা লিভার হঠাৎ কোনোরকম অঙ্গভঙ্গী, একটা নুড়ি পাথর ছিটকে যাওয়া। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই উদ্যানপথ আর আলো কাছে আসতে লাগল।

“তুমি বলেছিলে, তোমার মায়ের কুকুরটা তোমার পায়ের ডিমে ওই দুটো সমান্তরাল ক্ষতের দাগ রেখে গেছে, তাই না?” লিভা বলল।

ববির রাগ হয়ে গেল। “আমি এগুলোকে মেরেই ফেলব। আমার পায়ের জুতার ডগায় লোহা লাগানো। যেটা প্রথমে আমাকে আক্রমণ করবে, সেটাকেই মেরে ফেলব। ওর মাথাটা লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দেব। ওটাকে মেরেই ফেলব।”

রাগটা ওর রয়েই গেল আর ওটা সাহসের কাজ করল। মনে হল যেন, কুকুরগুলোও ওর রাগ বুঝতে পেরেছে। ওরা রাস্তার ধারের দিকে সরে যেতে লাগল, আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। কিন্তু উদ্যানপথটা কাছে চলে এসেছে; সাদা বাতির আলোতে অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে; আর কুকুরেরা জানে যে, ওই উদ্যানপথ পর্যন্তই ওদের সীমানা।

ববির শরীর কাঁপছিল। উদ্যানপথটির আসার পর ধীরে ধীরে ওর সময়ের বোধটা ফিরে এল।

লিভা বলছিল, “লোকে বলে টিটেনাস-এর জন্যে নাকি চোদ্দোটা ইনজেকশন নিতে হয়।”

“ওরা আফ্রিকানদের আক্রমণ করার জন্যে এই কুকুরগুলোকে এখানে নিয়ে এসেছিল।”

“ঠিক আছে, ববি। ওরা এখন সবাইকেই আক্রমণ করছে।”

“ওরা ওদের আফ্রিকানদের আক্রমণ করার জন্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।”

“ওরা সঠিক প্রশিক্ষণ দেয়নি।”

“ব্যাপারটা হাসির নয়।”

“তুমি কি জান আমার কেমন বোধ হচ্ছে?”

ওরা আর কোনো কথা না বলে হোটেল ফিরে এল। আসার পথে আগুনগুলোর দিকে ওরা তাকালই না। হোটেল বার-এর আলোগুলো তখনও জ্বলছে। অফিসের পাশেই, কর্নেলের ঘরে আলো জ্বলছে না। বারান্দায় লিভা, ববি কিছু বলে কিনা, তার জন্যে একটু দাঁড়াল। ববি কিছুই বলল না। ববি মুখ শক্ত করে, লিভার পাশ থেকে সরে গিয়ে একাই বার-এ ঢুকল। লিভা বারান্দা দিয়ে প্যাসেজে গিয়ে পড়ল। ববি শুনতে পেল লিভা সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। ন'টা বেজে গেছে। ওদের অভিযান ছিল আধঘণ্টারও কম।

ববি একটা টুলের ওপর বসে, ডুবান্নে মদ পান করছিল। ভয়টা ওর শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্ধকার রাস্তার সেই আতংকের মুহূর্তগুলো এখন অনেক দূরে। রাগটা ওকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে আর ওর একাকীত্বের জন্যে বিষণ্ণ করে দিয়ে গেছে, বার-এর মধ্যে, বিশাল আফ্রিকান লেকের পাশে ও বিষাদগ্রস্ত, একা বসে আছে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে, লালকোট পরা বার-এর ছেলেটার ধুলোয় ভরা মাথাটা দেখছে; ববি ভাবছে বেচারার ছেলেটা, বেচারার আফ্রিকান, বেচারার আফ্রিকান-এর মাথা; আর ববির চোখ জলে ভরে যাচ্ছে।

“আমি ফরাসি বই পড়ছি,” বার-এর ছেলেটা বলল, একটা ন্যাতানো মলাট দেওয়া জীর্ণ বই দেখাল।

ববি শুনল, কিন্তু বুঝতে পারল না। ও ছেলেটার দিকে তাকাল, আর কুকুরের কথা মনে পড়ল আর ভাবল: বেচারার ছেলেটা।

“আমি জ্যামিতি পড়ি,” বার-এর ছেলেটা ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চায়। ওরা সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায়, যাদের ওরা দর্শনার্থী এবং সদাশয় লোক বলে মনে করে। ওরা শুধু ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করার জন্য বলে তাই নয়, ওরা ওদের আচরণবিধি ও জ্ঞানও আয়ত্ত করতে চায়। এইভাবে ববিকে ও বেছে নিয়েছে ভেবে ববির মনকে নাড়া দিল। নাড়া দিল, কারণ এত সব কিছু ঘটে যাওয়ার পরেও ছেলেটা ওর ওপর বিশ্বাস দেখাচ্ছে; এবং ওর মন খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, ও নিজেকে কর্নেলের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছে আর এখন পর্যন্ত ছেলেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি, কেবল একটা পোশাক পরা আফ্রিকানকে দেখেছে, কর্নেলের একজন কর্মচারীকে, এই ঘটনাই হোটেলের একটা অংশ হিসেবে।

“তুমি জ্যামিতি পড়,” ববি বলল, “দেখাও তো আমাকে তুমি কোন্‌খানটা পড়ছ।”

বার-এর ছেলেটা একগাল হাসল আর পায়ের ডগায় ভর দিয়ে একটু নেচে নিল। ও বার-এর কাউন্টারের ওপর দুই কনুই চেপে বইটার প্রথম কয়েকটা পাতা উল্টে গেল, ওর পুরো হাত দিয়ে পাতাগুলোকে ধরে ধরে। যে পাতাগুলো ও ওল্টাল, ওগুলো কালো হয়ে গেছে, রোঁয়া ওঠা-ওঠা, পাতার ধারগুলো ক্ষয়ে যাওয়া।

“আমি এইখানটা পড়ছি,” ছেলেটা বলল। খুব আশা নিয়ে ও দুটো পাতার মাঝখানে হাত রেখে ববির দিকে বইটা ঠেলে দিল।

ববি বইটা কাউন্টারের মাঝখানে রাখল। “তুমি এই জায়গাটা পড়েছ? একটা ত্রিভূজের তিনটে কোণ মিলে একশ আশি ডিগ্রি হয়?”

‘আমি এখানটা পড়ছি,’ ছেলেটা বার-এর ওপর একপাশে ঝুঁকল, “আপনি আমাকে শেখান।”

“আমি তোমাকে শেখাব। কাগজ দাও।”

ছেলেটা একটা ছোট কাগজের প্যাড নিয়ে এল।

“দেখ আমি তোমাকে শেখাচ্ছি। আমি একটা সোজা রেখা টানছি। এই রেখাটায় একশ আশি ডিগ্রি হয়। একশ আশি। এবার দেখ। আমি এই রেখার ওপর একটা ত্রিভূজ আঁকছি। হ্যাঁ এই রকম। এই কোণটা আর এদিকের এই কোণটা আর ওপরের এই কোণটা এই তিনটে কোণ মিলিয়ে একশ আশি ডিগ্রি হয়। বুঝতে পেরেছ?”

“একশ।”

“বুঝতে পারোনি। দেখ, আমি তোমাকে আবার শেখাচ্ছি। আমি এখানে একটা বৃত্ত আঁকছি।”

“একশ”

“না, একশ নয়। তিনশো ষাট। আমি তোমাকে একশ দেখাচ্ছি। এই বৃত্তের মধ্যে দিয়ে একটা রেখা টানলাম। ওপরে একশ, নিচে একশ।”

“আমি ফ্রেঞ্চ পড়তে পারি।”

“তুমি অনেক পড়। তুমি এত পড় কেন?”

“পরের বছর আমি স্কুলে যাব, “ছেলেটা বলল, “এখন নিজেকে জাহির করতে চাইছে, নাক বরাবর তাকিয়ে, নিচের ঠোঁটটা ঝাঁক করে, দু’হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে জ্যামিতি বইটা ধরে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে, “আমি আরও স্কুলের বই কিনব। বড় চাকরি পাব।”

কথাগুলোয় একটা প্রতিধ্বনি ছিল। ববি বুঝল, আগেও কেউ এই রাস্তায় হেঁটেছে। ববির মনে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের বাসনা ছিল না, কারণ ওর সেদিন সব আশাই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন, ছেলেটার জন্য দুঃখ অনুভব করে, ওর আগেও বোধহয় ওর মতো কোনো শিক্ষক ছিল, ও দেখল দুঃসাহসিক অভিযান আসছে; আর প্রায়ই যেমন হয়, এটা এমন সময়ে আসে, যখন এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত; কাজেই মনে হয়, এটা প্রায় একটা পুরস্কারের মতো। ছেলেটাকে পড়াতে গিয়ে ভালো করে দেখাই হয়নি। এখন ও দেখল, ছেলেটার মাথায় তেলের ওপর ধুলো জমে আছে; ছেলেটার রোগা, শক্ত গলাটা দেখল। আর ছেলেটা বুঝল যে ওকে জরিপ করা হচ্ছে, আর তাই ও ফ্রেঞ্চ বইটার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকাল, ওর ফোলা ঠোঁট নাড়িয়ে।

“তোর নাম কী?” ববি ছেলেটার কানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

“ক্যারোলাস।” ছেলেটা চোখ তুলে তাকাল না।

“তোর নামটা ভারী সুন্দর।”

“আপনি আমায় ফ্রেঞ্চ শেখান।”

ফ্রেঞ্চ ব্যাকরণ বইটা, ওটার ন্যাতানো লাল মলাটটায় দাগ লাগা, চটচটে, রং ওঠা আর বেঁকে যাওয়া, একজন আইরিশ যাজকের লেখা আর আয়ারল্যান্ডে ছাপা।

“কতদূর পড়েছিস? এতদূর? পার্টিটিভ আর্টিকল?”

“পার্টিটিভ।”

“ইংরেজিতে কোনো পার্টিটিভ আর্টিকল নেই। তুই বলবি না, ‘আমাকে একটু কালি এনে দাও’।” ববি থামল, ভাষা শেখানোতে অপ্রত্যাশিত মুশ্কিল এসে যায়।

“ফরাসি ভাষায় তুই বলবি, ‘আমাকে কিছু কালি এনে দাও’।”

“কিছু কালি?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই।”

ববি ছেলেটার দিকে তাকাল, ছেলেটা বই এর দিকে তাকাল আর ঠোঁটের ওপর ওর মোটা জিভটা বুলিয়ে নিল।

“বার কটার সময় বন্ধ হয়?” ববি শুধাল।

“আপনি আমায় ইংরেজি শেখান,” ছেলেটা বলল, “আপনি আমায় ফ্রেঞ্চ শেখাবেন না। আপনি ফ্রেঞ্চ জানেন না?”

“আমি ফ্রেঞ্চ জানি। দেখ, আমি তোকে শেখাচ্ছি। ইংরেজিতে তুই বলবি ইঙ্ক।”

“ইঙ্ক।”

“আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলবি, লেএন্ক্রে।”

“লিঙ্ক।”

“বার কটার সময় বন্ধ হয়?”

“যে কোনো সময়। লিঙ্ক। আপনি আমায় আরো শেখান।”

“আমাকে একটু ইঙ্ক এনে দাও। আমাকে দ্য লে এনক্রে এনে দাও। দ্য লে এনক্রে। যে কোনো সময় মানে কী?”

ছেলেটা লাজুক মুখ করল। ওর জীর্ণ আইরিশ বইটার ওপর মাথা নামিয়ে রইল, আর ববি ওর মাথার ওপরটা দেখতে পেল। ওর স্প্রিং-এর মতো চুলের গুচ্ছগুলোর ভেতরে ভেতরে তুলোর ফঁসো আটকে আছে।

“বার রাত দশটায় বন্ধ হবে।” ছেলেটা বলল।

“তুই রাত দশটায় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবি।”

ছেলেটা মাথাটা আরো নিচু করল। “রান্নাঘর বন্ধ।”

“তুই আমাকে চা এনে দিবি। চার নম্বর ঘর। আমি তোকে আরো শেখাব।” ববি ওর আঙুল ভাঁজ করল আর বারের ছেলেটার তেলতেলে চুলের গুচ্ছগুলোকে আঙুলের গাঁট দিয়ে ঘষতে লাগল। “আমি তোকে শিলিং দেব।”

“রান্নাঘর বন্ধ,” ছেলেটা বলল।

ববি ওর হাতের তেলো ছেলেটার শক্ত গলার ওপর রাখল, অর্ধেকটা স্প্রিং-এর মতো চুলের ওপর, অর্ধেকটা উষ্ণ চামড়ার ওপর। “বেশ দরাদরি করতে পারিস্ তো?” ও বলল এবং হঠাৎ-ই ছেলেটার মুখটা কাউন্টারের ওপর দিয়ে নিজের মুখের কাছে টেনে এনে ওর কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, “আমি তোকে পাঁচ শিলিং দেব।”

ছেলেটা মাথা সরাল না আর ববি, ছেলেটার মাথাটা তখনও চেপে ধরে, ওর বাঁ কানের নিচে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল, ওর আফ্রিকান চামড়ার নিচে মসৃণ হাড়টা ওর হাতে লাগল। ছেলেটা একদম স্থির হয়ে গেছে। ববির চোখে জল এসে গেল এবং যদিও ও নিজের বুড়ো আঙুলটার দিকে আর ছেলেটার কানের জটিল নক্সার দিকে এবং ওর মোটা চুলের স্প্রিং-এর মতো গুছিগুলোর দিকে তাকিয়েছিল; ও কিন্তু ছেলেটার কথা বা কুকুরগুলোর কথা বা যে ঘনিষ্ঠতা ঘটতে যাচ্ছে, তার কথা ভাবছিল না; ও শুধু নিজের কোমল স্বভাব আর বিষণ্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করছিল। যেটা এই রকম মুহূর্তে মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়।

হঠাৎ ছেলেটা লাফ দিয়ে সরে গেল।

ববির গাড়ির বিপদ-সংকেত তীব্র আওয়াজে বাজছে। তীব্র ধাতব কম্পন একটা কেন্দ্রীভূত, নাছোড়বান্দা আর্তনাদের সাথে সাথে উঠছে, পড়ছে। হোটেল প্রাঙ্গণ আলোয় ভরে গেল, একটার পর একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠছে। কোয়ার্টার গুলোতে উচ্চস্বরে কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল, তারপরেই ওটা সমবেত চিংকারে পরিণত হল।

“পিটার!” কর্নেল ডাকছেন, “পিটার!”

কোয়ার্টারগুলো থেকে স্ত্রীলোকেরা আর্তনাদ শুরু করল। প্রাঙ্গণে সর্বত্র পায়ের শব্দ, ছোটাছুটি; হোটেলের ভেতরেও।

ছেলেটা ববির দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে আছে

বিপদ সংকেত তীব্র আর্তনাদ করেই চলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গাড়ির দুলুনি বন্ধ হয়ে গাড়ি স্থির হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা বাজতেই থাকবে।

“পিটার!” কর্নেল ডাকলেন।

ববি বারান্দায় এল। বারান্দার শেষে কর্নেলের ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা; ঘরের পেছনদিকের জানালা দিয়ে আলোকিত প্রাঙ্গণ চোখে পড়ছে।

গ্যারেজটা একটা খোলা ছাউনি। একটা আঢাকা বাল্ব জ্বলছে আর চারিদিকে ঘন ছায়া। গাড়ির দুলুনিটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিপদ-সংকেত বেজেই চলেছে, কেন্দ্রীভূত আর্তনাদের মতো শব্দটা নেই।

ববি দেখল, কোনো চাকা চুরি যায়নি, কোনো চাকার ঢাকনা খুলে নেয়নি।

বিপদ-সংকেতের আর্তনাদের মাঝে মাঝে খানিকক্ষণের স্তব্ধতা, তারপর আওয়াজটা আস্তে আস্তে কমে এল, তারপর ছোট ছোট হেঁচকির মতো আওয়াজ তুলে একেবারেই থেমে গেল। তারপরেই জেগে-ওঠা হোটেল প্রাঙ্গণের আলোকিত উজ্জ্বলতা একেবারে চমকানো মনে হল।

ববি বার-এ ফিরে গেল। ছেলেটা তখনও ওর দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল। ও বার-এর সব আলো জ্বেলে দিয়েছে।

“পিটার!” কর্নেল ডেকেই চলেছেন।

শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টারগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

“কুকুর কিংবা বিড়াল গাড়ির ওপর লাফিয়েছিল, স্যার।”

“তুই কি ঘুমোচ্ছিলি?”

“ঘুমোচ্ছিলাম, স্যার।”

“তুই দারুণ বোকা।”

স্ট্রীলোকেরা আতর্জনাদ শুরু করল।

“তাকে বেঁধে রাখব। টিমোথি! ক্যারোলাস!”

বারের ছেলেটা মাথা ঝাঁকি দিল, কিন্তু নড়ল না।

আতর্জনাদ হয়েই চলেছে, কর্নেলের জেরা, নম্র জবাব, কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

“ক্যারোলাস!”

এবার ক্যারোলাস নড়ল। ওর আধ-খোলা মুখ শক্ত আর স্থির হয়ে গেল। ওর স্লাফেরা কীরকম বিশৃংখল, ওর হাত পা যেন ভারী। ও বারের পেছনের দরজাটা খুলে ববির দিকে পেছন ফিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওর হাতটা পেছনে দরজার ওপর। অন্ধকার চওড়া প্যাসেজের ওপারে একটা দরজার অর্ধেকটা খোলা, তার ভেতর দিয়ে ববি আলোকিত প্রাঙ্গণের, একটুখানি দেখতে পেল। জলের ট্যাস্কের গোল গোল ধাতব খুঁটিগুলোর ওপরে আঢাকা বাতিগুলো জ্বলছে, চুনকাম করা কোয়ার্টারগুলোর ওপর আলো পড়েছে, আরো পেছনের ঝোপঝাড়গুলো কালো হায়ায় চকচক করছে আর কৃত্রিম মনে হচ্ছে।

“ক্যারোলাস!”

ও দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল আর বারের মধ্যে ববি একা হয়ে গেল। সব আলোগুলোই জ্বালানো বলে ঘরটা এখন বন্ধ দেখাচ্ছে।

বাইরে, মেয়েলোকগুলো সমানে চোঁচিয়ে চলেছে, একজনের পরে আরেকজন করে, এক সঙ্গে কেউ শ্বাস নিচ্ছে না। পুরুষকণ্ঠগুলো কী বলছে, বোঝা অসম্ভব। আতর্জনাদগুলো খুব সরল সাধারণ শব্দ হয়ে গেল, পটভূমির অঙ্গ হয়ে গেল।

বার-এর পেছন দিকে, একটা ফ্রেম বাঁধানো ফটোতে, ফটোটা বড় করা, কিন্তু যথাযথ নয়, একটু নৌকোয় একটা লোক বড় একটা মাছ উঁচু করে ধরে আছে, উজ্জ্বল সূর্যালোকে, লোকটা হাসছে। আবহাওয়া, মেজাজ আর যা কিছু সঠিকভাবে বোঝানো হচ্ছে, সেগুলো একটা বিশেষ দিনের। একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে, একটা আফ্রিকান ভূ-নশ্যের ছবি, বেলজিয়ান মদের কারখানার, বেলজিয়ামের আর আফ্রিকার শহরের নামগুলো একই লাল টাইপে ছাপা হয়েছে। অর্ধেক খালি তাকগুলোর রঙ পুরোনো হয়ে গেছে, দাগ পড়ে গেছে, বাদামি রঙের নিচে ঘি রঙ; এক কোণায় আধডজন প্রায় খালি মদের বোতল রয়েছে। পুরনো শুকনো, দাগ-ধরা লেবেল সাঁটা।

বাইরের আর্তচিৎকার কমে এল, আর পটভূমি রইল না। ববি কর্নেলের গলা শুনল। আর্তচিৎকার আবার বেড়ে গেল, কমে গেল, তারপর চুপ হয়ে গেল।

ববি বার থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দা হয়ে ঘেরা প্যাসেজটিতে চলে এল। যে দরজাটা উঠানের দিকে খোলে, সেটা খোলা রয়েছে। ও তাকিয়ে দেখল না। চতুর্দিকের উজ্জ্বলতা, চলাফেরা সম্বন্ধে ও সজাগ। ও আরো জানে যে, ওকে লক্ষ করা হচ্ছে।

দোতলায় উঠে ও যখন নিজের ঘরের দরজা খুলছে, শুনল, লিভা তার ঘরের দরজা খুলছে। ও পরে আছে একটা খাটো সুতি পোশাক; ওর চকচকে পায়ের হাড় ওর কনুই-এর মতোই ধারালো।

ও ফিসফিস করল, “পিটার? আমি জানতাম, আমি জানতাম।”

ববি আবার বুঝতে পারল যে, লিভা ওকে একটা নিরপেক্ষ ঘনিষ্ঠ বিবাহিত জীবনের মতো সম্পর্কে জড়াতে চাইছে। আর যদিও ও একটু একটু এই সম্পর্কটা চাইছিল, ও ছিল কামবিকৃত। তাই ও মুখ শক্ত করল, যেন নিচে যা হয়েছে, তাই নিয়ে ওকে বিশেষভাবে জড়িত করা হচ্ছে, অতএব ও লিভার দিক থেকে সরে গেল, আর, কোনো কথা না বলে নিজের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল।

ঘরের ভেতরটা উঠানের আলোর আভায় অপ্রত্যাশিত উজ্জ্বল। ও দরজাটা বন্ধ করল, শেষ মুহূর্তে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করল। ঘরের মেঝেয় ও কিছু একটাতে লাথি মারল। ওর আলো জ্বালানোর প্রয়োজন নেই ওটা কী তা দেখতে, কারণ ও জানে, ওটা ওর গাড়ির চাবি।

জামাকাপড় ছাড়ার পর, ববি একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনধিকার প্রবেশকারী একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হতে পারত এবং ও গাড়ি ছাড়া এখানে ফাঁদে পড়তে পারত। ও ঠিক করল, জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে, প্রয়োজন পড়লে যত শীঘ্র সম্ভব, পালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। ও একটা চেয়ারের পাশে নিজের প্রয়োজনের জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল; প্যাক করা সুটকেস, ট্রাউজার্স, হল্‌দে দেশি জামাটা, জুতা, মোজা। ও খালি গেঞ্জি আর অন্তর্বাস পরে বিছানায় শুল। কোনো মানে হয় না, স্রেফ পাগলামো; আফ্রিকানদের ঘেরা জায়গায় একত্র সমাবেশের এইটাই চরিত্র। কিন্তু উঠানের আলোগুলো যখন আবার নিভে গেল আর ও নিজেকে অন্ধকারে একা পেল, তখন, ও যা করেছে, তার জন্যে খুশিই হল।

দরজায়, একটা শব্দ হ’ল, কিন্তু এত মৃদু, যে ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায় না। ও অপেক্ষা করতে লাগল। শব্দটা আবার হল। ও উঠে বসল; আলো জ্বালানো না। দরজাটা খুলে গেল, বারান্দার আলোটা কেউ জ্বালালো। লিভা নয়, ক্যারোলাস, একটা চা-এর ট্রে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল; হোটেল তো হোটেলই হয়।

“দরজাটা বন্ধ কর,” ববি বলল।

ক্যারোলাস দরজা বন্ধ করল।

“তুই চা এনেছিস, ক্যারোলাস? তুই খুব ভালো ছেলে। আন্, এইখানে চা-টা আন্।”

ক্যারোলাস বিছানার পাশের টেবিলে চায়ের ট্রে-টা রাখল। যেমন ওর হাত-পাগুলো চটপটে ভাব হারিয়েছে আর ও জড়সড় হয়ে হাঁটছে, তেমনি ওর মুখভাবও পাল্টে গেছে। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে, ঠোঁট মোটা, শুকনো, ভাঁজ পড়ে গেছে, একটু সাদাটে ভাব, ওর সারা মুখমণ্ডলে আশঙ্কা আর অবিশ্বাসের ছাপ।

“তুই এখানে বোস। আমার সঙ্গে কথা বল। আমি তোকে শেখাব।”

ক্যারোলাস ওর লাল কোটের আঁটো পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল।

“আমি তোকে ফ্রেঞ্চ শেখাব? তোকে একশ’ গোনা শেখাব?”

কাগজটায় চা-এর দাম লেখা। নরম পেন্সিল দিয়ে কর্নেলের দৃঢ় হাতের লেখা।

রাগে ববির গা জ্বলে গেল। আর ক্যারোলাসের ভারী মুখখানা দেখে ওর রাগ আরো বেড়ে গেল। ও হুকুম করল, “পেন্সিল।”

ক্যারোলাস সঙ্গে সঙ্গে তৈরি।

“ঠিক আছে, এবার বেরো।” ববি বলল, পেন্সিল আর কাগজের টুকরোটা ফিরিয়ে দিয়ে।

ক্যারোলাস নড়ল না, ওর মুখভাব বদলালো না।

“তোকে দেব? কিচ্ছু দেব না। চাবুক দেব।”

এটা কিন্তু সত্যি নয়। এগুলো অন্য লোকদের কথা। ববি নিজেকেই অবমাননা করছে। বিছানায় উঠে বসে আফ্রিকানটার উত্তেজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে ও দেখল যে, ওর মুখের কাছে এগিয়ে আসা সারা মুখটায় একটা শূন্য নির্বোধ রাগ ছেয়ে আছে। আতঙ্কে ওর নিজের রাগ উবে গেল। এমন একটা আতঙ্ক যা ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কোনো যুক্তির বাইরে।

ও তাড়াতাড়ি বলল, “ঠিক আছে, আমি দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোকে দেব।”

ও টেবিলের ওপরে রাখা খুচরো থেকে একটা শিলিং তুলল।

“আপনি আমাকে পাঁচ দেবেন।”

“দিচ্ছি, দিচ্ছি।”

টাকাটা হাতে পেয়েও, ক্যারোলাস সন্দেহের চোখে টাকাটা দেখল, তারপর হাত থেকে চোখ তুলে ববির দিকে তাকাল। আর ক্যারোলাস দরজার দিকে হাঁটা শুরু করতেই, ববি বুঝে গেল যে, ক্যারোলাস সব জঙ্গল থেকে এসেছে। এবং ববি বুঝতে পারল যে, ও ছেলেটার মুখভাব ঠিক মতো পড়তে পারেনি, যা ওর মুখে ছিল না, সেটাই কল্পনা করে নিয়েছে।

ও বলল, “এই ছেলে।”

ক্যারোলাস থেমে গেল। ববির দিকে ঘুরতে শুরু করল।

“আলোটা নিভিয়ে দিস্।”

ক্যারোলাস আলোটা নিভিয়ে দিল। আর যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আন্তে করে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ববি বিছানার পাশের আলোটা জ্বালল। এককাপ চা ঢালল। চা-টা হালকা, আর চা-পাতায় ভর্তি। জল খুব বেশি গরম না করেই চা পাতা ভিজানো হয়েছে। চা-টা একেবারে বাজে।

BanglaBook.org

ও একটা গাড়িতে একজন মহিলার সঙ্গে রয়েছে, মহিলার পরিচয় ও সঠিক জানে না। ওরা ঝগড়া করছে। মহিলা যা কিছু বলছে, সব সঠিক; ওর সব কথাই আঘাত করছে; আর যদিও সবকথারই উত্তর আছে, ববি কিছুতেই বোঝাতে পারছেন না। মহিলার চিৎকারের ওপরে ওকে চিৎকার করতে হচ্ছে। ও তারস্বরে চৈঁচাচ্ছে; আর ওরা ফাঁকা রাস্তায় বিপজ্জনক ভাবে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে চলেছে, ওর হাতের মধ্যে স্টিয়ারিং হুইলটা লাফাচ্ছে। এদিকে মহিলা ওকে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে, আরো, আরো গভীর আঘাত, আর ওর মাথায় রাগ চড়ে যাচ্ছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে, মাথাটা ফেটে যাবে। ও এখন আর গাড়িতে নেই। ও একটা লোক ভর্তি ঘরে একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, লোকগুলো বকবক করে যাচ্ছে। ওর মাথা ফেটে যাচ্ছে, ও পড়ে গেল, ওদের সকলের সামনে ঘরের মেঝেতে, লম্বা হয়ে পড়ে আছে।

যখন ও জাগল, ওর শুধু মাথার যন্ত্রণার কথাটাই মনে আছে। মহিলাটি, তার যুক্তিতর্ক, সব স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। কিন্তু ক্ষতটা রয়ে গেছে, ঘরটা অন্ধকার, কিন্তু সেই জাতীয় অন্ধকার, যাতে বোঝা যায়, শিগগিরই অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠবে। ও চিন্তা করল; রাত্রের প্রথম দিকে কী করেছে, সন্ধ্যা বেলায় কী কী ঘটেছে, এবং যাই হোক না কেন ও জলদি চলে যাবার জন্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত। শুধু প্যান্ট আর দেশি জামাটা পরে বাকী, তার পরেই ও বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পেট্রল! ওর গাড়িতে পেট্রল যথেষ্ট নেই, ট্যাঙ্কটা পুরো ভর্তি করেনি। ওর স্বপ্নে যেমন হয়েছিল, তেমনি বার বার ওর আতঙ্ক হতে লাগল। তারপরেই, দিনের আলো ফুটে উঠল। কোয়ার্টারগুলো থেকে হাল্কা কিচির মিচির, পেছন দিকের গাছপালাগুলোর এক ঝলক, যেটা ও আগের দিন সন্ধ্যায় দেখতে পায়নি আর নিচের রেডিও, আফ্রিকান সংবাদ পরিবেশক রাজধানীর সংবাদ পড়তে গিয়ে, হিংস্র শব্দগুলোতে হোঁচট খাচ্ছে।

ও যখন নিচে খাবার ঘরে গেল, তখন আলো, খোলামেলা, লেক, সব কিছু ওকে অবাক করে দিল। আকাশ কত ওপরে, নীল; উদ্যানবীথিকার শোভাময় পামগাছগুলোর পেছনে লেকটা দিগন্তবিস্তৃত। আগের দিন সন্ধ্যায়, জানালার তারের জাল ঘরটাকে যেন আবদ্ধ করে রেখেছিল; আর এখন ওতে আলো আ,তে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না আর তারের জাল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। গত সন্ধ্যাটা ছিল উষ্ণ মন্ডলের ভিজ, ভারী, অন্ধকার এক সন্ধ্যা; আর এখন টাটকা বাতাস। হোটেল,

উদ্যানবীথিকা, পার্ক, লেক; পর্যটন-আবাসের আবহ কিছুটা এখনও বেঁচে আছে। আর আজ সকালে, উদ্যানপথে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। হোটেলের কংক্রিট দেওয়ালের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটা সেনাবাহিনীর লরি ধীরে ধীরে বাঁদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে।

কর্নেল, আগের মতোই জামাকাপড় পরে নিজের টেবিলে বসে আছেন। ওঁর প্রাতরাশ প্রায় শেষ; উনি এখন চা খাচ্ছেন, আর বই পড়ছেন। ববি ওর হৃদে রঙ-এর দেশি জামা পরে, লেক, আলো, সব ভুলে গেল, বাঁ হাত একপাশে সোজা, ডান হাত দুলিয়ে, দ্রুত, কঠিন ভঙ্গীতে হেঁটে অন্য যে আরেকটা টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে, সেটায় পৌঁছে গেল। বসে, মুখটা শক্ত করে, ও কর্নেলের দিকে তাকাল; কিন্তু কর্নেল পড়েই চলেছেন। টেবিল ঢাকনাটার ওপর খাবারের টুকরো, মাখনলাগা মারমালেড টেবিলে অবিন্যস্ত পড়ে আছে; লিভা ইতিমধ্যেই নিচে এসেছে, বোঝা যাচ্ছে। কঠিন ভঙ্গীতে ববি একটা ঠাণ্ডা টোস্টের ওপর মাখন লাগাল।

“সকালের খবর ভালো নয়,” কর্নেল বললেন। ওঁর কণ্ঠস্বর শিথিল, অমনোযোগী। “তবুও, আমি মনে করি যত তাড়াতাড়ি এসব ব্যাপার শেষ হয়, ততই সকলের মঙ্গল।”

ববি, শক্ত টোস্টটায় কামড় বসিয়ে, একটা সংক্ষিপ্ত, উদাস হাসি হাসল। কর্নেল দেখলেন না, উনি বই এর পাতা ওল্টানোয় ব্যস্ত।

টিমোথি, ওর গায়ের গন্ধ সকাল বেলার হালকা হাওয়ায় তীব্র, প্রাতরাশের খাদ্য-সূচিটা এগিয়ে ধরল। এই কার্ডটা যেমন ময়লা, টিমোথি যে লাল চেক্‌চেক্‌ ন্যাকড়াটা দিয়ে টেবিল মুছছে, সেটাও তেমনি ময়লা। ওর ভাব-ভঙ্গি আজ সকালে বেশ খোলামেলা। ও খুব চঞ্চল, প্রায় অন্তরঙ্গ, মনে হচ্ছে কথা বলার জন্য ছটফট করছে। ন্যাকড়াটা প্রত্যেকবার ঝাড়ছে আর ওর নিজের গায়ের গন্ধ আরো একটু ছড়চ্ছে।

আরও একটা লরি হোটেলের পাশ দিয়ে গর্জন করে চলে গেল।

“আজ সকাল থেকে সেনাবাহিনী যাচ্ছে,” কর্নেল বললেন, “যখন আমাদের সেনাবাহিনী রাস্তায় বের হয়, তখন আমাদের রাস্তায় বের হওয়া ঠিক নয়। আমি নিজে সবসময় ওদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলি।”

“মনে হয় রাস্তা এখনো ভেজা,” ববি বলল।

“ওঃ, দু’একটা লরি তো পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে পড়বেই।”

কর্নেল সোজাসুজি ববির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আজ সকালে কর্নেলকে বেশি বুড়ো লাগছে; কিন্তু ওঁর মুখের ওপর কোনো শ্রান্তির ছাপ নেই; ওঁর চোখের আর মুখের চারপাশের চামড়া নরম আর কমণীয় মনে হচ্ছে।

ববি রসিকতাটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারল না।

কর্নেল বুঝলেন। “ওরা রাস্তাটাকে যাচ্ছেতাই করে ফেলবে।”

“আমার কিন্তু মনে হয়, রাস্তাটা তাড়াতাড়িই শুকিয়ে যাবে,” ববি বলল, “এই রোদে।”

“ও, এই রোদে অল্প সময়েই শুকিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত।”

এটা যেন আরো খানিকক্ষণ থেকে যাওয়ার আমন্ত্রণ। এটা অপ্ৰত্যাশিত। কিন্তু লিভা নিচে এসেছে; আর কোনো সন্দেহ নেই, লিভা আর কর্নেল কথাবার্তা বলেছে।

একটা গাড়ি উঠানে ঢুকল। একটা দরজার শব্দ হল। কর্নেল বই-এর পাতার মাঝখানে একটা পালিশ করা বাঁশের টুকরো, কাগজ-কাটা ছুরির মতো দেখতে, রাখলেন, কোন্ পাতাটা পড়ছিলেন, তার চিহ্ন হিসেবে; বোধ হয় ওটা ওঁর পুরোনো জিনিস। উনি বোধহয় জানেন কে এসেছে, আর তাই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পিটার এলো, বারের মধ্যে দিয়ে এসে ঢুকল ওর হাঙ্কা খেলোয়াড়ি পদক্ষেপে। আজ সকালে ও খাকি জামাকাপড় পরে আছে। গত সন্ধ্যার খাকি ট্রাউজার্স আর একটা ইস্ত্রি করা খাকি সার্ট, তাতে সেনা অফিসারের স্টার-ফার আর বোতাম দেওয়া পকেট লাগানো। ওর জামার হাতা-গোটানো, একটা মস্ত বড় রিস্টওয়াচ চকচকে স্টীলের স্ট্র্যাপ দেওয়া ওর বাঁ কবজিতে। ওর হাতগুলো হাড়-সর্বস্ব, মাংসপেশি ঢিলা; ওর কনুই-এর কোঁচকানো ঢিলা চামড়া দেখে বোঝা যায়, ওকে যা দেখায়, তার চেয়ে বেশি বয়স; ওর হাতে দু’তিনটে হাতে লেখা তালিকা; ও নিশ্চয়ই বাজার করতে বেরিয়েছিল। যখন ও ববিকে দেখল, পিটার থমকে গেল, ঝুঁকে, একটু হেসে বলল, ওর নিজস্ব ইংরেজি উচ্চারণে, “সুপ্রভাত, স্যার।”

ওর হাসিতে কোনো ব্যঙ্গ ছিল না। যেন কোনো পুরোনো পরিচিতের হাসি। ওটা অবশ্য ওর অভিবাদনের অঙ্গ নয়, ওটা পিটার-এর অসম্বন্ধ ব্যবহারের অঙ্গ। ওর পোশাকের মতো, ওর ঝুঁকে অভিবাদন করার মতো, ওর উচ্চারণের মতো, পিটারের হাসিটাও ওর প্রশিক্ষণের কেবল একটা দিক মাত্র, আর এটা অন্যান্য দিকের চাইতে আলাদা। ক্যারোলাস ও টিমোথির মতো পিটারও হোটেলেরই লোক আর হোটেলের পরিচারকদের কোয়ার্টারের লোক। ব্যাপারটা একটু গণ্ডগোলের; আগেকার অধিবাসীদের বাসস্থানে যেমন সর্বদাই হয়, তেমনি ববির মনে হল, ও বুঝি অধিকার প্রবেশ করেছে।

কর্নেল যতক্ষণ তালিকাগুলো দেখছেন, পিটার খুব স্বচ্ছন্দভাবে ওঁর টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন পিটার ববিকে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে আর হেসে, চলে গেল, কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, বইটা বুকে চেপে ধরে। উনি নিজেকে সোজা করলেন, আর কাঁধ দুখানা পেছনে ঠেলে দিলেন। তারপর দাঁড়িয়েই একটু ইতঃস্তত করলেন, যেন উদ্যান-পথের ওপর সেনাবাহিনীর লরির আওয়াজ শুনছেন।

উনি ববির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, “এই রকম সময়ে আমার সর্বদাই মনে হয় যে, সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের যত কাছাকাছি থাকা যায়, ততই নিরাপদ। ওরা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে থাকে। জানিনা, তুমি বিদ্রোহের সময় এখানে ছিলে কিনা। এমন কি, রোজা পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিল। ও এক সপ্তাহ কোথায় ছিল, কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু এখানে সব কিছু ঠিকঠাক ছিল।”

ববি কিন্তু এখনও অনিশ্চিত ।

“অবশ্য এ সবই দু’একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে,” কর্নেল বললেন, “সবাই শান্ত হয়ে যাবে । একদিন, কি, দুদিন ।”

“আমরা তোমাদের দুপুরের খাবার তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব । তোমরা কারফিউ-এর অনেক আগেই কালেক্টরেটে পৌঁছে যাবে ।”

“তাহলে এটা সরকারি ঘোষণা, কারফিউ?”

“বিকেল চারটে থেকে । আমরা তোমাদের ঠিক সময়েই রওনা করে দেব ।”

পরে, ববি যখন আবার নিচে নেমে এল, দেখল লিভা বারান্দায় রয়েছে । ও কালো চশমা পরে ঝকঝকে লেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে । ও জামাটা পাল্টেছে কিন্তু আগের দিনের সেই নীল ট্রাউজার্সই পরে আছে । ওটার কাদা ঝেড়ে ফেলার পরও হালকা ধুলোটে দাগ দেখা যাচ্ছে ।

ও বলল, “কর্নেল তোমাকে বলেছেন?”

ববির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ও সরে গেল । ওরা এখনও ঝগড়ার মেজাজেই রয়েছে । ববিরও কথা বলার মেজাজ নেই; ও বিশেষ করে কর্নেলের অস্বস্তিকর সঙ্গ এড়াতে চাইছে; আর তাই ও ঠিক করল, ও কঠোর হয়েই থাকবে । মুখখানা কঠিন করে ও অফিস ঘরের বইগুলো ঘাঁটতে লাগল, যুদ্ধের কাহিনী, ঐতিহাসিক প্রেম-কাহিনী; একটা বই বেছে নিল, তারপর বারান্দায় একটা লাল-রঙা বেতের চেয়ারে বসে পড়ল গোমড়া মুখে, বই পড়তে ।

লিভা কর্নেলের সঙ্গে সঁটে গেল । ওরা খোলা অফিসে বসে আছে, ববি শুনল, কর্নেল কথা বলছেন । তারপর ওরা হাঁটতে লাগল, উঠানে, গ্যারেজে, বাগানে, কোয়ার্টারে, আর ববি শুনল, কর্নেল কথা বলেই চলেছেন । ওরা আবার কর্নেলের খোলা ঘরটায় বসল; বেরিয়ে এল, হোটেলের চুকবার গেটে দাঁড়াল । কর্নেলের, মনে হয়, এই গেটটাই ঘোরাফেরা করবার স্থান । উনি নুড়ি-ফেলা উঠানের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন আর যে কংক্রিটের ঢালু পথ উদ্যান-বীথিকার পিচ ঢালা পথে মিলেছে, সেখানে একবারও পা রাখলেন না ।

মাঝে মাঝেই সেনাবাহিনীর লরিগুলো ধীরগতিতে চলে যাচ্ছে । সবুজ রঙের টুপিগুলোর তলায় সৈন্যদের মোটামোটা মুখগুলো ভাবলশেহীন আর সকালের মুখধোয়ার পর এখনও খসখসে কালো ।

বাতাসে আর সকালের তাজা ভাব নেই; আলোও বেশ চড়া হয়ে উঠেছে; আর ববি, বই আর ভালো লাগছে না, আবার এই পরিত্যক্ত পর্যটন আবাসের নিরানন্দ নির্জনতা অনুভব করতে শুরু করেছে । ক্যারোলাস বার-এ এল, ধুলোটে মাথা, তেল-চুকচুকে চামড়া, ওর সেই পুরোনো কালো ট্রাউজার্স আর আঁটো লাল কোট পরণে, মনে হয় ওগুলো গত সন্ধ্যার পর থেকে খোলেইনি, বা ধোয়নি । হাতে একটা ঝাঁটা আর ন্যাকড়া

নিয়ে বারের মধ্যে রীতিমত আওয়াজ তুলে ঘুরছে, পা হড়কে হড়কে হাঁটছে, যেন টিমোথির নকল করছে। তারপরেই ও ববিকে দেখল বারান্দায়। ক্যারোলাস বারান্দায় এলোই না, ঝাঁটা আর ন্যাকড়া নিয়ে পিছু হটে বার-এর মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেল, আর বেরোল না। ববি নড়ল না। ও বইটা ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর রাখল, উঠানের দিকে তাকাল, ভুরু কঁচকাল। ও শুনল, ক্যারোলাস একদম শব্দ না করে বার-এর মধ্যে কাজ করছে, যাতে কারো মনোযোগ ওর দিকে না পড়ে।

কর্নেল আর লিভা এখনও একসঙ্গে, কিন্তু এখন ওদের মধ্যে মাঝে মাঝেই নীরবতা দেখা দিচ্ছে। ওরা যখন এসে ববির টেবিলে বসল কফির জন্যে, ববি দেখল যে, ওদের কথা বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে আর তাই এখন চুপচাপ বসে পড়েছে।

ববি, এখনও কঠোর, কথা বলার কোনো উৎসাহই দেখাল না। লিভাও না, ওর কালো চশমার আড়ালে আধো-হাসি। আর কর্নেলেরও মনে হল, আর কিছু বলার নেই। ববি ভাবল, উনি এবার আফ্রিকানদের সম্বন্ধে কথা বলা শুরু করবেন।

ক্যারোলাস দরজায় কফি-ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল বললেন, “মনে হচ্ছে, লরিগুলো থেমে গেছে।”

ববি ক্যারোলাসের দিকে একবার দেখে, শূন্যে তাকিয়ে রইল, ও যে কঠিন হতে পারে, সেটা প্রদর্শন করার জন্য, এমনকি কর্নেলের সামনেও। ক্যারোলাস একেবারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল, ভয়ে কাঁপছে।

“আমার কোন্টা খারাপ লাগে জান?” কর্নেল বললেন, ওঁর দৃঢ়, চৌকোনা হাত দিয়ে কাপগুলোকে টেবিলে সাজাতে সাজাতে, “হুকুম তামিল করবার সময় এই আফ্রিকানগুলোকে এত পদদলিতের মতো দেখতে লাগে। ওই ড্রাইভারগুলোকে দেখেছ? কী আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে, আর কীরকম পদদলিত মনে হচ্ছে, যেন আজ সকালেই ওদের সকলকে মারধর করা হয়েছে। কারণ আর কিছুই না, ওদের নির্দেশকরা তাকিয়ে দেখছে, তাই।”

“এদের প্রশিক্ষণ কিছুদূর পর্যন্ত দিতে পার, কিন্তু কিছুটা,” কর্নেল বললেন, ববির হাত থেকে কাপটা নিয়ে নিলেন। “ক্যারোলাস! শিগগিরই কিন্তু ওরা ওই লরিগুলো পাগলের মতো চালাবে আর ওই একই পদদলিত লোকগুলোর মুখের চেহারা কুৎসিত হয়ে যাবে। ক্যারোলাস!” ক্যারোলাস দরজায় দাঁড়িয়ে, ববির দিক থেকে কর্নেলের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছে।

ববি ক্যারোলাস-এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

“ক্যারোলাস,” কর্নেল ডাকলেন, সকালে এই প্রথম তাঁর কঠিন স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল, “এই কাপটা একবারে যাচ্ছেতাই নোংরা।”

ক্যারোলাস আরেকটা কাপ নিয়ে এল। ওরা কফি খেল। কিন্তু কর্নেলের বিরক্তি, যেটা প্রথমে ভান মনে হয়েছিল, রয়েই গেল। সকালবেলার প্রশান্তি মিলিয়ে গেছে; ওঁর মুখটায় ফের ক্লান্তির ছাপ। লিভা একদম চুপচাপ, ওর কালো চশমার পেছনে হাসছে; যেন ওর ভেতরে খুব প্রশান্তি।

ববি কঠোর ভাব বজায় রেখেছে।

কফি খাওয়ার পর কর্নেল ওদের ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। তারপর যদিও ওরা শুনল যে, উনি রান্নাঘরে ওদের দুপুরের খাবার ব্যাপারে কথা বলছেন, কিন্তু পরে উনি এমন ব্যবহার করলেন, যেন ওরা এখন থেকে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। উনি বার-এ এলেন না, বা ওরা যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল, তখন খাবার ঘরেও এলেন না। টিমোথি, এখন আর ছটফটে নয়, ওদের বিল নিয়ে এল আর টাকা নিয়ে গেল।

ববি আর লিভা যখন ওদের সুটকেস নিয়ে নিচে নেমে এল, তখন কর্নেল উঠানে রয়েছেন, কিন্তু ওদের দিকে দেখলেন না। ববি যখন ওর গাড়ির তালা খুলল, আর বিপদ-সঙ্কেতটা বেজে উঠল, সেটাও যেন উনি শুনতে পেলেন না। পকেটে হাত রেখে কর্নেল গেটে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি রাস্তাটার দিকে দেখছেন, লেকটা দেখছেন, কখনো বা হোটেল বাড়িটা দেখছেন, যেন দূর থেকে একটা ছবি দেখছেন। উনি গাড়ির স্টার্ট দেওয়াও শুনলেন না; গাড়িটা যে ওঁর কাছাকাছি এসে গেছে, সেটাও লক্ষ করলেন না। কিন্তু হঠাৎ, ববি গাড়িটা টিমে করাতে, কর্নেল সামনে ঝুঁকে লিভার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

উনি বললেন, “যদি সেনাবাহিনীর সামনে পড়, তাহলে মরার ভান করবে।”

ববি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখল, আটজন লোকের একটা দল, রাস্তাটা থেকে হোটেলের উঠানের দিকে আসছে। দু’জন ছিল পাগড়ি-পরা ভারতীয়; বাকিরা সাদা জামা আর গাঢ়রঙের প্যান্ট পরা আফ্রিকান যুবক, হয় প্রশিক্ষণ-রত সার্ভেয়ার, সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের নির্মাণের কাজের লোক, অথবা পূর্ত বিভাগের কর্মচারী। একজন ভারতীয় কর্নেলকে কিছু বলল।

“লাঞ্চ!” কর্নেল চিৎকার করলেন, “এটা রাস্তার ধারায়! তোমাদের যখন খুশি, তখনই এসে এখানে লাঞ্চ চাইবে, তা হয় না।”

কংক্রিটের ঢাল দিয়ে নেমে ববি আর লিভা উদ্দমন-পথটায় এসে গেল। দিনের বেলা দেখা গেল ওটার ভাঙাচোরাগুলো, ওরা চমকে গেল। রাস্তার ওপরের পিচের আবরণ পাতলা, জায়গায় জায়গায় ফুলে উঠেছে, ফেটে গেছে, ঠিক একটা কেকের ওপরের অংশের মতো।

“না!” কর্নেল চিৎকার করছেন, “না! না!”

“চিৎকারটা তোমাকে শোনানোর জন্য,” ববি লিভাকে বলল, “তুমি ওখানে খুব জনপ্রিয়।”

“ওরেববাস। ওঁর কিন্তু টাকাটা দরকার ছিল। আটটা পনেরো শিলিং, মানে একশ’ কুড়ি শিলিং। তাও মদ বাদ দিয়ে।”

“তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ওরা ঠিক লাঞ্চ পেয়ে যাবে। পেট্রল নিয়ে একবার ফিরে এসে দেখে যাব কি?”

লিভা চিবুক তুলে একটা অধৈর্য কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল, আর ঘুরে রাস্তার পাশের খালি বাড়িটার সবুজ সঁাতসেতে দেওয়ালের দিকে তাকাল, গত সন্ধ্যায় বাড়িটা ওর দেখা হয়নি।

পেট্রল পাম্পটা খোলা ছিল। ওরা পেট্রল নিল, ববির লুকোনো দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আবার হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়াটা এড়ানোর জন্যে ও পাশের অন্য একটা রাস্তায় গাড়ি ঢোকাল আর ওই পর্যটন আবাসন থেকে লেকের উদ্যান পথের সমান্তরাল অন্য একটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। খুব শিগগিরই ওরা শহরের প্রান্তের ছড়ানো-ছিটানো ভিলাগুলো পেছনে ফেলে এল আর পাহাড়ি রাস্তায় এসে গেল।

রাস্তাটার নরম ধারগুলো সেনাবাহিনীর লরিগুলো একেবারে কাদা-ছানা করে দিয়েছে, কিন্তু রাস্তার মাঝখানটা শক্ত আর শুকনো। এখানে-সেখানে, বিশেষ করে রাস্তার কোণাগুলোতে, বৃষ্টি আর লরি, দুয়ে মিলে পাথর নুড়ি ছিটকে দিয়েছে আর কাদাজল ভর্তি গর্ত বানিয়ে দিয়েছে: কোনো কোনো জায়গায়, যেখানে রাস্তাটা বসে গেছে, বড় বড় পাথর উঁচু হয়ে আছে; তবে রাস্তাটা মোটামুটি ভাবে ঠিক আছে। এই দিকটায় রাস্তা সারানোর লোকেরা আসেনি, রাস্তার ওপরে কেউ মাটির স্তূপ ঢেলে দেয়নি।

ওরা ওপরে উঠে চলেছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকল, তখনও উজ্জ্বল, রাস্তার ওপর আর কালো ঝোপঝাড়-ওয়ালা পাহাড়ের ধারগুলোতে নরম সূর্যের আলো কোথাও কোথাও পড়েছে। লেকের আলো এবং খোলামেলা তার আর নেই। কখনও কখনও অবশ্য অনেক নিচে লেকের দৃশ্য চোখে পড়েছে, তখন আর ঝকঝক করছে না, আকাশের থেকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। আর ওরা যখন জঙ্গল থেকে ফার্ম আর বাঁশের সঁাতাসেতে উপত্যকায় বেরিয়ে পেল, তখন আকাশটা মনে হচ্ছিল আরো নিচে নেমে এসেছে, আরো দমবন্ধ, চাপা, এখানে আলোটা অন্যরকম, স্থির, মরা আলো, জলের ওপর থেকে কোনো প্রতিফলন নেই।

ওরা কথা বলছিল না।

এখন লিভা বলল, “ভাবতে অবাক লাগে, ওরা কেমন করে জায়গাটা আবিষ্কার করেছিল।” ও ববিকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, ওদের ঝগড়া এখনও মজুদ। ববি উত্তর দিল না, লিভাও আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পরে ও খুব সতর্কভাবে সীটে ওর বসার ভঙ্গীটা পাল্টালো।

বাঁশ এবং ফার্ম কমে গেল। পাহাড়ের শিরাটার ওপরে জমিটা একদম খালি। তারপরেই ওরা আবার নামতে আরম্ভ করল। একটা উপত্যকা পার হ’ল, যেমন উপত্যকা ওরা আগের দিন দেখেছিল।

আবার দেখা গেল মাঠ, ধাপ-কাটা পাহাড়, কুটির। আগের দিন বৃষ্টিতে রঙগুলো ছিল নরম, সবুজ আর ধূসর; রাস্তাগুলো কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল; মাঠগুলো ছিল ফাঁকা। আর এখন, মরা রোদে রঙগুলো বড় কর্কশ। কাদা কালো দেখাচ্ছে, গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড় সবুজ চক্‌চক্‌ করছে। যে কুটিরগুলোকে গতকাল বৃষ্টির মধ্যে আরামদায়ক আশ্রয় বলে মনে হচ্ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেগুলো ঘাসের রুম্ম কুঁড়েঘর, বেড়া দেওয়া উঠানে পদপিষ্ট কালো কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঝলমলে জামাকাপড় পরা স্ত্রীলোক আর বাচ্চারা ভিজে কালো মাটির ছোট ছোট পুটে সাধারণ চাষ করার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে। স্ত্রীলোকেরা সোজা শক্ত পায়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, ওদের চওড়া নিতম্ব শক্ত, বেশি ঝোঁকানো; এইভাবে শরীরটাকে প্রায় দু-ভাঁজ করে, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত নমনীয় ভাবে বাঁকা করে ওরা নিড়ানি চালাচ্ছে, আগাছা তুলছে আর নিজের নিজের লাইনে হাঁটছে। সমস্ত উপত্যকা জুড়ে স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঁাতসেতে আগাছাগুলো জ্বালিয়ে ছোট ছোট ধোঁয়া ওঠা আগুনের কুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। এটাই হচ্ছে জঙ্গলের মাঝারি আমলের জীবন।

রাস্তাগুলো স্বেচ্ছা জঙ্গলের রাস্তা, কোথাও পৌঁছয়নি।

সামনে রাস্তাটার একটা বাঁকে, যেখানে রাস্তার ফাঁকা ধারটা চওড়া হয়ে উঠে আবার নেমে গেছে, প্রায় আধডজন পোষা জন্তু একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, আকাশের পটভূমিতে কালো ছায়ার মতো। পরে দেখা গেল, ওদের মধ্যে দুজন ন্যাংটো মানুষের বাচ্চা। ঘোলা চোখ, কাদা-মাখা শরীর, ওরা যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটার চলে যাওয়া দেখল।

লিভা বলল, “মার্টিন-এর জন্যে ওই হোয়াইট ফাদারস্ চুরন্ট কেনার ইচ্ছে ছিল। তুমি ওদের চেনো? কয়েক শিলিং-এর বিনিময়ে মস্ত বড় এক বান্ডিল চুরন্ট পাওয়া যায়। একরকম শুকনো কলাপাতার ঝোঁপ-তে জড়ানো থাকে।”

মার্টিন, ববি ভাবল; বাড়ির কাছাকাছি আসছি তো, তাই। ও বলল, “আমি তো জানতাম, মার্টিন পাইপ টানে।”

“ও এগুলো ভালোবাসে। এগুলো ভীষণ বিচ্ছিরি, কিন্তু ও এগুলো টানে আর ধোঁয়ার নিজের ঘর ভর্তি করে। স্বেচ্ছা টান মারতে থাকে। পর্দা, বই-এর শেল্ফ, গদিগুলোর তলায়, সর্বত্র গন্ধে ভরে যায়। কর্নেলের ওখানে পাওয়া যেত। কিন্তু এবার আমি ওখানে এই জিনিস দেখতে পাইনি আর জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। মনে হয়, ওগুলো লেকের ওপার থেকে আসত। কিন্তু এখন ভাবি, বেচারী বুড়ো সাদাচামড়ার ফাদারদের চুরন্ট ছাড়া অন্য জিনিসের কথা ভাবতে হয়।”

“জানি না। আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবি যে, যখন আমাদের সময় ভালো যায় না, আমরা ভাবতে থাকি যে, সব কিছু বোধ হয় শেষ হয়ে গেল।”

“এ ব্যাপারে কর্নেলের কিন্তু কোনো বিভ্রান্তি নেই। হায় ঈশ্বর, ব্যাপারটা খুব ভীতিজনক।”

“আমি এর বিচার করতে পারি না,” ববি বলল, “উপনিবেশকারীদের এই যে জাঁকজমক, এ আমার পছন্দ নয়।”

“এখন কত কমে গেছে। মনে হয়, ওঁর যে দুর্ঘটনায় কোমর ভেঙে গিয়েছিল, তারপর থেকেই। এখন ঘরগুলো কীরকম বিশ্রী, চাকরগুলো কী নোংরা আর উনি তো নিজের দেখভাল করা ছেড়েই দিয়েছেন।”

“তাই তো হয়! যেই তুমি ওদের ওপর থেকে নজর তুলে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে।”

লিভা ব্যঙ্গটা বুঝল না। ওর নীরবতা সমর্থন বলে মনে হল।

ববি আবার চেষ্টা করল। “আমি জানতাম শুধু আফ্রিকানদেরই গা থেকে গন্ধ বেরোয়। ডরিস মার্শাল কী যেন বলেছিল? ওই যে, সভ্যতা আর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ঔপনিবেশিকদের টুকরো-টাকরা জ্ঞান দান?”

“হা ঈশ্বর,” লিভা বলল, “ওই টিমোথি।”

ববি বিষয়টা শেষ হয়ে যেতে দিল।

লিভা বলল, “আমার মনে হয়, সারা পৃথিবীতে, সব রকমের অদ্ভুত সব জায়গায় ওই রকমের শয়ে শয়ে লোক আছে।”

“ওদের জীবন ধারণ ভালোই।”

“সেটা প্রশ্ন নয়।”

“তাহলে কোন্টা?”

“আমার বিশ্বাস, তুমি বুঝতে চাইছ না। এটা এত ভয়ঙ্কর।” ওর গলা ধরে এল। ববি একটু অবাক হয়ে গেল। “বোকা লোকের কেবল নিজের ইচ্ছার জোরে বেঁচে থাকতে চাইছে। ওঃ ভগবান, যে জামাটা উনি পরেছিলেন, সেটা কী ময়লা! উনি সঙ্গ চাইছিলেন। আর উনি ঠিক ভাবছেন। ওরা ওঁকে মেরে ফেলার জন্যে অপেক্ষা করছে।”

“আমি যদি ওখানে থাকতাম, আমি নিজেই ওঁকে মেরে ফেলতাম।”

“ওই পিটারটাকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করিনা। একটু বেশি মাত্রায় অনুগত আর একেবারে মসৃণ, ওর ওই চটকদার রিস্টওয়াচটা নিয়ে।”

ববি বলল, “পিটার একটু বেশিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একথা মানতেই হবে।”

“বিশ্বযুদ্ধে কর্নেল কামানের গোলা ফাটার শব্দ পেয়েছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে, কেউ যদি ওঁকে বকাঝকা করত, উনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। বকাঝকা, এই কথাটাই উনি বলেছিলেন। তারপর উনি বললেন যে, উনি সামলে নিয়েছিলেন।”

ববি নিজের অস্বস্তি চেপে রাখল। “উনি দক্ষিণে চলে যেতে পারেন।” ববি থামল।

“ওখানে এখনও অনেক কালো চামড়া আছে, যাদের ওপর উনি ঝাল ঝাড়তে পারেন।”

“তুমি যদি এভাবে বল। তবে উনি এখন কোথায় যাবেন, তাতে কিছু যায় আসে না। উনি পিটারকে যখন আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন পিটার ছিল বাচ্চা ছেলে, সবে জঙ্গল থেকে এসেছে-”

“এবং ওকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। আমি জানি।”

“আমার মনে হয়, ওদের জীবন সুন্দর ছিল, যেমন তুমি বললে। কিন্তু কীসব অদ্ভুত জায়গায় ওদের যেতে হ’ল। স্যালোনিকা, ভারতবর্ষ।”

“কত তাড়াতাড়ি আমরা এসব শিখে নিই। আমার জানা ছিল না যে, আমরা ঔপনিবেশিকদের স্যালোনিকায় পাঠিয়েছিলাম।”

“আমি জানিই না, স্যালোনিকা কোথায়। প্রতিদিন ওই একই লেক, একই হোটেল, একই কোয়ার্টারগুলো দেখতে দেখতে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নিজেরই খাবার, একই টেবিলে রোজ তিনবার করে গিয়ে বসা, এই সব ওকে দারুণ বিরক্ত করে তুলেছে। কিন্তু তবুও উনি এই জায়গা ছেড়ে নড়বেন না। আমাকে বলছিলেন যে, কতমাস হয়ে গেল, উনি গেটের বাইরেই যাননি।”

“এটা ওঁর উইল বলে মনে হচ্ছে না। আমার একজন এইরকম পিসি ছিলেন, অন্ধকারাবৃত ইংল্যান্ডে।”

“অথচ উনি কেমন ভালো লোক। এখনও পাঁচপদের ডিনার দেন।”

লিভা ধীরে ধীরে কথা বলছিল। ববির মনে হল, ও আবার মিজেকে রহস্যময়ী করে তুলতে চাইছে। কিন্তু তারপরই ও দেখল, লিভার চোখের কালো চশমার তলা থেকে একটা সরু চোখের জলের ধারা বেরিয়ে এসেছে। ববি বলতে চাইল; আমি জানি তুমি কেন কাঁদছ। কিন্তু ও ব্যাপারটা যেতে দিল, এমন কিছু করল না, যাতে লিভার মেজাজ অন্যরকম হয়ে যায়।

ও গাড়ি চালানোতে মনঃসংযোগ করল। পাথর ফেলা রাস্তায় ওদের আগে যে সেনাবাহিনীর লরিগুলো গেছে, তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রাস্তার নরম ধারগুলোতে মাটি তছনছ হয়ে আছে, টায়ারের গভীর দাগ, কোণাগুলোতে কাদাজলের গর্ত, কোথাও কোথাও এক আধটা বিচ্যুত শিলাখন্ড, যেখানটা মাটিতে ঢুকে গেছে, সে জায়গাটা সাদা আর ওপরটায় মাটির রঙ। রাস্তাটা অবশ্য মোটামুটি ভালো, আর ফাঁকা।

“মনে হচ্ছে, তুমিই সঠিক,” লিভা বলল। “মৃতরাই মৃতদের কবর দিক্।”

উপত্যকার পর উপত্যকা। রাস্তাটা ওপরে উঠছে আবার নিচে নামছে। কিন্তু ওরা অবশ্য ক্রমাগত নিচের দিকেই নেমে চলেছে। উপত্যকাগুলো ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। মাটির রঙ আর কালো নয়, পাথরও কম। আলোটাও উষ্ণমন্ডলীয় হয়ে উঠছে।

রাস্তার পাশের বাড়িঘরগুলো আর কেবলমাত্র ঘাসের কুটির নয়, আর, সব বাড়িতে বেড়াও নেই, উঠানও নেই। ছোট ছোট ঝাঁক-ঝাঁধা কাঠ আর ঢেউতোলা টিনের ছাউনি; আর এখন মাঝে মাঝে, কিছু ধবংসস্থাপও দেখা যাচ্ছে। রোদে-জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া কাঠের তক্তা আর জংধরা ঢেউ-তোলা টিন।

রাস্তার পাশে একটা স্মৃতিস্তম্ভ মতো দেখা গেল। দেখে মনে হচ্ছে, হয় এটা যুদ্ধোত্তর স্মারক-স্তম্ভ, না হয় পানীয় জলের ফোয়ারা। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল, ওটা হচ্ছে একটা জলসরবরাহের খাড়া নল; একটা মস্তবড় কংক্রিট দেওয়াল, যার ধারগুলো ঢালু আর কোণাগুলো কাটা, তার থেকে বেরিয়ে থাকা একটা কালো নলের মুখ, “পাবলিক ওয়ার্কস্ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ২৭-৫-৫৪” এই কথাগুলো দেওয়ালটার ওপরে একটা নীল-সাদা মোজাইক টাইলস্-এর ওপর মোটা হাতে লেখা। আটটা স্মৃতিস্তম্ভের মতো জলের নলের এটা হচ্ছে প্রথমটা। তারপরেই আবার শুধু রাস্তা।

গাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই ওদের চোখে পড়ছিল একটা পাথুরে নদী, জমি যত সমতল হচ্ছে, নদীটাও তত চওড়া হচ্ছে। আর তারপরেই রাস্তাটা ঝোপের একটা কাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে এল আর একটু উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দেওয়া বাঁধের ওপর দিয়ে ছড়ানো নদীখাতের পাশে পাশে চলতে লাগল; বালি, অর্ধেক ওপড়ানো ঝোপঝাড়, পাথরের স্তূপ রোদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে, এগুলো ছোট ছোট দ্বীপ সৃষ্টি করেছে, তাদের মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ কর্দমাক্ত খাড়ি বয়ে চলেছে, তার পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে। বাঁধের কোনো আত্মরক্ষামূলক বেড়া নেই। আর এই খোলামেলা বাঁধ বিপদের আভাস দিচ্ছে।

রাস্তাটা নদী থেকে ঘুরে গিয়ে আবার ঝোপঝাড়ের দিকে গেল। কিন্তু নদীটা কাছাকাছিই রয়ে গেল; আর রাস্তাটা যখন আবার এঁকেবেঁকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল, আবার নদীর ধার দিয়ে চলতে লাগল, ববি আর লিভা দেখল, একজন সৈন্য টকটকে লাল বুকের টুপি পরে বাঁধের চওড়া কংক্রিট দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ওর শরৎ পোশাক আর মুখের চকচকে কালো রঙ, খোলা নদীখাতের পটভূমিতে পরিষ্কার আর ধারালো একটা পারস্পরিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

ও গাড়িটার দিকে, সামনে সামান্য ঝুঁকে, ওর চকচকে পালিশ করা কালো বুটজোড়া একত্রে জোড়া করে হাত নাড়ল। উপত্যকার আফ্রিকান মজুররা রোগা, ওদের কাপড়জামা ছেঁড়া খোঁড়া। সৈন্যটার ইঙ্গিত করা পোশাক ওর গোলগাল হাতে, উরুতে আর ওর সৈন্য-জনোচিত ভুঁড়িতে বেশ আঁটোসাঁটো। ও নিজের এই তফাৎটা সম্বন্ধে, ওর সৈন্যবাহিনীর পোশাক সম্বন্ধে আর সৈন্যবাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার প্রমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। ওর হাত নাড়াটা বেতপ, বেমানান আর কেমন যেন খ্যাপাতে মনে হলেও, ওর যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে বলে মনে হল। ওর গোলগাল হাসিমুখে আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট।

ববি পাথুরে রাস্তায় আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে।

লিভা বলল, “লোকটা বেশ চমৎকার এবং মোটা-সোটা।”

আফ্রিকানটার হাসি আর হাতনাড়া চলতেই থাকল, কজি থেকে হাতটা ডানার মতো নাড়াচ্ছে। গাড়িটা অবশ্য দাঁড়াল না। আফ্রিকানটার হাতটা নেমে গেল; মুখ ভাবলেশহীন হয়ে গেল।

ববি, কাঁপতে থাকা পেছনে দেখার আয়নাটার দিকে তাকাল, পলকের জন্য একটা খোলা, বিপদের অস্বস্তিকর অনুভূতি হ’ল; খোলা বেড়াহীন উঁচু বাঁধটা ওর পেছনে ঢালু হয়ে আছে, পাশ দিয়ে ওর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। ও আয়না থেকে চোখ নামিয়ে রাস্তার ওপর রাখল।

“ও যেভাবে আমাদের দিকে তাকাল, আমার ঠিক ভালো লাগছে না,” লিভা বলল, “এখন মনে হচ্ছে, ও হয়ত ওর অন্য মোটা বন্ধুদের টেলিফোন করবে, আর ওরা সামনের কোনো জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। মনে হচ্ছে, ও হয়ত এই মুহূর্তে ড্রাম বাজিয়ে সঙ্কেত পাঠানোর জন্যে দৌড়াচ্ছে।”

“আমি সবসময় আফ্রিকানদের গাড়িতে তুলে নিই।”

“আমি তো তোমাকে আটকাইনি।”

“ঠিক যা বললাম। ওরা তোমাকে যে কোনো জায়গায় খুঁজে নিতে পারবে, তোমার ওই হৃদে দেশি জামার জন্যে।”

“ঈশ্বরের দোহাই।”

ও গাড়ির গতি কমিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু এখন হঠাৎ, উত্তেজিতভাবে গতি বাড়িয়ে দিল।

“আমার মনে হয়, এর কারণ, ওরা পড়তে জানেন,” লিভা বলল, “কিন্তু ওরা খুব চালাক। আমাদের বসতি-এলাকায় তো এরকম লোক প্রচুর। মার্টিন আর আমি একদিন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম, ডরিস মার্শাল-এর বাড়ির কাজের ছেলেটা, অথবা ওকে স্টুয়ার্ড বলা উচিত, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, পুরো মাতাল, বরাবর যেমন করে, আর একেবারে বিকেলের মধ্যাহ্ন। যেই ও আমাদের দেখতে পেল, সোজা দৌড়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল আর হাত নেড়ে থামতে বলল। মার্টিন থামতে চাইছিল, আমি না করলাম। আরে, ঐ মাতাল কাজের ছোকরা পঞ্চাশ, কি, একশ ফুট দূর থেকে গাড়ির মধ্যে আমাদের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারল, আর পরে ডরিস মার্শালের কাছে হুবহু আমাদের কথাবার্তা জানিয়ে দিল। ডরিসের ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। “সাফাফ্রিকান ইটিকিট’। আমি ওর স্টুয়ার্ডকে মানসিক আঘাত দিয়েছি।”

ববি গাড়ি ব্রেক করল। যখন গাড়ি থামল, ও স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরে ওর ওপর ঝুঁকে রইল।

“ও ববি, আমি ঠাট্টা করছিলাম।”

ববি চোখ বন্ধ করল, তারপর খুলল।

“সত্যিই আমি ঠাট্টা করছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই ওকে তুলে নেবার জন্যে ফিরে যাবার কথা ভাবছ না?”

ববির মনে অস্পষ্টভাবে এই ভাবনাটাই ছিল।

“সেটা তাহলে খুব বিশী ব্যাপার হবে।”

“জানতাম, আজ সকালে আমার একটা জিনিস করা উচিত ছিল,” ববি বলল, “আমার ওগুণা ওয়াজা-বুতোরেকে অথবা বুসোয়া-কেসোরো কে টেলিফোন করা উচিত ছিল। এন্সুনি আমার এটা মনে হল।”

লিভা কৈফিয়ৎ-টা মেনে নিল। “ওদের দুজনের কেউই আজ অফিসে এসেছে কিনা, সন্দেহ।” ববি গাড়ি স্টার্ট করার চাবিতে হাত দিল।

দূরে, সমতলের দিক থেকে, একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা খুব ক্ষীণ, কখনও হাওয়াতে ভেসে আসছে, কখনও বা শোনাই যাচ্ছে না, তারপর আওয়াজটা জোর হল। ববি যখন চাবিটা ঘুরিয়েছে, তখন আবার আওয়াজটা শোনা গেল না।

ওরা সমতলের দিকে গাড়ি চালিয়ে চলেছে, হেলিকপ্টারের আওয়াজ, কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সবসময়েই ইঞ্জিনের আওয়াজ আর পাথুরে রাস্তায় গাড়ির চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে। নদীটা আবার হারিয়ে গেল, কিন্তু সমস্ত জমিটাই এখন নদীখাতের মতো ধোয়া-মোছা নদীতে মনে হচ্ছে। বাঁশের খুঁটির ওপরে কিছু ছড়ানো, ছিটানো কুটির দেখা যাচ্ছে। ফনীমনসা গাছে ফুল ফুটেছে, কালো ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটা বালির রাস্তা হয়ে গেল, গাড়ির চাকার দাগ বসে গেছে; রাস্তার কোণায় শুকনো আল্গা বালি এসে পড়েছে, যার ওপর গাড়ির চাকা পিছলে গেছে, দেখা যাচ্ছে। এই সব জমি পুরোনো, নিঃশেষ হওয়া জমি। কিন্তু তবুও এই জমি অধ্যুষিত।

দু’জন লোক রাস্তায় দৌড়ে এল। মনে হচ্ছে, এরা বোধহয় বালক। ওরা ন্যাংটো, আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চকগুঁড়ি-মাথা সাদা, একেবারে পাথরের মতো সাদা, লম্বা মনসা গাছগুলোর গিটযুক্ত আঁশ-ওয়ালা, নিচের অর্ধেকটার মতো সাদা, চূর্ণ-বিচূর্ণ মাটির মধ্যে ঢিলা শিকড়-ওয়ালা গাছের মরা ডালের মতো সাদা। চার-পাঁচ সেকেন্ড, তার বেশি নয়, সাদা মূর্তিগুলো রাস্তার পাথুরে ধার দিয়ে হাঙ্কা, ধীর পায়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াল, তারপর রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় আর পাথর-নুড়ি ভরা মাঠে দৌড়ে নেমে পড়ল।

ওদের চালচলন স্বাভাবিকই ছিল। হয়তো গাড়ি দেখে ভয় পেয়েছিল। হয়তো ওদের গায়ের ওই রঙ, যাতে ওদের মুখ, এমনকি ওদের নগ্নতা, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, দেখে মনে হয়েছিল ওরা হালকা চটপটে আর অলীক। হয়তো গাড়ির আওয়াজে ওদের ভয়-পাওয়া চিৎকার আর পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এত সংক্ষিপ্ত একটা আবির্ভাব, এত হঠাৎ আর কোনোরকম গুণগোল নেই; ইঞ্জিনের শব্দের ওপরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ তখনও শুনতে শুনতে ববি তাকিয়ে দেখলও না, ওই উজ্জ্বল, পাথরের টুকরো-ভরা ভূ-দৃশ্যের মধ্যে কোথায় ওই চক মাখা ছেলেগুলো বা লোকগুলো মিলিয়ে গেল। লিভা তাকিয়ে দেখল না। ও বা ববি, কেউ কোনো কথাও বলল না। আর, কিছুক্ষণ পরে ববি বুঝতে পারল, যে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনার জন্য ও কান পেতেছিল, সেই শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না।

এখন ওরা পুরোপুরি পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর পেছন-দিক দেখার আয়নাতে ওরা উজ্জ্বল সমতল ভূমি থেকে উঠে যাওয়া নীল সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পাচ্ছে। আবার চামের খামার আর বেড়া-দেওয়া জমি দেখা যেতে লাগল; চৌরাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট বুপড়ি; ধুলো-ভরা উঠানে বাড়ি, কুটির, দু'তিনটে কাঠের বাড়ির দোকান: পুরোনো কাঠের তক্তায় ছিলকা ওঠা ডিস্টেম্পার রঙ, দরজায় অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন, বাঁকাচোরা কাঠের ফ্রেম, অঙ্ককার অভ্যস্তর। একজন ভারতীয় ড্রাইভার চালিত পেট্রল ট্যাংকার দেখে ওরা নিজেদের গাড়ি ধীর করে দিল। হোটেল ছেড়ে আসার পর এই প্রথম ওরা মোটর গাড়ি পেল। কিন্তু এরপরে আরো গাড়ি দেখা যেতে লাগল পুরোনো লরি, পুরোনো মোটর গাড়ি, আফ্রিকানরা চালাচ্ছে। রাস্তা আবার পিচঢালা রাস্তা হয়ে গেল। ওরা একটা বাজার শহরে ঢুকছে।

আঁকাবাঁকা রাস্তাটার দু'পাশে ছোট ছোট গৈরিক-লাল রঙের সরকারী বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বাড়িগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জমিগুলো ভরাট হয়নি। শহরটার বেশির ভাগই পতিত জমি, নদীখাতের মতো ক্ষয়ে যাওয়া; সাদাটে। বাড়িগুলো ইটালিয়ান ধরনের, একটু দক্ষিণ আমেরিকান ছাপ আছে। দেওয়ালগুলো সরাসরি মাটির মধ্যে থেকে উঠেছে, কাদা-ছিটকা; মোটা পলেন্সারা করা কংক্রিট রোদে শুকানো ইটের মতো দেখতে। হেলিকপ্টার টেলিগ্রাফের খুঁটি, ঝুলে-পড়া তার, পিচ-ঢালা রাস্তার পাশগুলো ভেঙে যাওয়া, ঘসটানো ঘাসের ফুটপাথ, ধুলো আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, আফ্রিকান বাইসাইকেল, ভাঙা-চোরা পরিত্যক্ত লরি আর মোটর গাড়ি বাস-স্টেশনের ছাউনির বাইরে পড়ে আছে; শহরটা বেড়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু এখনও চলছে।

একটা ধুলো ভরা পার্কের মধ্যে আফ্রিকানরা গুটিসুটি মেরে বসে আছে, লম্বা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ সেখানে গজিয়ে উঠেছে। একটা ছোট বাজার রয়েছে, ছোট একটা ঘড়ির টাওয়ার। একটা দোকানে সব আফ্রিকানদের জন্য জামাকাপড় ঝোলানো রয়েছে। প্রত্যেকটা কাপড় হ্যাঙারে টাঙানো, হ্যাঙারগুলো এক সঙ্গে জড় করা। দেখে মনে হচ্ছে, একটা আন্দোলিত লাল কার্পেট। টাওয়ারের ঘড়িটার নিচে উঁচু উঁচু কংক্রিটের অক্ষরে রোদে শুকানো ইটের ওপর লেখা আছে মার্কেট, ১৯৫১।

ওরা শহরটা পার হয়ে গেল এবং রাস্তাটা আবার ফাঁকা। রাস্তাটা এত ফাঁকা আর বাতাসটা এত পরিষ্কার, জমিটা এত সমতল আর আগাছাহীন যে, কালেক্টরেটে যাবার হাইওয়ের বাঁধটা ওরা সেখানে পৌঁছবার কত মাইল আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিল। আর সে রাস্তাটাও ছিল ফাঁকা। কালো, চওড়া আর তিরের মতো সোজা রাস্তা। গাড়ির চাকার ঘটঘট আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল। টায়ারগুলো আবার হিস্‌স্‌ আওয়াজ করতে লাগল; মসৃণ, দ্রুত গতিতে চলার শব্দ। আধখোলা জানালার মধ্যে দিয়ে বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে।

“তুমি টের পাচ্ছ?” ববি উত্তেজিত, “এখানে কিছু বিপজ্জনক দুমুখো বাতাস বয়। যদি সতর্ক না হও, তাহলে তোমাকে রাস্তা থেকে উড়িয়ে ফেলে দেবে।”

লিভা বলল, “আমি জানি।”

গাড়ির বনেটের সাদা আভা পার হয়ে, তাপপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আসা আলোর বিকৃতি পার হয়ে, দূরে কালো পিচ, আলোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে রাস্তার একপাশে, অনেকগুলো গাড়ির বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

লিভা বলল, “ভাবছিলাম, সব কিছু কি এত ভালো যায়? রাস্তা ফাঁকা থাকলে প্রায় সময়ই এটা হয়।”

ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে এল, দেখল রাস্তার ওপর একটা ধূসর ম্যাজেন্টা রঙ-এর ভক্সওয়াগন মিনিবাস দাঁড় করানো রয়েছে; রাস্তার পাশে একটা নীল রঙ এর পিউজো সেলুন গাড়ি দাঁড় করানো এবং একটা দোমড়ানো টেম্পো পিউজো এস্টেট গাড়ি উল্টে পড়ে আছে, অর্ধেকটা একটা খানায়। নীল পিউজো দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা আফ্রিকানদের একটা লম্বা দূরত্বের ট্যাক্সি। এগুলো পার হয়ে আরও কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এটাই একমাত্র দুর্ঘটনা-গ্রস্ত গাড়ি; একেবারে নতুন, কিন্তু দুর্ঘটনার পর এত ভঙ্গুর আর বিভীষিকাময় মনে হচ্ছে।

ববি নিজের গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছে, একজন কালো প্যান্ট সাদা জামা পরা আফ্রিকান মিনিবাসটির পেছন থেকে বেরিয়ে এল। ববি গাড়ি থামাল।

“আমরা কি কোনো সাহায্যে লাগতে পারি?”

আফ্রিকানটা গাড়ির সামনের রোড-ব্লকানো কাচটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে ববি আর লিভার দিকে চেয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না।

ববি ভয়াবহ বিধবস্ত গাড়িটার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। চোখে পড়ল একটা সাদা ভক্সওয়াগন; আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো হাজারটা সাদা ভক্সওয়াগনের মতো, কালকের ভক্সওয়াগনটার মতো; কিন্তু গাড়িটার পেছন থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল, সে সাদা চামড়াও নয়, বেঁটেও নয়; সে কালো, লম্বা, পেটা চেহারা। আফ্রিকার কালো রঙ বা আফ্রিকার চেহারা নয়; লোকটার শক্তপোক্ত চেহারায় আর চামড়ার উষ্ণ রঙ-এ এমন একটা কিছু আছে, যাতে অন্য রক্ত, অন্য মহাদেশ, অন্য ভাষার ইঙ্গিত বহন করছে।

লিভা বিধবস্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রক্ত, কোনো মৃত বা আহত শরীর, জুতা, কমল, ইত্যাদি খুঁজছিল। লোকটার কর্তৃত্বব্যঞ্জক চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে জানালা দিয়ে রোদের মধ্যে ঝুঁকে জানতে চাইল, “কী হয়েছে?”

লোকটা লিভার দিকে তাকিয়ে হাসল আর গাড়ির কাছে এগিয়ে এল।

“একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা,” ও বলল, “সাবধানে গাড়ি চালাবেন।”

ও এ দেশের লোক নয়। ও নির্ভুল আমেরিকান নিগ্রোদের উচ্চারণে কথাগুলো বলল।

ওর মুখের হাসি, ওর উচ্চারণ, আর ওর অপ্রত্যাশিত সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশ ওর কথাগুলোকে কর্তৃত্বপূর্ণ করে তুলল। ববি একটা মানবিক সৌহার্দের উদ্বেজনা অনুভব করল। এটা সাধারণ আবেগ-তাড়িত মানসিকতার চাইতেও কিছু বেশি, যা ববির মনকে ছেয়ে ফেলেছে। ও নিজে সরল, সাদাসিধে আর সাদা চামড়ার লোক বলে, যখনই কোনো আফ্রিকান কর্মচারী বা পুলিশম্যানকে খুব কঠিন কোনো কর্তব্য করতে দেখে, তখনই ওর এই রকম মনে হয়। ও-ও চাইছে যে, ও কথাটা শুনেছে আর সেই অনুযায়ী কাজ করছে, সেটা দেখাবে। আর তাই ও খুব সতর্কভাবে, কালো রাস্তার ওপর হঠাৎ শুরু-হওয়া এবং হঠাৎ শেষ-হওয়া আঁকাবাঁকা কালো চাকা-পিছলানোর দাগের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে গেল। আঁচড়-কাটা সামনের কাচের ওপরের অংশ দিয়ে গাড়ির ভেতর রোদ পড়ছে; চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে ও সচেতন হল; ও গাড়ির রোদ আটকানোর ঢাকনাটা নামিয়ে দিল।

গাড়ির আয়নায়, এস্টেট গাড়িটার আর মিনিবাসটার চারপাশে কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। ববি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন যত লোক দেখেছিল, এখন তার চেয়েও বেশি লোক দেখা যাচ্ছে। তারপরেই রাস্তা বেঁকে গেল আর পেছনের ওই দৃশ্যটা হারিয়ে গেল।

চারটে কি পাঁচটা সেনাবাহিনীর লরি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লরিগুলোর পাশে ঘাসে ঢাকা পাড়ে, অগভীর খানাগুলোতে, গাছ ওপাশের জমিতে বেড়ে ওঠা বেঁটে বেঁটে গাছের ছায়ায় সৈন্যরা রাইফেল নিয়ে বসে আছে। ববি আন্তে আন্তে গাড়ি চালাতে লাগল, ওর যে কিছু গোপন করার নেই, সেটা বোঝাতে।

সমস্ত সৈন্যগুলো গাড়িটার দিকে ঘুরে তাকাল। ঘন-সবুজ টুপির তলায় ওদের কালো কালো মুখগুলো তৈলাক্ত মনে হচ্ছিল। রাস্তার পাশের সৈন্যগুলো যেন ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। ওদের মোটা মোটা গালের ওপরে চোখগুলো সরু; ওদের কপালে ভাঁজ পড়েছে, চুলহীন ভুরু মারঝামে কপালও কুঁচকে আছে। এখন ওদের হাতে বন্দুক, আর কারো হাতে বন্দুক নেই। যে সৈন্যগুলো খানা-খন্দের ওপারে গাছের ছায়ায় বসে আছে, তারা গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ববি স্টিয়ারিং হুইল থেকে এক হাত তুলে নাড়ার ভঙ্গী করল। কিন্তু কেউ ওদিক থেকে হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল না। সব সৈন্যরাই গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে, যারা হাসছে তারা এবং যারা ভুরু কোঁচকাচ্ছে, তারাও।

লিভা বলল, “ওটা দুর্ঘটনা নয়।”

ববি গাড়ির গতি বাড়াল।

“ববি, ওরা রাজাকে মেরে ফেলেছে। ওই দুর্ঘটনায় রাজা ছিলেন।”

রাস্তাটা একদম সোজা, কালো। গলপ্ত পিচ্-এর ওপর টায়ারের হিস্‌হিস্‌ শব্দ।

“ওখানে রাজা ছিলেন। ওরা রাজাকে মেরে ফেলেছে।”

“আমি জানিনা,” ববি বলল।

“সৈন্যগুলো জানে, ওরা কীজন্য হাসছে। ওদের হাসতে দেখলে? বন্য বর্বর। মোটা, কালো বুনোর দল। ওরা ওরকম করে যখন হাসে, আমি দু’চোখে দেখতে পারি না।”

“রাজাও তো কালো ছিলেন।”

“ববি, ও ব্যাপারে আমাকে আর কিছু বলতে বোলো না।”

“আমি জানিনা, আমরা কী ব্যাপারে কথা বলছি। লোকটা যা বলল, হয়ত সেটাই সত্যি। একটা দুর্ঘটনা।”

“বিশ্বাস করতে পারলে তো ভালোই। তুমি জান, আমি ভাবছিলাম এটা একটা রসিকতা। ওরা বলছিল, রাজা কোনোরকম ছদ্মবেশ ধরে ট্যাক্সিতে করে পালানোর চেষ্টা করবেন।”

“উনি এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন। দুটো পথ-অবরোধের মাঝখানে।”

“আরে রাজধানীতে তো সবাই এই কথাই বলাবলি করছিল। আমি ভেবেছিলাম, ঠাট্টা করছে। অথচ উনি ঠিক তাই করলেন।”

“এগুলো নিশ্চয়ই ধাপ্পা, এই যে বিচ্ছিন্নতা, বা স্বাধীন রাজত্ব বা এই ধরনের কথাবার্তা। এসব সাইমন লুবেরো-র ব্যক্তিগত পক্ষাঘাত। রাজা ছিলেন লন্ডনের ক্ষুর্ত্তিবাজ লোক। ওখানকার বহু লোককে উনি প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উনি ছিলেন বোকা।”

“সকলেই তো তাই বলে। এবং তাই হয়ত, আমি একথা বিশ্বাস করিনা। আমি ভাবি, একথা সত্যি হওয়া সম্ভব নয়, মূর্খামি। ওঁর এত সুন্দর অক্সফোর্ডের উচ্চারণ ভঙ্গী, এত সুন্দর লন্ডনের কথাবার্তা। আমি ভেবেছিলাম, এগুলো অভিনয়।”

“সাইমন কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, সাইমন সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সম্পূর্ণ পুলিশি অভিযান হিসেবে রাখতে চেয়েছিল।”

“অথচ তুমি ভাবতে পার যে, এই লোকগুলোর নিজস্ব গোপন ব্যাপার-স্বাপার আছে; যে, এরা যে কোনো সময়েই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে, বা পালিয়ে যেতে পারে। উনি আফ্রিকান এবং একজন রাজা। আমি ভেবেছিলাম যে, এই হেলিকপ্টার আর তার ভেতরের সাদা চামড়ার মানুষ, ব্যাপারটা এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার।”

“হ্যাঁ” ববি বলল, “উয়োগ উপজাতিরা ওঁকে ধরল।” ও নিজের তিজ্ঞতা দেখে, নিজের রাগ দেখে, যদিও বিশেষ কারো প্রতি নয়, নিজেই অবাক হয়ে গেল। তারপর একটু শান্ত হল। “উয়োগরা ওঁকে ধরল,” ও আবার বলল, “আশা করব, এই খবরটা লভনে পৌঁছবে আর ওঁর চালাক-চতুর বন্ধুরাও ব্যাপারটাকে মজাদার মনে করবে।”

ও এখনও খুব জোরেই গাড়ি চালাচ্ছে, তবে রেস করার মতো জোরে নয়।

ও বলল, “ওগুণনা ওয়াঙ্গা-বুতেরেকে আমার টেলিফোন করা উচিত ছিল। তাহলে ও এই কারফিউ-এর সমস্যাটা ঠিক করতে পারত। অবশ্য আমি ভাবছি না যে, কোনো অসুবিধা হবে। আমরা এমনিতেই সঠিক সময়েই যাচ্ছি।”

“তুমি জান ওরা আফ্রিকা সম্বন্ধে কী বলে,” লিভা বলল। “তুমি এই লম্বা দূরত্ব গাড়ি চালিয়ে যাবে, তারপর সেখানে পৌঁছানোর পর দেখবে, কিছু করার নেই। তবে বলতেই হবে যে, আমাদের পুরোনো কম্পাউন্ড এলাকাটা আবার দেখলে আমার ভালোই লাগবে।”

জমিটা আবার খোলামেলা হয়ে গেল। দিগন্ত রেখা অনেক নিচে। বহুদূরে ফিকে নীল পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, নিচু, প্রায় আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, আর মাঝামাঝি দূরত্বে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুতাকৃতি প্রস্তরময় গিরিচূড়া আর মোচার মতো আকৃতি বিশিষ্ট চূড়া, কেউ ঘনকালো, কেউ ঘনসবুজ, কিন্তু সবগুলোই কুয়াশায় অস্পষ্ট আর এগুলোই কালেক্টরেটের এই অংশ নির্দেশ করছে, রাজার এলাকা।

“চিতাবাঘ গিরিচূড়া,” লিভা বলল।

“আমার প্রিয় দৃশ্যগুলোর মধ্যে এটা একটা।”

“জন ফোর্ড-এর হলিউডি সিনেমার মতো।”

“কেমন ফিল্মি দুনিয়ার লোক! আমার কাছে এটা স্রেফ আফ্রিকা। আগামী কয়েক সপ্তাহ কম্পাউন্ডে অনেক বোকার মতো কথাবার্তা হবে। বিদেশি সংবাদ-মাধ্যমে অনেক মন্তব্য প্রকাশিত হবে। আমার অবশ্য এসবে কিছু এসে যেতনা, যদি জানতাম যে, এই লোকগুলো সত্যি সত্যি ভালো করার কথা ভাবে।

“আমি জানিনা, আমি নিজে এ বিষয়ে ভাবি কিনা। এটাই হচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি কি ভাবি, আমি নিজেই জানিনা। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি কম্পাউন্ডে ফিরে যেতে চাই।”

পরে, ওরা এত গতিতে গাড়ি চালালেও, দৃশ্যটা কিন্তু বদলাচ্ছে না, দূরত্ব যেমন আগে ছিল, তেমনি রয়ে গেছে মনে হচ্ছে, তখন লিভা বলল, “তুমি কি জান, জায়গাটাকে চিতাবাঘ চূড়া কেন বলা হয়?”

ববি লক্ষ করল যে, ওর কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে আর আবার রহস্যময় হয়ে যাচ্ছে। ও কোনো জবাব দিল না।

লিভা বলল, “আমি একবার একটা মরা চিতাবাঘ দেখেছিলাম।”

ববি রাস্তার ওপর নিজের মনোযোগ বজায় রাখল ।

“পশ্চিম আফ্রিকায় । দুপাটি দাঁতের মাঝখান থেকে লম্বা লাল জিভটা ঝুলে আছে । ওরা যখন ওটা নিয়ে এল, আমি ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, শরীরটা তখনও গরম আছে কিনা । কিন্তু ছোঁয়া উচিত নয়, কারণ গায়ে পোকা-মাছি ভর্তি । তারপরে ওরা চামড়া ছাড়াতে শুরু করল । চামড়ার ঠিক নিচে শরীরটা দেখতে যেন একটা আঁটো পোশাক পরা ব্যালে নর্তকীর মতো । ওর মাংসপেশিগুলো না দেখলে বিশ্বাস করবে না । আর ওই সব কেটে-কুটে ফেলে দিল, আগুনে পুড়িয়ে দিল । সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ভাবলাম, যাই, চিতাবাঘটা দেখে আসি । আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ।”

ও খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল । ও নিজের কথা নিজেই শুনছে ।

ববি বলল, “আমি বিশ্বাস করি না যে, ওরা রাজারও চামড়া ছাড়াবে ।”

“ওই সৈন্যগুলো যেভাবে দাঁত বের করে হাসছিল, আমার সহ্য হচ্ছিল না । তুমি ওদের হাসতে দেখেছিলে? বিদ্রোহের সময় তুমি তো এখানে ছিলেনা । আশি জন নৌ-সেনা উড়ো জাহাজে করে এখানে এসেছিল । মাত্র আশিজন, আর ওই দাঁত বের করে-হাসা সৈন্যগুলো ওদের বন্দুক ছুড়ে ফেলে দিয়ে, পোশাক-টোশাক ছিঁড়ে, খুলে ফেলে, ন্যাংটো হয়ে, জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল । সে সব দিনে ওরা দৌড়তেও পারত, এখনকার মতো মোটা তো ছিল না । আর মজা হয়েছিল বিমান বন্দরে । কম্পাউন্ড থেকে সবাই ওখানে হাজির । কিন্তু নৌ-সেনারা তাকিয়ে দেখলও না । সেই সব অল্পবয়েসি ছোকরাগুলো উড়োজাহাজ থেকে বন্দুক হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমেই হাততালি-দেওয়া ভীড়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গেল ।”

“আমি শুনেছি,” ববি বলল, “আমি মনে করি না, আফ্রিকানরাও সেকথা ভুলে গেছে । ওরা অবশ্য এটাকে মজাদার মনে করে না । এটা ওদের সবচেয়ে বড় ভয়, বেলজিয়াম আর কঙ্গোর পর থেকেই আকাশ থেকে নেমে আসা সাদা মানুষগুলোকে ।”

“এই কথা স্যামি কিষেনজীও আমাকে বলেছিল ।”

“অনেকেই ভেবেছিল যে, রাজাও এই জিনিসই চেয়েছিলেন ।”

“আমি কর্নেলের মতোই অনুভব করছি । আমার মনে হচ্ছে, আমারও বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাজার জন্যে কিছু করা উচিত ছিল । তবে এ-ও জানি যে, সেটা হত অর্থহীন

“ঠিক তাই । এটা তোমারও ব্যাপার নয়, আমারও নয় । এসব ব্যাপার ওদের নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে । আর জান তো, রাজা প্রায় করে ফেলেও ছিলেন । যদি তাঁকে না দেখতে পেত, তাহলে আর নব্বই মিনিটের মধ্যেই তিনি আকাশে উড়তেন আর লোক পার হয়ে অপর পারে পৌঁছে যেতেন ।”

“হা ঈশ্বর! তুমি বলছ, ওরা এখনও লোকের কাছে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে? ওরা নিশ্চয়ই কাল সারা রাত্রি অপেক্ষা করেছিল । ওঃ, খবরটা চাউর হয়ে গেলে কালেক্টরেটে সাংঘাতিক কান্ড ঘটবে ।”

“মনে হয়, ওরা দুএকদিন খবরটা চাপা দিয়ে রাখবে।”

“আমার মনে হচ্ছে, আমি আর কম্পাউন্ড থেকে বাইরে যেতে চাইব না।”

“সেটা তোমার পক্ষে একটা অঘটন।”

“নিশ্চয়ই,” লিভা বলল, প্ররোচনায় সাড়া দিল, “এই মুহূর্তে সৈন্যরা হয়তো সেখানে লন্ডভন্ড করছে।”

খোলামেলা দৃশ্যটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। জমি ভাঙাচোরা হয়ে উঠছে : গাছের সংখ্যা বেশি, রাস্তাটাও প্রায়ই বাঁক নিচ্ছে। ওরা বাড়িঘর, দোকান, কুঁড়েঘর, একটা গ্রাম পার হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

“প্রথম যে দিন এখানে আসি, সেদিন থেকেই আমি এই জায়গাটাকে ঘৃণা করেছি,” লিভা বলল। “আমার মনে হয়েছিল, এই সব লোকদের মধ্যে থাকার আমার কোনো অধিকার নেই। যেন সব কিছু কত সরল। ওরা সব কিছু খুব সরল বানিয়েছিল। আমি কিন্তু এসব চাইনি।”

ববি বলল, “তুমি তো জানতে, তুমি কেন এসেছিলে।”

“ওরা আমাদের নেবার জন্যে বিমানবন্দরে জিমি রুহেঞ্জিরিকে পাঠিয়েছিল। চল্লিশমাইল ধরে আমাকে জিমির সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। এমন সব কথাবার্তা, যা একজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বলতে হয়। নিজের সঙ্গে নিজেই দাবা খেলার মতো। তোমাকেই সব চাল চালতে হবে। আর আমার চোখে পড়েছিল কেবল ওই সব বিচ্ছিরি ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলো। আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে কাঁদছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখানে ভালো কিছু আমার ভাগ্যে ঘটেই নেই। আর সেই প্রথম দিন ওরা আমাদের ব্যারাকের একটা নোংরা ঘরে রেখেছিল, ওটাকে ওরা বলত, অতিথি সদন। মার্টিন-এর নম্বর বেশি ছিল না। আমরা সেটা জানতাম না। মার্টিনকে যদি এই নম্বরের প্রণালীতে বাঁচতে হয়, তাহলে ও কোনোদিনও যথেষ্ট নম্বর যোগাড় করতে পারবে না।”

“তুমিও তো খারাপ কিছু করোনি,” ববি বলল।

“পাশের ঘরে একটা মেয়ে কাঁদছিল, আর তখনও বিকেল। আমি তাতে খুব ভয় পেয়েছিলাম। ওই দিনই আমার ওখান থেকে পালিয়ে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয়েছিল, একেবারে সোজা বিমান বন্দরে চলে গিয়ে উড়োজাহাজ ধরে সরাসরি লন্ডন।”

“গেলে না কেন?”

“স্যামি কিম্বেনজীর সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছ, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষের মতো কথাবার্তা বলছ, হঠাৎ দেখলে একটা ন্যাংটো অসভ্য বর্বর, এক ফুট লম্বা তার লিঙ্গটা। তুমি এমন ভান করলে, যেন তুমি কিছুই দেখনি। তুমি দেখলে, দুটো উদ্যম ন্যাংটো ছেলে, সারা শরীর সাদা রঙ করা, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তুমি এইসব ব্যাপারে কোনো কথাই বলবে না। স্যামি কিম্বেনজী একটা অধিবেশনে রেডিও-র সংবাদ প্রচারের ওপর একটা ভাষণ পড়ছে। ও এত এত লোকের মধ্যে টি. এস. ইলিয়টের বই থেকে একটা পুরো অনুচ্ছেদ চুরি

করেছে। তুমি কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলবে না, তুমি বলতে পারবেই না। বাইরে এসে তুমি ওকে খুব উৎসাহ দেবে। কম্পাউন্ডে তুমি এই ব্যাপারে বলেই যাবে। সকলেই কেবল মিথ্যা কথা বলে যাবে, কেবল মিথ্যে।”

“তুমি জান, কেন এখানে এসেছ। তোমার অভিযোগ করা সাজে না।”

“এটা ওদের দেশ। কিন্তু জীবনটা তোমার। শেষ পর্যন্ত তুমি জানতেই পারবেনা, তুমি এসব সম্বন্ধে কী ভাব। তুমি শুধু এইটুকুই জান যে, কম্পাউন্ডের মধ্যে তোমার নিরাপত্তা চাই।”

“তুমি তো মুক্তি পাবার জন্যেই এসেছিলে। আর তুমি খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পার, তাই না?”

“ববি, আমাদের কিন্তু এই সব জিনিস দেখার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা আলাদা।”

“তুমি কী ভাব, তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।”

“প্রতিদিন রাত্রে কম্পাউন্ডের মধ্যে ওরা হৈ চৈ শুরু করে, আর তুমি জানতে পার যে, ওরা বাইরে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা তালিকা বেরোয়, কে কে খুন হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে কারো কারো নাম পর্যন্ত নেই। তার মানে, হয় তুমি এসব ব্যাপার থেকে সরে থাকবে, অথবা হাতে চাবুক নিয়ে ওদের মধ্যে যাবে। এই দুটোর মাঝখানে আর অন্য কিছু নেই।”

“কার কথা বলছ? মার্টিন, না কর্নেল? লিভা, আমি ঠিক তোমার কথা বুঝে উঠতে পারছি না। রাজধানীর ওই সব চমৎকার সপ্তাহান্তের আমোদ-প্রমোদ, ওইসব চমৎকার খোলা চত্বরে আগুন-জ্বালানো। আমি তো আরো বেশি কিছু আশা করছিলাম। তোমার রুচি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। লিভা। “আমি খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারি।” খুব সুন্দরভাবে কথাটা বলেছ। কিন্তু আমরা যেসব লোকের সঙ্গে মিশি, তারা যে একদম আমাদেরই মতো, সেটা তো কারো দোষ নয়। তোমরা সকলেই একই বই পড়। অবশ্য আমরা প্রচুর পড়ি, তাই না? এই সব বন্য বর্বরদের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের দৃষ্টিকে কিন্তু আমরা জং ধরতে দেবনা।”

“ববি, তুমি এরকম ভাবে কথা বলতে পার না।”

“কেন? আমার কোনো যোগ্যতা নেই নাকি? তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, একটা বাড়ির কাজের ছেলে খবরটা ছড়াক, তুমি এটাই চেয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বিছানায় শুয়ে তীব্র চিৎকার করে কাউকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলে।”

“ওটা ডরিস মার্শালের মিথ্যা রটনা।”

‘ববিকে সাক্ষী দিতে ডাকা হোক। ও ডেনিস মার্শালের লোক।’ ববি মাথা ওপর-নিচে নাড়াচ্ছে। ‘ববিকে পাকড়াও কর। ববির সঙ্গে যা খুশি তাই করতে পার।’ ‘ববি, কী সুন্দর জামাটা পরে আছ।’ হাস্যকর। কিন্তু তুমি ভুল লোককে বেছেছ।”

“একেবারে বাজে কথা।”

“তাই কি?” ববি স্টিয়ারিং হুইল থেকে ডান হাত তুলে নিয়ে নিজের মাথায় চাপড় দিল। “আমি সব কিছু নজর করি। এখানে সব মজুদ করা আছে।”

“আমি সব সময়েই ভাবতাম, তুমি খুব আবেগ-প্রবণ, ববি।”

“তুমি ভুল লোককে বেছেছ।”

“তুমি যেভাবে বলছ, সেভাবে জিনিসটা হলেই ভালো হত। কম্পাউন্ডের মানুষগুলোকে তুমি নিশ্চয়ই খুব সতর্কভাবে লক্ষ করনি।”

“ঠিক তাই। এটা কারোরই দোষ নয় যে, যাদের সঙ্গে তুমি মেশো, তারা একদম তোমারই মতো।”

“ববি, ক্ষান্ত দাও। আমার সব কথা আমি তুলে নিচ্ছি।”

“তুমি বর্বরদের কথা বললে, চাবুকের কথা বললে।”

“আমি একথাও প্রত্যাহার করছি।”

“আরো অনেকেই তোমার মতো আছে লিভা। আমাদের কখনোই নিজেদের মনে জং ধরতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা বর্বরদের মধ্যেই রয়েছি, আর আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা দরকার। আমরা এইসব নোংরা বর্বরদের মধ্যে রয়েছি, আর আমাদের নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমাদের এই সব চমৎকারিত্ব আছে। আমরা কি আমাদের যোনির সুগন্ধি প্রতিদিন ব্যবহার করি?”

“এগুলো হাস্যকর কথাবার্তা।”

“তাই নাকি? আমরা কি ব্যবহার করি? কোন্ কোম্পানির সুগন্ধি আমরা ব্যবহার করি? হটগার্ল, কুল গার্ল, নাকি ফ্রেশ গার্ল? গার্ল-ফ্রেশ? তুমি কিছু না। তুমি একটা পচা, জঘন্য মেয়েছেলে ছাড়া আর কিছু নও। তোমার মতো স্ত্রীলোক লক্ষ লক্ষ আছে, লক্ষ লক্ষ, এবং এরকম স্ত্রীলোক আরো লক্ষ লক্ষ ভবিষ্যতেও হবে। ‘আমি খুব মানিয়ে নিতে পারি।’ ‘আশা করি ওরা বোকারা বৌ-গুলোকে কিছু করবেনা।’ জানিনা, তুমি নিজেকে কী ভাব। জানি না, তুমি কেমন করে আশা কর যে, তুমি যা কিছু ভাব, তা সব সঠিক।”

লিভা নিজের সীটে হেলান দিয়ে বসে, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। আবার একটা গ্রাম: ধুলো-ভরা বুপড়ি, গরম দেশের বাড়ির পেছনের সজি বাগান, পাশে একটা নোংরা গলি পথ; রোদ, ধুলো আর গাছের সঙ্কীর্ণ দৃশ্য; তারপর আবার হাইওয়ের পাশে ঝোপঝাড়।

“তোমার মতো লক্ষ লক্ষ আছে। মার্টিন-এর মতোও লক্ষ লক্ষ আছে। তোমরা তুচ্ছ।”

“গাড়ি থামাও। আমি নেমে যাব। আর কিছু বলতে চাই না। গাড়ি থামাও।”

ববি গরম রাস্তার ওপর শব্দ করে ব্রেক কষল। জানালার মধ্যে দিয়ে বাতাস বওয়া বন্ধ হল। ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজটাও নীরবতার মতো মনে হল। গাছগুলো রাস্তার পাশের খানা-খন্দে ছোট ছোট ছায়া ফেলছে। আকাশ অনেক উঁচুতে, গরম।

লিভা বলল, “তুমিই ঠিক। মতলবটা ভালো ছিল না।”

“তুমি একটি নির্বোধ । বিপদে পড়বে ।”

“আমি সত্যিই অতি নির্বোধ ।”

“এটা তোমারই মতলব ছিল, মনে রেখ ।”

“আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেব । হয়ত একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব, বা, অন্য কিছু ।”

ও যখন দরজা খোলার সময় পেছন ফিরল, ববি দেখল ওর জামার পিঠের দিকটা ভিজে । ও তখন সচেতন হল যে, ওর নিজের জামাটাও ভিজে আর একটু ঠাণ্ডা বোধ হল । রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হল লিভা দিক-বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে । ওর কালো চশমা ওর মুখভাব ঢেকে রেখেছে । ও নিজেকে স্থির করল । ববি দেখল, যে গ্রামটা ওরা একটু আগে ছেড়ে এল, সেই দিকে লিভা হাঁটা শুরু করেছে ।

ও ডাকল, “তোমার স্যুটকেস?”

লিভা ঘুরল না । “ওটা তুমি নিয়ে যেতে পার ।”

ববি নিজের দিকের দরজা খুলে রাস্তায় দাঁড়াল । চলমান রাস্তার বোধটা ওর শরীরে মনে তখনও রয়ে গেছে । গরম হাওয়ায় ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল । আবার ওর মাথায় সেই অতিরিক্ত চাপ, ফেটে যাওয়ার মতো অনুভব হল ।

“লিভা!”

লিভা ছোট ছোট চটপট পায়ে চলতেই থাকল, মাথা নিচু, ফাঁকা রাস্তার উঁচু বাঁধের ওপর এমন ভিনগ্রহের মানুষ মনে হল, এমন দুর্ঘটনা-প্রসূত বলে বোধ হল, ওর প্যান্ট আর জামার রঙ হঠাৎ এমন উজ্জ্বল মনে হল, যেন ওই রঙ রাস্তায়, মাঠে, আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে আর সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা অপ্রাকৃত রঙিন ফটোগ্রাফের চেহারা নিয়েছে ।

ববি গাড়িতে ঢুকে জোরে দরজা বন্ধ করে গাড়ি চালিয়ে দিল, ওর শুকনো হাতের চেটো স্টিয়ারিং হুইলে ঘসছে, কালো রাস্তাটা দেখছে, বনেট থেকে বেরোনো গরম ভাপটা অনুভব করছে, বনেটের ওশর রোদ ছোট ছোট আঁচড়ানো গোল গোল বৃত্তের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে ।

কয়েক মিনিট পরেই, সূর্য নিচে নামছে, গাছেরা কালো ছায়া ফেলছে, ফাঁকা প্রান্তর ভূমি, ফাঁকা গাড়ি, ইঞ্জিন এর আওয়াজ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, এই সমস্ত সম্বন্ধে সারাক্ষণ সচেতন থেকেও, ববির একটা দুঃস্বপ্নের মতো বিকট অনুভূতি হল । কর্নেল, হোটেল, চওড়া নদীখাতের পাশে সৈন্যটা গল্পকাহিনীর জন্তর মতো রাস্তায় বেরিয়ে আসা সাদা রঙ এর ছেলেগুলোর ধীর নিঃশব্দ গতিতে ছুটে চলা, রাস্তার ওপর লিভা; ছবিগুলো পরিষ্কার, পর পর চলে আসছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এসব কল্পনায় ঘটে চলেছে, বাস্তব নয় ।

ওকে শান্ত থাকতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। প্রয়োজনটা বুঝতে পেরে ও ধীরে ধীরে শান্ত হল। দুঃস্বপ্নের বোধটা ওর নিজের হিংস্রতার আর বিপদের পূর্বাভাসের স্মৃতিতে পরিণত হল। ও এখন একা, ও প্রতিশোধকে ডেকে আনছে। তবুও ও গাড়ি চালিয়ে চলল। রাস্তার শেষে বিপদ আছে, বিপদ আছে ওর একাকীত্বে। কিন্তু তবুও ও সময় বয়ে যেতে দিল।

গাড়িটা লাফাল, রাস্তার ওপরে খুব জোরে নেমে আসল, স্টিয়ারিং-হুইলটা মুহূর্তের জন্যে ওর হাত থেকে ছিটকে গেল। রাস্তাটা এখানে বসে গেছে। পাতলা পিচের আস্তরণ, নরম আর বিকেলের রোদে গলন্ত, কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে, কোথাও নেমে গেছে। এ রাস্তার অংশটুকু ববি জানে; ও অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিল। আরেকটা উঁচু ফোলা অংশ, তারপরেই নেমে যাওয়া, কিন্তু এখন গাড়ি ওর নিয়ন্ত্রণে। ও গাড়ি থামাল, আবার নৈঃশব্দ, আলো আর তাপ সম্বন্ধে সচেতন হল।

ও ফিরে যাবার জন্য গাড়ি ঘোরাল। রাস্তা আগের মতোই ফাঁকা। ভিজে পীচের ওপর ওর এইমাত্র ফেলে যাওয়া টায়ারের দাগ দেখল। ওর মনে এখন এমন আতঙ্ক যে, রাস্তা, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, সবই মনে হচ্ছে, ও কল্পনায় দেখছে। ফিরে যেতে যেতে ও আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, যা কিছু পেছনে ফেলে এসেছিল, সব ওর পরিষ্কার মনে আছে। ওর গাড়ির চাকার দাগ এখন নিখুঁত, সাধারণ।

হাইওয়ের ওপর লিভার কোনো চিহ্ন নেই। হাইওয়ের একধারে, ধুলোটে ছোট রাস্তাটার গায়ে যে ছোট গ্রামটা রয়েছে, মনে হচ্ছে সব বন্ধ, পরিত্যক্ত। ববি যখন হর্ণটা বাজাল, কেউ এল না। দুটো কি তিনটে দোকান, টম্বোয়াকা কাঠের ঘর, পাশের খালি, ধুলোটে উঠানের মতো রঙ। বন্ধ দরজায় পেরেক-মারা টিনের পাতের ওপর, যার ওপরের সব রঙ, কালো আর ফিকে হলুদে ছাড়া, রোদে জ্বলেপুড়ে গেছে, একটা হাসিমুখ আফ্রিকান স্ত্রীলোকের ছবি, মাথায় পাগড়ির মতো কাপড় জড়ানো, হাতে একটা চুলকানির মলমেল শিশি ধরে আছে আর পাশে একটা হাসিমুখ আফ্রিকান পুরুষ সিগারেট খাচ্ছে।

ববি ধুলোর রাস্তাটায় গাড়ি ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গেই ধুলোর ঝড়। পেছন দেখার আয়নায় দেখা যাচ্ছে শুধু ধুলো, ঘন, আর উড়ছে, যেন প্রচণ্ড আগুনের থেকে বেরোনো হলুদে ধোঁয়ার পুঞ্জ। ববি জানালাগুলো বন্ধ করল; কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে, ধুলোর আবরণে যা কিছু ও দেখছিল, সব ঢাকা পড়ে গেল, ঝোপঝাড়, লম্বা লম্বা গাছ, একটা খালি কাঠের কুটির, আর গাড়ির ভেতরেই ধুলো পুরু হয়ে জমতে থাকল। ও দেখল, একটা আবর্জনা ভরা উঠানে একটা মস্ত বড় টিনের ছাউনি দাঁড়িয়ে আছে, পুরোনো গ্রিজ ধুলোর সঙ্গে মিশে কালো আর মোটা হয়ে লেগে আছে; আর তার পাশে, শক্ত জমিতে গজিয়ে ওঠা ক্ষয়াটে দু'তিনটে ঝোপের পেছনে, নিচু নিচু থামের ওপর একটা সাদা কংক্রিটের বাংলো, বিকেলের রোদে স্নান করে দাঁড়িয়ে আছে।

ববি গাড়ি থামাল আর ওর দিকের জানালাটা নামাল। গাড়ির চারপাশে ধীরে ধীরে ধুলোর ঝাপটায় ভরে যাচ্ছে। যখন ববি গাড়ির হর্ণটা বাজাল, একটা লম্বা রোগা ছেলে বাংলোর দরজাটা খুলল। ও গাড়ির দিকে তাকিয়ে ববিকে ডাকল। ববি ইতস্ততঃ করছিল। ছেলেটা যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, বারান্দা আর ভেতরের ঘরের মাঝখানে, ববি আর ভেতরের কারো মাঝখানে একজন হতবুদ্ধি মধ্যস্থ লোকের মতো।

ববি বাংলোর ভেতরে ঢুকল। বারান্দা, বিকেলের রোদ্দুরে সাদা দেওয়াল থেকে প্রতিফলিত আর মেঝের কাঠের তক্তাগুলো থেকে উঠে আসা তাপপ্রবাহে আগুন গরম, একদম ফাঁকা।

দমবন্ধ করা ছোট বসার ঘরটায়, কাগজের ফুল, আর পাতলা মলাটের গল্পের বই-এর মাঝখানে, ক্রমিয়াম প্লেটেড, ধাতুর ফ্রেমের চেয়ার আর তামা-রঙের প্লাস্টিকের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির মাঝখানে, লিভা বসে আছে, মনে হয় চা খাচ্ছে। দাঁত বের করে একটা আচারের লংকায় কামড় বসাচ্ছে।

ববি মধ্যবয়েসি ভারতীয়কে গ্রাহ্য করল না, উনিই বাড়ির কর্তা, বলল, “আমাদের হাতে কিন্তু আর বেশি সময় নেই।”

লিভা বলল, “আমি চা খাচ্ছি।”

“ঠিক আছে, কোনো তাড়া নেই। আমিও এক কাপ চা খেতে পারি।”

“হ্যাঁ,” মধ্যবয়েসি ভারতীয় বলল, আর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লিভা, ববি বা সেই লম্বা রোগা ছেলেটা, কেউই কোনো কথা বলছিল না। প্রচণ্ড গরম লাগছিল। লিভা লাল হয়ে গেছে; ববি ঘামতে শুরু করেছে। একটা সবুজ শাড়ি পরে একজন অল্পবয়েসি মহিলা একটা প্লেটে আচার আর একটা অতিরিক্ত কাপ নিয়ে এল, আবার বাইরে চলে গেল।

“তোমাদের এই জায়গাটা ভারী সুন্দর,” ববি বলল, যখন ওই মধ্যবয়েসি ভদ্রলোক ঘরে এলেন।

“মিসেস ম্যাককর্টল্যান্ড,” লোকটা বলল, চেয়ারে বসে এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে।

“উনি দক্ষিণে যাবার আগে এই বাড়িটা চটজলদি বিক্রি করে দেন। বাড়ি, আসবাবপত্র, বই, ব্যবসা, সব।”

ববি বলল। “খুব ভালো বইগুলো।”

“আপনার কিছু বই চাই?” লোকটা বই এর আলমারির দিকে বসে বসেই ঝুঁকল, আর বাঁ হাত দিয়ে একগাদা বই বার করে আনল। “এই নিন।”

ববি মাথা নাড়ল, “আপনিও কি দক্ষিণে যাবেন?”

লোকটা হাসল, আর বইগুলো আবার জায়গায় রেখে দিল। “আমি আমেরিকাতে কাপড়ের ব্যবসা করব, ভাবছি। অথবা কায়রো-তে। আমি কায়রো-তে একটা ফলের রসের দোকান দিচ্ছি।”

“সেটা আবার কি জিনিস?”

“এই ইজিপ্টের লোকেরা, টাটকা ফলের রস খুব পান করে। আমার টাকাটা বার করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাব। আমার ভাই এখন ওখানেই আছে। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

“আমি এইখানেই থাকি,” ববি বলল, “আমি একজন সরকারি অফিসার।”

ধীরে ধীরে লোকটার পা-নাচানো বন্ধ হল। ও হাসল।

লিভা উঠে পড়ল। “আমাদের এখন রওনা হওয়া উচিত।”

ববি হাসতে থাকল, চায়ে চুমুক দিল।

“আপনি মি: ম্যাকার্টল্যান্ডকে চিনতেন?” লোকটা খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল।

“আমি ওকে চিনতাম না।” ববি উঠে দাঁড়াল।

“উনি খুব অল্প বয়েসেই মারা যান,” লোকটা বলল। ও ববি আর লিভাকে অনুসরণ করে প্রথমে উঠান, পরে রাস্তা পর্যন্ত এল। রাস্তায় তখন ধুলো থিতোচ্ছে। “উনি খুব বড় মোটর রেসিং করতেন। উনি ভোর ভোর এখান থেকে বেরিয়ে ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীতে যেতেন।”

ববি, ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল। লোকটার বিদায় জানানোতে ক্রম্বেপ না করে বলল, “কারফিউর আগে কালেক্টরেটে পৌঁছতে হলে আমাদেরও তাই করতে হবে।”

ওরা গাড়িতে উঠল। ভারতীয় লোকটি বারন্দায় উঠে গিয়ে ওখান থেকে ওদের গাড়ি নিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। আবার ধুলো উড়তে শুরু করেছে আর ওদের গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর পুরো রাস্তাটা ধুলোয় ঢেকে গেল।

লিভা বলল, “তুমি কি বিশ্বাস কর যে, সেই অদৃশ্য ঘণ্টায় একশ মাইল গতিতে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীতে গিয়েছিলেন?”

“তুমি কর কি?”

“জানিনা, ও একথা বলল কেন।”

দুই রাস্তার সংযোগস্থানে দোকানগুলো আগের মতোই বন্ধ আর ফাঁকা রয়েছে। রোদ তেরছাভাবে আঁচড়ানো ধুলোভরা জানালার মধ্যে দিয়ে এসে পড়েছে। ওরা হাইওয়েতে উঠে কাচ নামিয়ে দিল। গাড়ির মধ্যে সবকিছুর ওপর ধুলোর আস্তরণ। ড্যাশবোর্ড এর ওপরের প্রত্যেকটা ধূলিকণা ছোট ছোট ছায়া ফেলেছে। রাস্তার ডান দিকে নরম পিচ-এর ওপর ওর নিজের গাড়ির গ্রামের দিকে আসার সময়কার চাকার দাগ ও দেখতে পেল। ওর চাকার অন্য সব দাগ কোনো মোটা টায়ারের দাগ নষ্ট করে দিয়েছে। একাধিক ভারী গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে গেছে, রাস্তার বাঁ দিক ধরে আর সব কটাই কালেক্টরেটের দিকে গেছে।

ববি সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে লাগল। ও আবার রাস্তার সেই বসে যাওয়া জায়গাটায় এসে গেল, যেখানে অসমান জমির ওপর নরম পিচ ফুলে উঠেছে, গলে গেছে। এখানেই ও আগের বারে থেমেছিল। এখান থেকেই ও যে গাড়িটা ঘুরিয়েছিল, তার দাগ এখনও একটু রাস্তায় রয়ে গেছে।

“আমাদের কি খুব দেরি হয়ে গেছে?” লিভা জিজ্ঞাসা করল।

‘আমাদের মাত্র আধঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, তুমি ওদের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হাসি উপহার দিলে, ওরা আমাদের এক কাপ করে চা দেবে।’

ওরা দু’জনেই হাসল, যেন দুজনেই জিতেছে।

প্রথমে নিজেদের ব্যক্তিগত হাসি নিয়ে এবং পরে স্থির মুখে, ওরা বিকেলের গরম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেল, রাস্তায় এখন ছায়া পড়েছে, ডানদিক থেকে বেঁকে ওদের দিকে ছায়াগুলো এসেছে; আর দুজনের কেউই কিস্তি বিস্ময়ে চোঁচিয়ে উঠল না, যখন ওরা আবার চিতাবাঘ গিরিচূড়া দেখতে পেল, এখন আরো কাছে, আরো বড়, অর্ধেকটা রোদে আর অর্ধেকটা ছায়ায়, ওর খাড়া দেওয়ালটা, একটু কম খাড়া, ওর ঢালের দিকটা, বনজঙ্গলে ভরা, বেশি পাথুরে অসমতল।

লিভা বলল, “তুমি কি বিশ্বাস কর যে, ও সত্যি সত্যিই কায়রো যাচ্ছে?”

“ও মিথ্যা কথা বলছে,” ববি বলল, “সকলেই মিথ্যা বলে।”

লিভা হাসল। তারপরেই ও দেখল, ববি রাস্তার শেষে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে; সৈন্যবাহিনীর লরিগুলোর সারি, যাদের চাকার দাগ অনুসরণ করে ওরা আসছিল।

BanglaBook.org

ববি পেছনে রইল। গতি বাড়াল। আবার পেছনে রইল। ও, বা, লিভা, কেউই কিছু বলছে না। চিতাবাঘ গিরিচূড়া, ঝোপের মধ্যে থেকে আকাশে উঠে আছে, সবসময়েই ওদের ডানদিকে, ওর বনজঙ্গলে ভরা ঢাল ছায়ায় ঢাকা। রাস্তার পাশের উদ্ভিদ খুব সূক্ষ্মভাবে বদলে গেছে। এখনও ঝোপঝাড়; কোনো ফসল এখানে ফলেনি; কিন্তু এগুলো ধীরে ধীরে বৃষ্টিবহুল উষ্ণমণ্ডলীয় রসালো বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। ওরা লরিগুলোর কাছাকাছি আসছে, পাঁচটা লরির একটা সারি, লরিগুলোর ছায়া তেরছাভাবে কিছুটা রাস্তার ওপর আর কিছুটা রাস্তার পাশের বন্ধুর জমির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। কখনও কখনও, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ববি ও লিভার চোখে পড়ছে গিরিচূড়ার শেষে খাঁটি উষ্ণমণ্ডলীয় জমি, রাজার উপজাতির লোকদের জমি, একটা বিশাল রৌদ্রস্নাত বনভূমি; আপাতদৃষ্টিতে একদম শূন্য, শুধু মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটানো বাদামি দাগের মতো, যেগুলো আসলে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে গ্রাম নির্দেশ করছে।

শেষ লরিটার পেছনে বসে থাকা সবুজ টুপি পরা আর রাইফেল হাতে সৈন্যরা গাড়িটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। ওদের পেছনের সৈন্যদের মুখ ছায়া-ঢাকা। তারপর ববি ড্রাইভারকে দেখল। ড্রাইভার-কেবিনের পাশে লাগানো আয়নায় ড্রাইভারের মুখের পাশ আর টুপির কাঁপাকাঁপা প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, আয়নার পেছনের উজ্জ্বল রোদ-ঝলসানো পটভূমিতে একটা শৈশবী কালো নক্সার মতো। কখনো কখনো, যখন লরিটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে, তখন ড্রাইভার যখন মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় ববিকে দেখছে, তখন ওর মুখে রোদ পড়ায় একটা হল্‌দে দীপ্তি দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ ববি আর লিভা শেষ লরিটা থেকে একটা স্থির দূরত্ব রেখেই গাড়ি চালাতে লাগল। লরিটার পেছনে ওদের সৈন্যদলের প্রতীক চিহ্ন রয়েছে আর সৈন্যরা এখনও ক্রকুটি করে রয়েছে। ববি বুঝতে পারছে, ড্রাইভারটা আয়নায় মাঝে মাঝেই ওকে দেখছে।

লিভা বলল, “আমরা যদি এই গতিতে যাই, তাহলে কিন্তু দেবী হয়ে যাবে।”

“এই রাস্তায় সামনের গাড়িকে পার হয়ে যাওয়া যায় না,” ববি বলল, “রাস্তাটা এত ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে।”

ওরা চলছে। সৈন্যরা তাকিয়ে আছে।

লিভা বলল, “ওরা বোধ হয় আমাদের দেখে উদ্ভিগ্ন হচ্ছে।”

ববি হাসল না ।

এবার ওরা এমন একটা জায়গায় এসে গেল, যেখানে রাস্তাটা একদম সোজা আর স্পষ্টত: একদম পরিষ্কার ।

ববি হর্ণ দিল আর পার হয়ে যাবার জন্য গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল । সৈন্যরা সতর্ক হয়ে গেল । ববি, গতি বাড়িয়ে, ওদের দিকে তাকাল, আবার তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল, ওর চোখে রোদ লেগে চোখ ঝলসে দিল । ও হর্ণ বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল । লরিটা ডানদিকে এসে গেল, ববি চোখে সরম্বেফুল দেখল । ও আরো গতি বাড়িয়ে দিল, আর লরিটার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে প্রায় রাস্তা থেকে নেমে গেল । লরি ডানদিকে কাটছে, ববি ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছে । ও বুঝতে পারল ওর গাড়ির ডান চাকাটা রাস্তার ধার থেকে নেমে যাচ্ছে, পাশের খাদটা এগিয়ে আসছে । ও ব্রেক কষল, গাড়িটা ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠল । লরিটা এগিয়ে গেল । সৈন্যদের মুখের হাসি এখন বন্ধুত্বপূর্ণ । লরির আয়নায় ড্রাইভারের হাসিমুখ দেখা গেল । এতক্ষণে ওর মুখটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে । তারপরেই এই দৃশ্যটা হারিয়ে গেল । ববিদের গাড়িটা রাস্তার ধারে একপাশে হেলে আছে । লরিটা আরও এগিয়ে গেল আর লরির সারিতে সামিল হয়ে গেল । সৈন্যদের মুখগুলো এখন অস্পষ্ট । একটি খাকি জামা পরা হাত ড্রাইভারের কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল আর হাতটা দুলে দুলে লরিটাকে পার হয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে ববিকে সঙ্কেত জানাল ।

লিভা বলল, “যখন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দেখা হবে, মরার ভাব করবে ।”

ববির জামার পেছনটা ভিজে গেছে । ওর মুখে এখন জ্বলন্ত ভাব । ও ইঞ্জিনের, বনেটের, সামনের কাঁচের উত্তাপ অনুভব করল । বাতাসও গরম; গাড়ির মেঝেটাও গরম । ওর সারা শরীরে গরম ঘাম বেরোচ্ছে । ওর চোখ জ্বলছে, প্যান্টটা পায়ের সঙ্গে সঁটে আছে ।

ও গাড়িটা আবার চালিয়ে, রাস্তার ধার থেকে মাঝখানে চলে এল । আবার ও লরিগুলোর চাকার দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল, নরম পিচের ওপর চওড়া, চেনের মতো দাগ । ও আস্তে আস্তে চালাতে লাগল, ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের বেশি নয়; তবুও ওরা আবার লরিগুলোকে দেখতে পেল । গিরিচূড়া আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে; কুয়াশায় ওর ছায়াঢাকা বনভূমির ঢালটা কোমল মনে হচ্ছে । বিকেলের আলোটা ধোঁয়াটে হয়ে এল ।

এখন আবার হাইওয়েটা খুব খোলামেলা আর সামনে মাইলের পর মাইল ধরে একেবারে রোমান রাস্তার মতো সোজা, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে গেছে । সৈন্যবাহিনীর লরিগুলো বহু দূরে, ছোট হয়ে গেছে, পাহাড়ে উঠল, অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর আবার দেখা গেল, পাহাড়ে উঠছে । ওরা রাজার সম্প্রদায়ের লোকেদের এলাকায় ঢুকছে; এখানে হাইওয়েটা পুরোনো জঙ্গলের রাস্তাকে অনুসরণ করেছে । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবলমাত্র জঙ্গল

থেকে, মাটি থেকে, নলখাগড়া, শর ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত বস্তু দিয়ে এইরকম সোজা রাস্তা তৈরি করেছে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে, জলাভূমির ওপর দিয়ে। অনেক দূর থেকে ববি ছোট, সাদা চুনকাম করা পাথরের বাড়িটা দেখতে পেল, একটা পুলিশ চৌকি, যেটা রাজার এলাকার সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওটার ওপর যে পতাকাটা এখন উড়ছে, সেটা রাজার পতাকা নয়। সেটা রাষ্ট্রপতির দেশের পতাকা।

পাথরের বাড়িটার কাছে এসে লরিগুলো রাস্তা থেকে নেমে গেল, আর রাস্তাটাও ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু ববি গাড়ির গতি বাড়াল না। তার কোনো দরকার নেই; চারটে বেজে গেছে, কারফিউর সময়। শিগ্গিরই ওরা দেখতে পেল, নিচু, ছড়ানো, কাচ ও রঙিন কংক্রিটের তৈরি, পুঁতির মতো উজ্জ্বল, আধুনিক বাড়িটা, যেটা আমেরিকানরা ঝোপঝাড় কেটে বানিয়েছিল, এই নতুন দেশকে, তাদের উপহার হিসেবে দিয়েছিল। এটা তৈরি হয়েছিল স্কুল করার উদ্দেশ্যে আর রাজার এলাকা আর রাষ্ট্রপতির এলাকা, দুটোরই ওপর এটা নির্মিত, একটা প্রতীক হিসেবে। এই বাড়িটা পরিদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু কখনোই ব্যবহৃত হয়নি। কোনোদিন এখানে ছাত্রও ছিলনা, শিক্ষকও ছিল না। এটা বরাবর ফাঁকা পড়েছিল। আজকে এটা ব্যবহার হচ্ছে। সামনের পরিষ্কার করা জায়গাটা, এখন আবার অংশত ঝোপ-ঝাড়ে ভরে গেছে; সেখানে লরিগুলো সব দাঁড়িয়ে। আর লরিগুলোর ছায়ায় মোটা মোটা সৈন্যরা দলবেঁধে বসে আছে।

এখানে রাস্তায় কোনো অবরোধ বসানো নেই। কেউ ওদের হাত নেড়ে থামতে বলল না। কিন্তু ববি দাঁড়াল; স্কুল, লরি, সৈন্যরা ওর বাঁ দিকে আর পাথরের বাড়িটা, যার ওপর রাষ্ট্রপতির পতাকা উড়ছে, সেটা রাস্তা পার হয়ে ওর ডান দিকে। সৈন্যরা ওর গাড়ির দিকে তাকিয়েও দেখল না। পাথরের বাড়িটা থেকেও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না। গিরিচূড়ার ওপাশে ঝকঝকে বনভূমি, ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত ছেয়ে আছে।

“আমরা কি ওদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব?” লিভা বলল।

ববি উত্তর দিল না।

“হয়তো কোনো কারফিউ নেই,” লিভা বলল।

একজন সৈন্য ওদের দেখছে। অন্য যে সৈন্যদের সঙ্গে ও দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চেয়ে ও বেঁটে, একটা খোলা লরির পেছনের ডালার কাছে দাঁড়িয়ে। একটা টিনের কাপে কিছু পান করছে।

“হয়ত কর্নেল ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন,” লিভা বলল।

“তাই কি?” ববি বলল।

সৈন্যটা লরিটার কাছ থেকে সরে গিয়ে, টিনের কাপটা ঝেড়ে ফেলল, তারপর আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। ওর মাথা কামানো, খালি। ওর ভুঁড়ির নিচে ওর কড়া ইস্ত্রি করা প্যান্টে ভাঁজ পড়ে গেছে, আর ওর গোলগাল উরু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষাঘষি খাচ্ছে। ও ওর ফোলা ফোলা গালের ভেতরটা চুষে নিয়ে

ঠোট জড়ো করে, সাবধানে একপাশে ঝুঁকে থুতু ফেলল, যাতে পুরো থুতুটা ঠোট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর গাড়ির দিকে চেয়ে হাসল।

এবার ওরা বন্দীদের দেখতে পেল। ওরা মাটির ওপর বসে আছে, কয়েকজন শুয়ে পড়েছে; বেশির ভাগই উলঙ্গ। ওরা উলঙ্গ ছিল বলেই ঝোপঝাড়, ছোট ছোট গাছ আর লরিগুলোর ওপর আলো ছায়ার খেলায়, ওদের অস্তিত্ব বোঝা যায়নি। ওদের কালো কালো শরীরে চক্চকে চোখগুলোই কেবল জীবন্ত; কিন্তু ওদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই বললেই চলে। ওরা কৃশকায়, ছোট হাড়-সম্পন্ন শরীর, খুব কুচকুচে কালো, রাজার সম্প্রদায়ের লোক, ওরা জামাকাপড় পরে, রাস্তা বানায়। কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় যে মর্যাদা ওদের ছিল, তা এখন আর নেই; এখন ওরা শুধু জঙ্গলের মানুষ, শত্রুদের হাতে বন্দী। ওদের কিছু কিছু বন্দীকে প্রচলিত জঙ্গলের রীতিতে, তিন-চার জন করে, গলা থেকে গলাতে দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন ক্রীতদাস-বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সকলের শরীরে মেটে রঙ-এর রক্ত আর মারের চিহ্ন। দু'একজনকে মৃত মনে হচ্ছে।

সৈন্যটা হাসল, ওর ভিজে হাতে ভিজে টিনের কাপ, গাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

ববি, একটা হাসি তৈরি করতে করতে, লিভার ওপর দিয়ে ঝুঁকে বাঁ হাঁত দিয়ে ওর ঘামে ভেজা দেশি জামাটা বগল থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে, জিজ্ঞাসা করল, “তোমার অফিসার কে? তোমার বস-ম্যান কে?”

লিভা সৈন্যটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে চুনকাম করা সাদা পাথরের বাড়ি, তার পতাকা, গিরিচূড়া আর ধোঁয়া-ওঠা বনভূমির দিকে তাকিয়ে রইল।

সৈন্যটা গাড়ির দরজায় নিজের ভুঁড়িটা ঠেকাল। ওর গরম খাকি জামার গন্ধ, ববির খোলা বাঁ বগলের আর হৃদে পিঠের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। ববি আর লিভার দিকে আর গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে ও একটা জটিল জংলী ভাষায় মৃদুস্বরে কিছু বলল।

“তোমার বস-ম্যান কে?” ববি আবার জিজ্ঞাসা করল।

“ববি, চল, গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই,” লিভা বলল, “ওদের আমাদের দিকে কোনো আগ্রহ নেই। গাড়ি চালিয়ে দাও।”

ববি পাথরের বাড়িটার দিকে আঙুল দেখাল, “বস-ম্যান ওখানে?”

সৈন্যটা এবার লিভার দিকে তাকিয়ে ওর ভাষায় কিছু বলল।

লিভা বিরক্ত স্বরে বলল, “আমি বুঝতে পারছিনা,” আর সোজা সামনে তাকিয়ে রইল। সৈন্যটা এবার এমনভাবে করল যেন ওকে চড় মারা হয়েছে। ও কাঁচু মাচু মুখে একটু লাজুক হেসে গাড়ি থেকে এক পা পিছিয়ে গেল। ও নিজের টিনের কাপটা নাড়াল; হাসি বন্ধ করল। মৃদু স্বরে বলল, “ডোন্ আনারস্ট্যান, ডোন্ আনারস্ট্যান।” ও চোখ নিচু করে গাড়িটা, গাড়ির দরজাটা, চাকাগুলো দেখল, যেন কিছু খুঁজছে। তারপর ঘুরে নিজের দলের দিকে চলে গেল।

ববি দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাইরেটা ঠাণ্ডা, জামাটা ওর পিঠে ঠাণ্ডা লাগছে কিন্তু ওর পায়ের তলায় পিচ্চটা নরম। এখন ও বন্দীদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। গিরিচূড়ার পেছনে বনভূমির ধোঁয়া ও দেখতে পাচ্ছে। ওটা কুয়াশা নয়, সাক্ষ্য-রান্নার আগুন নয়, ওটা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলোতে আগুন লাগানো হয়েছে, তার ধোঁয়া। ধমক-খাওয়া সৈন্যটা ওর সাথীদের কিছু বলছে। ববি না দেখার চেষ্টা করল। ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে গাড়িতে ফিরে গিয়ে, গাড়ি চালিয়ে একদম না থেমে কম্পাউন্ডে চলে যেতে বলছে। কিন্তু ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। ও ডান হাত দোলাতে দোলাতে চট্জলদি ঝকঝকে রাস্তাটা পার হয়ে পাথরের বাড়িটার ছায়ায় ঢাকা ধুলো-ভরা উঠান পার হয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

টোকা মাত্রই ও বুঝতে পারল, ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পক্ষে বড় দেরি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘরটায় টেবিল চেয়ারগুলো ঠেলে দেয়ালে সরানো, সবুজ নোটিশবোর্ডে রাষ্ট্রপতির নতুন ফটোগ্রাফ ঝোলানো, ওখানে ট্যাক্সের হার, পরিমাণ ইত্যাদির পুরোনো বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ‘সন্ধান-চাই’ অপরাধীদের ছবি, অন্যান্য ছাপা কাগজপত্র টাঙানো রয়েছে, কোনো অফিসারও নেই, কোনো পুলিশম্যানও নেই। কংক্রিটের মেঝেতে জানালার নিচে তিনজন মাথা-কামানো সৈন্য বসে আছে, ওদের হাঁটুর ওপর ওদের টুপিগুলো। ববি ঢুকতেই তিনজন উঠে দাঁড়াল।

“আমি একজন সরকারি অফিসার,” ববি বলল।

“স্যার!” ওদের মধ্যে একজন বলল, আর তিনজনই খাড়া সজা হয়ে দাঁড়াল।

“তোমাদের অফিসার কে? বস্-ম্যান কে?”

ওরা উত্তর দিল না। ববি বুঝতে পারছেন না এর পর কী বলবে।

ওরা ববির দ্বিধা বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভাস ভাব কেটে গেল। ওরা টিলাঢালা হয়ে গেল আর ববির দিকে অনুসন্ধানী চোখে চাইল।

মাঝখানের সৈন্যটা বলল, “কোনো বস্-ম্যান নেই।”

ববি বুঝতে পারল, ও ভুল শব্দ ব্যবহার করেছে। ও মাঝখানের সৈন্যটার দিক থেকে ডান দিকের সৈন্যটার দিকে তাকাল, তিনজনের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে মোটা, যে ওকে স্যার বলে ডেকেছিল, বলল, “তোমরা এখান থেকে পাশ দেবে?”

মোটা সৈন্যটার ছোট চোখ দুটো কুঁচকে গেল। মুখের সামনে আস্তে ডান হাতটা দোলাল, ববির দিকে ওর হাতের চেটো ঘোরানো।

“পাশ নেই,” মাঝখানের সৈন্যটা বলল।

ববি ওর দিকে তাকাল। “মি: ওয়াঙ্কা-বুতেরে আমার বস্-ম্যান।” ও একটু হেসে নিজের হাত দুটো এমনভাবে সামনে প্রসারিত করল, যাতে বোঝায় একটা মস্ত ভুঁড়ি, আর বিশাল ওজনের শরীর নিয়ে টলমল করে হাঁটার মতো ভান করল, “মি: বুসোগা-কেসোরো আমার আরও বড় বস্-ম্যান।”

ওরা কিন্তু হাসল না।

“বুসোগা-কেসোরো,” মোটা সৈন্যটা বলল, ববির মুখটা দেখতে দেখতে, আর মুখের মধ্যে থুতু জমাতে জমাতে, “বুসোগা-কেসোরো।”

“কার-ফিউ,” মোটা সৈন্যটা বলল।

মাঝখানের সৈন্যটাও বলল, “কার-ফিউ।”

“কোন্ সময়ে তোমাদের কারফিউ? চারটে, পাঁচটা, ছ’টা?”

ববি ওর কজিতে ঘড়িটা দেখাল। “চার? পাঁচ? ছয়?”

“তুমি ওটা আমাকে দেবে?” মোটা সৈন্যটা বলল আর খপ করে ববির কজিটা ধরল।

গোলাপি চামড়ার ওপর কালো চামড়া; ওরা সবাই তাকিয়ে দেখছে।

মোটা সৈন্যটা ঘড়ির ডায়ালের ওপর ওর বুড়ো আঙুলটা ঘসছে। ওর চোখ কিস্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, খানিকটা মেয়েলি। ওর গাল, ঠোঁট নড়ছে।

মাঝখানের সৈন্যটা ওর পোশাকের পকেটের বোতাম খুলল আর একটা তোবড়ানো, অর্ধেক খালি সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ওটা হচ্ছে সেই ব্র্যান্ডের সিগারেট, যেটা সেই বিজ্ঞাপনের হাসি মুখ আফ্রিকানটা খাচ্ছিল।

বাইরে লরিগুলোর ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে। চিৎকার-টেঁচামেচি, কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পিচের রাস্তায় বুটজুতার শব্দ, গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ। নিচু গিয়ার দিয়ে লরির চলে যাওয়ার শব্দ।

“আমি তোমাকে দেব না,” ববি বলল, “আমার আর নেই।”

ও একটা রসিকতা করল। ওরা সবাই হাসল।

“আর নেই,” মোটা সৈন্যটা বলল আর ববির হাতটা ছেঁড়ে দিল।

“আমি যাই,” ববি বলল।

ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওর চোখে পড়ল রোদে ভরা রাস্তা, তেরছা ছায়া পড়া ধুলোভরা উঠান আর পোকা-মাকড় ছড়ানো ওর গাড়ির সামনের অংশটা।

“বয়!”

ও থেমে গেল। এটাই হল ওর ভুল। ও পেছন ফিরে অন্ধকার ঘরটার দিকে মুখ করল।

মাঝখানের সৈন্যটাই কথাটা বলেছে। ও হাতে না-জ্বালানো সিগারেটটা ধরে রয়েছে, ওর কালো দুই আঙুলের মধ্যে ধবধবে সাদা সিগারেটটা।

‘বয়, আমি তোমাকে সিগারেট দিচ্ছি।’

“আমি ধুমপান করি না,” ববি বলল।

“আমি দিচ্ছি। এস, আমি দিচ্ছি।”

এবং ববি দরজা থেকে, দিনের আলোর উজ্জ্বলতা থেকে ভেতরে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গেল, চাইল, যা হবে, ভেতরেই হোক, এই অন্ধকার ঘরে; বাইরে খোলা জায়গায় অন্য লোকদের চোখের সামনে নয়।

সৈন্যটার হাতটা এখনও বাড়ানোই আছে, খোলা, হাতের তেলো নিচের দিকে, সিগারেটটা দুই আঙুলের মধ্যে লম্বালম্বি রয়েছে। তারপর আঙুলগুলো খুলে গেল, সিগারেটটা নিচে পড়ে গেল, আর আঙুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ওপরে উঠে এল ববির মুখের দিকে, মনে হল যেন খামচাবে, পরক্ষণেই ওর থুত্নিতে সজোরে আঘাত করল। অন্য হাত দিয়ে ববির হৃদে দেশি জামাটা টেনে ছিঁড়তে লাগল।

“তোমার নামে নালিশ করব,” ববি পিছিয়ে গিয়ে বলল, “নালিশ করব।”

অন্য সৈন্যগুলো ততক্ষণে ওর পেছনে এসে গিয়েছে। ও পড়ে যাচ্ছিল, সৈন্যগুলো ধরল, তারপর অভ্যস্ত শিক্ষিত হাতে ববির দুই হাত মুচড়ে ধরল; এবং তখন মনে হল ওর সামনের সৈন্যটা ওর কথায় নয়, ওর জামা ছেঁড়ার শব্দ শুনে আর দেখে, খেপে গেছে। ও আবার, বারবার, ওর জামাটা, জামার নিচের গেঞ্জিটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল, আর যে ডান হাতে সিগারেট ধরেছিল, সেই হাতে রাগে অন্ধ হয়ে ববির মুখে আঁচড়াতে, খামচাতে লাগল, যেন ওর নাক, চিবুক, গাল মুঠোয় ধরে ছিঁড়ে ফেলবে।

“তোমাদের নামে নালিশ করব,” ববি বলল।

ওর হাত দুটো আরো জোরে মুচড়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া হল আর যখন ও কংক্রিটের মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল, ও বুঝতে পারল, ওর পিঠে, গলার পেছনে, ঘাড়ে, চিবুকে বুট দিয়ে মারছে। ওই অবস্থায় ও দেখতে পেল যে, দুটো সৈন্যের পা কিন্তু স্থির, নড়ছে না। শুধু মোটা সৈন্যটা ওর আঁটোসাঁটো খাকি প্যান্ট পরে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে বসে পড়েছে, ওর চুলের মুঠি ধরে ওর মাথাটা মেঝেতে ঠুকে দিচ্ছে, মেঝেতে ওর মুখটা, একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে, জোরে জোরে ঘসে দিচ্ছে। ববি বুঝতে পারছে, ওর মুখের চামড়া ছিলে যাচ্ছে; কিন্তু তখনও ও লক্ষ করল যে, অন্য সৈন্য দুটো যেখানে ছিল, সেখানেই রয়েছে।

ও প্রথমে ভেবেছিল যে, সিগারেট হাতে সৈন্যটা ওকে শুধু অপমান করতে চায়, ন্যাংটো করে দিতে চায়, শারীরিক আঘাত করে ওর অঙ্গহানি করতে চায়। কিন্তু বুঝতে পারল, মারধরটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে আর এখন ওর মনে হচ্ছে, মোটা সৈন্যটা, যে ওর ঘড়িটা চেয়েছিল, ওকে মেরেই ফেলতে চায়। ও ভাবল; নিজেকে বাঁচাতে হবে, মরার ভান করে পড়ে থাকতে হবে।

উপুড় হয়ে পড়ে থেকে ও শরীরটাকে ভারী করে তুলল, বাঁ হাতটা মাথার পাশে আঁটো করে রাখল। সৈন্যটা বুট দিয়ে ওর পাজরে খোঁচা মারছে, ওর পেটে খোঁচা মারছে, তারপরে জোরে লাথি কষাল। ববি নড়ল না। মেঝের মসৃণ প্লাস্টারের ওপর পড়ে থাকা সূক্ষ্ম পাথরের কণাগুলো ওর রক্তে ভেজা মুখের চামড়ায় আটকে যাচ্ছে। ও চোখ খুলল না, ভয় পেল, যদি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। তারপরে ও টের পেল, বুটটা সজোরে ওর ডান হাতের কজিতে আঘাত করল। ওর গলায় একটা তীব্র কাতর আর্তনাদ উঠে এল, প্রচণ্ড অসহনীয় যন্ত্রণা, হাড় ভেঙে যাওয়ার বোধ, সারা জীবন যে দেহটা গোটা ছিল,

সেটা ভেঙে গেল, এই চেতনা, এসব সত্ত্বেও, ও আত্ননাদটাকে গলার বাইরে বেরোতে দিল না, ওর কজির ওপর ওর সমগ্র জাখত চেতনাকে সংহত করল। ও বুঝতে পারল, কজিটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল, আস্তে আস্তে জায়গাটা ফুলে উঠছে। আর তারপরই ও আবার রাস্তায় এসে গেছে, একটা উজ্জ্বল, ঝকঝকে ভূ-দৃশ্যের মধ্যে, ওর গাড়ির প্রচণ্ড গতিতে ও নিজেই নার্সাস হয়ে যাচ্ছে, ওর চাকার টায়ারের দাগ, তরঙ্গময় রাস্তা।

ও জেগে উঠল। ভাবল, চোখ খুলবে। ওর সমস্ত মুখ জ্বলছে। ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখতে পাচ্ছে অন্ধকার ঘরটায় কোনো থাকি-পরা পা নেই। নিশ্চিত হবার জন্যে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ও বুঝতে পারল এখনই কিছু করাটা অত্যন্ত জরুরী, এখনই, যখন ও স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পারছে, আর ওর শরীরে যেটুকু শক্তি ফিরে এসেছে, সেটুকু থাকা পর্যন্ত। ও উঠে বসল, ওর কজিতে ভর দিল। ও ওর আঘাতের কথা ভুলেই গিয়েছিল; এখন মনে পড়ল। ও উঠে দাঁড়াল, ও এখনও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে। ও নিজের দিকে তাকাল না। হাঁটতে শুরু করে ও মেঝের দিকে তাকাল। কিন্তু সেই সৈন্যটার হাত থেকে পড়ে যাওয়া সিগারেটটা দেখতে পেল না।

আলো বেশি হলে হয়েছিল। ছায়াগুলো আরো দীর্ঘতর আর কম কর্কশ। বাতাসে বেশি ধুলো আর ধোঁয়া। একটা লরির সামনের কাচের ওপর, স্কুলের একটা জানালার ওপর রোদ পড়েছে। সৈন্যরা ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বলে, চারপাশে ঘিরে বসে আছে। টিনের প্লেট থেকে খাবার খাচ্ছে, টিনের কাপ থেকে পান করছে, কোনো তাড়া নেই। ধীর, সতর্ক, খাওয়ার আশ্রয়ে ওদের চোখ আর কর্ণস্বর উজ্জ্বল; জঙ্গলের মানুষ, জঙ্গলের রাজা, আরেকটা সৌভাগ্যপূর্ণ দিনের অবসান। ওদের বেশ কিছুটা পেছনে, রোদের মধ্যে, দড়ি বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীরা মাটিতে পড়ে আছে, নড়াচড়া নেই।

একটা সৈন্য ববিকে দেখল, চমকে উঠল। লোকটার চোখ দুটো চক্চক করে উঠল। মাথা না ঘুরিয়েই ও ওর পাশের লোকটাকে কিছু বলল, আর পুরো দলটাই ববির দিকে তাকাল। ববি দুহাত পাশে রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, নিজেকে দেখতে দিল। তারপর ও গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল; গাড়িটা যেখানে থামিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে, খোলা রাস্তায় একদম খোলামেলা, চাকাগুলো পিচের ওপর সামান্য বসে গেছে। সৈন্যরা আবার খাওয়ায় মন দিল।

লিভা, তখনও নিজের সীটেই বসা, ঝুঁকে দরজাটা খুলে ধরল। কেউ গাড়ির কাছে এল না। ইঞ্জিন সাড়া দিল। ববি ওর ডান হাতটা স্টিয়ারিং হুইল-এর ওপর রাখল। কেউ ওদের ওই জায়গা ছেড়ে যেতে বাধা দিল না। বিকেলের রোদ পড়ে সামনের কাচের ওপর প্রতিটি আঁচড়ের দাগ সোনালি হয়ে উঠেছে। চিতাবাঘ গিরিচূড়ার প্রায় খাড়া পাশটাও সোনালি; ছায়াবৃত পাশটা অস্পষ্ট, আবছা, ওর নিচের ঢালের বনটাকে চারপাশের ঝোপঝাড়ের অংশ মনে হচ্ছে।

চারশ' কি পাঁচশ গজ পরে, পাহাড়ের ভাঁজের ওপর ওরা পথ অবরোধের সামনে এসে গেল। রাইফেল হাতে একজন সৈন্য, টুপির নিচে ওর মুখটা কালো, আফ্রিকানদের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়ে ওদের থামার নির্দেশ দিল। কিন্তু ওরা থামবার আগেই সেই ফুল-ফুল-ছাপ জামা আর কালো ট্রাউজার্স-পরা ইংরেজদের ঢং-এ চুল আঁচড়ানো লোকটা রাস্তার অন্য ধার থেকে ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিল।

ববি সাদা বেড়াগুলোর ভেতর দিয়ে, পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এল, আর খুব ধীরে গাড়ি চালিয়ে রাস্তার অন্য পারে দাঁড়ানো গাড়িগুলো, যেগুলো কালেক্টরেটের দিক থেকে আসছিল, পিউজো ট্যাক্সি বাস, ভাঙা-চোরা ভ্যান গাড়ি আর আফ্রিকান মোটর গাড়ি, সেগুলো পার হয়ে গেল। যাত্রীরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, কারো হাতে তাদের রাস্তার পাশ; আর অন্যরা ইতিমধ্যেই ঘাসের ওপর বসে আছে, বা শুয়ে পড়েছে, অর্ধ উলঙ্গ, তাদের জামা কাপড় ছেঁড়া; পুরো পোশাক পরা সৈন্যরা ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু আফ্রিকান স্ত্রীলোকেরা এডওয়ার্ডের আমলের পোশাক পরে আছে। ঐরকম পোশাকেই রাজার সম্প্রদায়ের লোকগুলোর মধ্যে প্রথম মিশনারীরা এসেছিল; এবং তখন থেকেই আফ্রিকান ঢং-এর সূতি জামাকাপড়, রাজার সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে, অথবা দীর্ঘ যাত্রার সময় ব্যবহার করে আসছে।

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, এক পাহাড় চূড়া থেকে আরেক পাহাড় চূড়ায়, এক ফালি পীচ, একটা চওড়া পাটির মতো, ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে।

লিভা বলল, “একটু দাঁড়াও, ববি।”

ববি রাস্তার ওপরেই গাড়ি থামাল।

লিভা ববির চুল থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল, ওর হাতে ছেঁড়া খোঁড়া জামাটা একটু টেনে টুনে ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল। এর চেয়ে বেশি আর কীই-বা করতে পারে। ববি ওকে মুখে হাত দিতে দিল না।

লিভা বলল, “তোমার ঘড়িটা ভেঙে গেছে।”

ববি ওর ভারী চোখ দুটো বন্ধ করল আর সেই অন্ধকারে, লিভার জন্যে হঠাৎ একটা ক্ষণস্থায়ী দুঃখবোধ করল; ওরও অনেক কিছুই এই দু'দিনে নষ্ট হয়েছে, আর ভাবল, ওর হাত দুটো কিন্তু একজন গুস্তাফকারিগীর হাত।

ববি চোখ খুলল, রাস্তা দেখল। আবার ওরা গাড়ি চালিয়ে চলল। মাথার ওপরের আকাশটা এখন ঘন নীল; আলো কমে আসছে। থোকা থোকা বনের মধ্যে থেকে আলোর দীপ্তি দেখা যাচ্ছে, যেখানে রাজার গ্রামগুলো আগুনে পুড়ছে।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা, নিজেদের তৈরি সুপ্রাচীন সোজা রাস্তার ধারে ধারে, গ্রামগুলিতে বাস করত, আর এখন ওরা মার খাবার অবস্থায় পৌঁছেছে। এই রাস্তাগুলোই এককালে ওদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছিল, বনজঙ্গলের বিজয়ী হিসেবে, যতদিন না জঙ্গলের আবিষ্কারক ভ্রমণকারীরা এসেছিল। গ্রামগুলো ছিল সব

পরস্পরের কাছাকাছি, হাইওয়ে সচরাচর পদযাত্রী ও সাইকেল-আরোহীতে ভরা থাকত। কিন্তু এখন সেই রাস্তা ফাঁকা; আর যে সব গ্রাম ওরা পেরিয়ে এল, সেগুলো সব খালি, মৃত, আগুনে পুড়ে শেষ। যে গ্রামগুলো এখনও জ্বলছে, সেগুলো প্রধান রাস্তা থেকে বেরোনো কাঁচা রাস্তাগুলোর ধারে।

লিভা বলল, “ভাবছি ওরা কম্পাউন্ডও পুড়িয়ে দিয়েছে কিনা।”

কিন্তু আর তো অন্য কোনো যাবার জায়গা নেই।

রাস্তাটা নিচে নামল, জ্বলন্ত গ্রামের দৃশ্য হারিয়ে গেল। এই বসে-যাওয়া জায়গাটায় ঝোপঝাড় যথেষ্ট উঁচু আর কালো। ওরা জঙ্গলে ঢুকল, আর রাস্তাটা একটা সোজা, কালো কাটা টুকরো, জঙ্গলের দুই দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে একবার ওপরে, একবার নিচে দুলাতে দুলাতে এগিয়ে চলেছে, শেষ পর্যন্ত একটা উঁচু দিগন্ত রেখায় পৌঁছে গেল। ববির কজি ব্যথা করছে; মনে হল, চোখ দুটো ভারী হয়ে আসছে। এবং তারপরেই ও একটা সাদা ঝড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বরফের পাতলা ফলকের মতো ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে, প্রজাপতি, সাদা, রাস্তার পীচের ওপর, ঘাসের ওপর, গাছের গুঁড়িতে, বাতাসে, লক্ষ লক্ষ সাদা প্রজাপতি, জঙ্গলের মধ্যে থেকে, পাতলা ডানা ফরফর করে উড়তে উড়তে। এবং ঝড় কিন্তু থামল না। প্রজাপতিগুলো দলে দলে চাকার তলায় পিষে গেল; বনেটের ওপর পড়ে, উত্তপ্ত ধাতুর ওপর পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মরে গেল; সামনের কাচটায় আটকে গেল।

লিভা কাচ পরিষ্কার করার ওয়াশার, ওয়াইপার চালিয়ে দিল।

রাস্তা আবার ওপরে উঠল। প্রজাপতিগুলো হঠাৎ যেমন লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ-ই ওদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। জঙ্গলও শেষ হল। মাথার ওপরের আকাশ এখন সবচেয়ে ঘন নীল। দূরে ছোট শহরটার আশপাশের গ্রামগুলোকে ওরা জ্বলতে দেখল, দ্রুত নেমে আসা পোখুলিতে ওই আগুনগুলোকে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা আলোর রেখা বলে মনে হচ্ছিল।

ববি বলল, “মনে হচ্ছে, আমার কজিটা কিছু হয়েছে।”

“আমি যদি গাড়ি চালাতে পারতাম।”

ববি লিভার স্বরে আতংকের আভাস পেল, অবশ্য ওর কিছুই আসে যায় না। রাস্তা ফাঁকাই পাওয়া যাচ্ছে, যে গ্রামগুলো ওরা পেরিয়ে যাচ্ছে, সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাদা-মাটি আর ঘাসের কুঁড়েঘরগুলো এখন সব ধ্বংস হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ওগুলো ঝোপ-ঝাড়ের অঙ্গ; ঢেউ-তোলা টিনগুলোও ধ্বংসস্তুপ। এখানে সেখানে স্ত্রীলোকেরা আর বাচ্চা ওই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ফিরে এসেছে, রাজার উপজাতির মেয়েদের মতোই এরা হুটপুট, গোলগাল, ওদের এডওয়ার্ডের আমলের পোশাক পরে থাকতে মনে হচ্ছে সাজগোজ করে রয়েছে। গাড়ি আপনা থেকেই চলছে; আর ববি শুধু গাড়ির হেডলাইটটাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে করতে, দেখে মোটেই অবাক হল না যে, ওই সব শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘামে-ভেজা চকচকে মুখ নিয়ে স্ত্রীলোকেরা যেখানে থাকবার সেখানেই রয়েছে; অথবা শহরের ঠিক বাইরে

ছোট শিল্পনগরীতে এখনও বিদ্যুৎ আর আলোকোজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের বোর্ডগুলো রয়েছে; অথবা একসময় যেখানে উঁচু দু'প্রস্থ দেওয়ালের পেছনে রাজার প্রাসাদে মৃদু আলো জ্বলত, সেখানে এখন অন্ধকার।

দেওয়াল ভেঙে ফেলেছে; ভেতরে ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। লরি, সৈন্য, অগ্নিকুণ্ড। ওই প্রাচীন জায়গায়, একশ বছরেরও কম সময় আগে, প্রথম পর্যটক ভ্রমণকারীরা জঙ্গলের বাইরের পৃথিবীর খবর নিয়ে এসেছিল। আর এখন, এই জায়গা তার প্রথম ধ্বংসলীলা দেখল, একটা রাজপ্রাসাদ, যার বেশির ভাগটাই তৈরি হয়েছিল ১৯২০ সালে, প্রথম রাজপ্রাসাদ, যা নলখাগড়া আর ঘাস দিয়ে বানানো নয়, এমন জিনিস দিয়ে বানানো, যা সহজে নষ্ট হয় না।

রাজপ্রাসাদ আর ঔপনিবেশিক শহরটার মাঝখানে, একটা খোলা, অনির্ণীত জায়গা পড়ে রয়েছে; যাত্রীদের জন্যে সরাইখানা, আবর্জনার স্তুপ, পশুচারণ ক্ষেত্র, বাজার, বুপড়ি-শহর। সামান্য কিছু আলো সেখানে জ্বলছে। পাইকারী বিক্রির গুদাম, পথনির্দেশের আলো; রাস্তার চিহ্নগুলো জটিল হয়ে গেছে। কোনো কোনো রাস্তার মোড়ে সৈন্যবাহিনীর লরি আর জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বা ববির গাড়ির হেডলাইটে একটা সৈন্যের সবুজ টুপি আর আলো-ঝলকানো মুখ চোখে পড়ছে। কিন্তু কোনো হাত ববিকে থামতে বলল না। প্রধান রাস্তাটায়, যেখানে প্রায় আধ-ডজন তিনচারতলা কংক্রিটের বাড়ি উঠেছে, ভারতীয়-ইংরেজ আদি বসবাসকারীদের বানানো পুরোনো পথ-প্রদর্শনকারী কাঠের বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে, সেখানে বেশ কিছু ভারতীয়দের আসবাবপত্রের দোকান লুঠ হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ দোকানই সম্পূর্ণ বন্ধ আর আস্ত আছে।

প্রধান রাস্তার পরে, শহরটা আবার খোলামেলা; একটা পার্ক, প্রধান বসবাসের এলাকার ছড়ানো-ছিটানো আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে; চার রাস্তার মোড়ে একটা বৃত্তাকার জায়গা, সেখানে সৈন্যরা রয়েছে; তারপর একদম সোজা, আবার শহরের বাইরে চলে যাওয়া, আবার অন্ধকারে চলে যাওয়া, দীপ্তিময় আকাশের দিকে, আরেকটা বর্ণনাভীত আফ্রিকান এক্সপো, বাড়ি, কুঁড়ে ঘর, রাস্তার ধারে কলের পাইপ, মোটর গাড়ি সারানোর গ্যারেজ, জরাজীর্ণ লরি, দোকান, স্টল, পেছন-উঠানের সজি-বাগান, একেবারে কম্পাউন্ড পর্যন্ত চলে গেছে। সচরাচর এই রাস্তাটা ব্যস্ত থাকে, আর সন্ধ্যার এই সময়টাতে মাতালদের আর গভীর জঙ্গল থেকে আসা আফ্রিকানদের যারা মোটর গাড়ির গতি সঠিকভাবে ঠাহর করতে পারে না, তাদের ভীড়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এখন রাস্তাটা পরিষ্কার। কিন্তু রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো, বৃষ্টির পরে গর্ত গর্ত হয়ে গেছে আর পিচ গলে একজায়গায় জড়ো হয়ে আবার শক্ত হয়ে উঁচু উঁচু টিবিবির মতো হওয়াতে গাড়ি ঝাঁকুনি খাচ্ছে। প্রতিটি ঝাঁকুনি ববিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

গাছপালা রাস্তা থেকে কম্পাউন্ডকে আড়াল করে রেখেছে। অল্প খানিকটা গাড়ি চালানোর পরেই, দুটো মৃদু আলোর গোলবাতি লোহার গেটের থামের ওপরে

জ্বলছে। গेट বন্ধ; লালসাদা কাঠের আগড়টা নামানো। ববি গাড়ি থামাল। ওর মুখের এক ইঞ্চির মধ্যে একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠল, আর সেই ঔজ্জ্বল্যের বাইরে ববি, লরি আর সৈন্যদের দেখতে পেল।

টর্চলাইটটা সামনের কাচের ওপর পড়ল, সেখানে এখন হলুদে-সাদা মরা প্রজাপতি গাদা হয়ে পড়ে আছে আর কাচের ভেতরের দিকে আটকানো কম্পাউন্ড-পাসটাকে ঢেকে দিয়েছে।

“বস্ওয়া এং বেভেনি, মঁসিয়ে, মাদাম,”

ও হচ্ছে কম্পাউন্ডেরই একজন রক্ষী, ওর যেটা বৈশিষ্ট্য এবং গর্ব, সেই প্রাদেশিক ভাষায় হাসিমুখে ওদের স্বাগত জানাল। ও কিন্তু রাজার উপজাতি নয়, রাষ্ট্রপতির উপজাতিও নয়; ও অন্য একটা দেশ থেকে এসেছে; কালেক্টরেটে ও হচ্ছে একজন নিরপেক্ষ, একজন দর্শক আর যে কম্পাউন্ডের ও নিরাপত্তা রক্ষী, তার মতোই ও নিজেও নিরাপদ।

কম্পাউন্ড নিরাপদ। সৈন্যরা এখানে রয়েছে ওদের রক্ষা করার জন্যে। কাঠের আগড়টা উঠে গেল, আর রক্ষী, তার পুরনো ফ্যাশানের লাল-নীল পোশাক পরা, গेटটা খুলতে দৌড়ে গেল, মনে হচ্ছে চেয়ে থাকা সৈন্যদের কর্তব্যপরায়ণতা দেখানোর জন্যে আর যে প্রভুদের ও সেবা করে, তাদের অধিকার দেখানোর জন্যে। ও অর্ধেকটা গेट ধাক্কা দিয়ে ভেতর দিকে খুলল আর ধরে দাঁড়িয়ে রইল; গাড়িটা যখন ওর পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকছে, ও তখন স্যালুট করল; তারপর আবার দৌড়ে দৌড়ে গेटটা বন্ধ করল।

মস্ত বড় কম্পাউন্ডের রাস্তার মানচিত্রটা আলোকিত। নিখুঁতভাবে নাম লেখা রাস্তাগুলো, কম্পাউন্ডের গাছপালা শোভিত সুন্দর নিসর্গ-দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে কৃত্রিমভাবে এঁকে বেঁকে চলেছে, সেগুলোও আলোকিত। উজ্জ্বল, দ্যুতিময়, সাদা আলো, ঝোপের বেড়া আর বাগানে পড়েছে ঝাংলো আর ফ্ল্যাটগুলোর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো গাছের ছালের কাপড় আর খড়-দিয়ে-বোনা কারুকাজ দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকান চিত্র, বই-এর আলমারি, দেখা যাচ্ছে। ছোট ক্লাব-ঘরটায় ভীড়।

লিভা বলল, “তোমার কজিটা এখন কেমন?”

ববি জবাব দিল না। লিভার কণ্ঠস্বর এখন হালকা, চটপটে; ববি বুঝতে পারল, ওর আতঙ্ক কেটে গেছে। কম্পাউন্ডটা হচ্ছে ওর জায়গা; আর তার জন্যে ওর কাছে খবর আছে।

রাতভর ববির মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল; ওর গাড়ি চালানোর আর রাস্তার বিশৃংখল বিপদ-আপদের মধ্যে থেকে ও ব্যাভেজের নিরাপত্তা আর আরামের মধ্যে ফিরে আসছিল। আকাশ যখন ফর্সা হয়ে আসছে, ও ওর ঘরের কাজ করার ছেলে

লিউক-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কাজের লোকের কোয়ার্টার থেকে ভেসে আসা রেডিও-র শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছিল। তারপরে আবার পাশের ঘরে লিউক-এর চটপটে খালি পায়ের শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। পায়ের শব্দটার মধ্যে অপরাধ-বোধ রয়েছে; আর লিউক যখন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল, ওর ছোট-হয়ে-যাওয়া খাকি ট্রাউজার্স ওর কুঁচকির কাছে আঁট হয়ে আছে আর ওর গোড়ালির ওপরে উঠে আছে, ববি ওর মার্জিত পা ফেলা আর কোঁচকানো সাদা জামা দেখে বুঝতে পারল যে, লিউক রাতে মদ খেয়েছিল আর ওই জামা প্যান্ট পরেই ঘুমিয়েছিল।

লিউক পর্দা সরিয়ে দিল আর ওর ভারী, মাতাল গলায় বলল, “সকালে নীল পোশাক বাগানে বেরিয়েছে।” এটা ওদের দুজনের নিজস্ব ব্যক্তিগত রসিকতা, এই কম্পাউন্ডের একজনের স্ত্রী-র সম্বন্ধে, যিনি আমেরিকান আর নতুন এসেছেন, আর গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওই একই নীল পোশাক পরছেন।

তারপরই লিউক ঘুরে দাঁড়িয়ে ববিকে দেখল। ও যেখানে ছিল, সেখানেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে। লিউক রাজার উপজাতির লোক আর কাছাকাছি একটা গ্রাম থেকে এখানে এসেছে। ও রাষ্ট্রপতির সৈন্যবাহিনীর হালচাল জানে। ওর লাল চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে; ওর নাকের পাটা ফোলা আর ওর লম্বাটে, পাতলা মুখটা কাঁপছে। ও নাক টানল; ওর চাপা ঠোঁট দুটো খুলে গেল। নাকে একটা ঘোঁৎ শব্দ করে আর ওর ডান পা দিয়ে মেঝেয় দ্রুত কয়েকটা আঘাত করে, ও হাসতে শুরু করল।

পরে, চটপটে হাতেই, কিন্তু এখন মোটেই মার্জিত ভঙ্গীতে নয়, ও ববির ছাড়া কাপড়চোপড়গুলো তুলে নিল; ওর নড়াচড়া এখন এমন খোঁস, ও ঘরে একা, আর কেউ ওকে দেখছেন না।

ববি ভাবছিল; আমাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কম্পাউন্ড তো নিরাপদ; সৈন্যরা গেট পাহারা দিচ্ছে। ববি ভাবছিল; লিউককে ভাড়াতে হবে।

উপসংহার, একটি সাময়িক পত্রিকা থেকে

লাক্সর-এ সার্কাস

এ বার আমি উড়োজাহাজে করে ইজিপ্ট যাচ্ছিলাম এবং মিলানে এসে ভ্রমণ-সূচিতে বিরতি দিলাম। ব্যবসায়িক কারণেই এটা করতে হল। কিন্তু সেটা ছিল ত্রিসন্মাস সপ্তাহ, ব্যবসা বাণিজ্যের সময় নয়, আর আমাকে তাই ছুটির দিনগুলোয় মিলানে থাকতে হল। আবহাওয়া ছিল খারাপ, হোটেল ছিল ফাঁকা ও নিরানন্দ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায়, একটা রেষ্টুরা-তে রাতের খাওয়া সাজ করে বৃষ্টির মধ্যে হোটেল ফিরছি, দেখি দু'জন চিনা ভদ্রলোক, ঘননীল স্যুট পরে হোটেলের খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সহ-এশিয়াবাসী, আমরা তিনজন, আমি ভাবলাম, শিল্প সমৃদ্ধ ইউরোপে ভ্রমণকারী। কিন্তু ওরা আমার দিকে তাকাল না। ওদের আরো সঙ্গী আছে; খাবার ঘর থেকে আরো তিনজন চিনা বেরিয়ে এল, স্যুট পরা দুটি যুবক আর ফুল-ফুল ছাপ টিউনিক আর শ্যাকস্ পরা তাজা চেহারার একটি যুবতী। তারপর আরো পাঁচজন চিনা বেরিয়ে এল, স্বাস্থ্যবান তরুণ, যুবক-যুবতী; তারপর প্রায় একদজন। তারপর আর গুণতে পারলাম না। খাবার ঘর থেকে চিনারা পিল পিল করে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই, চওড়া কার্পেট-মোড়া হোটেল লবিটা ভরে গেল। তারপর ওরা ধীর, মৃদু স্বরে কথাবার্তা বলতে বলতে সবাই মিলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

অন্তত একশজন চিনা তো হবেই। বেশ কয়েক মিনিট পরে লবিটা খালি হল। হোটেলের ওয়েটাররা, পরিবেশন করার ন্যাপকিন হাতে নিয়ে খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে পুরো ব্যাপারটা দেখছিল। খাবার ঘর থেকে আরো দু'জন চিনা বেরিয়ে এল; এরাই শেষ। এরা দুজনেই বেঁটে, বয়স্ক লোক, গায়ের চামড়া শুকনো কোঁচকানো, চোখে চশমা। ওদের মধ্যে একজনের ছোট্ট হাতে একটা মোটা মানিব্যাগ, এমন অপ্রতিভ ভাবে ধরে আছে, যেন এই দায়িত্বটা ওকে নার্ভাস করে দিয়েছে। ওয়েটাররা সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোনো রকম কায়দা দেখানোর চেষ্টা না করে, আর, ইটালিয়ান নোট-এর ব্যাপারে একটু হতবুদ্ধি ভাব দেখিয়ে, মানিব্যাগ হাতে বয়স্ক চিনা ভদ্রলোক ওদের বখশিশ দিলেন, ধন্যবাদ দিলেন আর প্রত্যেক ওয়েটারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর দুই চিনা ভদ্রলোকই ঝুঁকে অভিবাদন করে লিফটে উঠে গেলেন। আর হোটেলের লবিটা একদম নিঃসঙ্গ হয়ে গেল।

“এরা হচ্ছে সার্কাস,” কালো স্যুট পরা ডেস্ক-কেরানীটা বলল। ওয়েটারদের মতো ও-ও বিস্মিত হয়ে গেছিল। “ভেঙ্গোনো দাল্লা সিনা রোসা। ওরা লাল চিন থেকে এসেছে।”

মিলানকে বরফের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি মিলান ছাড়লাম। কায়রো-তে এলাম। আমার হোটেলের পেছনের পরিত্যক্ত কানাগলিতে নোংরা জোব্বা-পরা বাচ্চাগুলো, সারাদিন রমজানের উপোস করে কাহিল হয়েও সাদা, গরম ধুলোর মধ্যে ফুটবল খেলছে। আগে যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়েও নোংরা কাফেগুলোতে স্যুট পরা গ্রিক আর লেবানীজ ব্যবসায়ীরা স্থানীয় ফরাসি আর ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে, আর রোডেশিয়ান তামাকের ব্যবসা নিয়ে গোমড়া মুখে উত্তেজিত কথাবার্তা বলছে, কারণ ওই ব্যবসাটা বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। মিউজিয়ামে এখনও ইজিপ্শিয়ান গাইডগুলো ঘোরাফেরা করে, ওদের জ্ঞানও সীমিত, দেশি জ্ঞান। আর নীল নদের ওপারে একটা নতুন হোটেল হয়েছে, হিলটন হোটেল।

কিন্তু ইজিপ্টেরও বিপ্লব ছিল। রাস্তার চিহ্নগুলো এখন কেবল আরবি ভাষায় লেখা; সিগারেটের দোকানগুলোতে যদি ইজিপ্সিয়ান সিগারেট চাওয়া হয়, তাহলে দোকানদাররা দারুণ রেগে যায়, অপমানিত বোধ করে। আর রেলস্টেশনে, আমি যখন দক্ষিণে যাবার ট্রেন ধরতে গেলাম, তখন বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধও হয়েছিল, তার স্মরণিকা আমি পেয়ে গেলাম। সিনাই থেকে যুদ্ধশেষে ফিরে আসা, রোদে পোড়া সৈন্যগুলো ওয়েটিং রুমের মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। এই সব চোখ-মুখ বসে-যাওয়া মানুষগুলোই এই দেশের ভূমি ও বিপ্লবের অধিকারিক ছিল। কিন্তু সাধারণ ইজিপ্শিয়ানদের কাছে, এরা শুধু সাধারণ সৈন্য, দুঃখী, অবমাননার বস্তু আর এই মানসিকতাটা বিপ্লব টিপ্লবের চাইতেও পুরোনো, ওদের মজ্জায় গেঁথে আছে।

সারাদিন, ট্রেনের জানালা দিয়ে চাষের জমিই চোখে পড়ল। কাদা জলের নদী, সবুজ প্রান্তর, মরুভূমি, কালো কর্দম, ধুলোর রঙের জরাজীর্ণ শহরগুলো, ভূগোল বইয়ে যেমন দেখানো হয়, তেমন ইজিপ্ট। ধোঁয়াটে আকাশে সূর্য অস্ত গেল; দেশটা কেমন যেন প্রাচীন মনে হল। যখন লাক্সর-এ ট্রেন থেকে নামলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ওইদিন সন্ধ্যাবেলায়, পরে আমি কার্নাক-এর মন্দিরে গেলাম। প্রথমবার এটা দেখার জন্যে ব্যাপারটা ভালোই হল, কারণ এখন অন্ধকার, আর ইজিপ্টের দুঃখ দুর্দশার থেকে এটা ভিন্ন মাত্রার। ওই সব মাত্রাছাড়া স্তম্ভগুলো, প্রাচীন কালের প্রাচীনতম জিনিস, নীল নদের উপত্যকার লোকেদের নিজস্ব সৃষ্টি।

সেই বছর, ইজিপ্টে কোনো মুদ্রা পাওয়া যেত না, শুধু কাগজের নোট। সমস্ত বিদেশি টাকার খুব চাহিদা। আর লাক্সর, ইদানিং-কার রাজসিক দিনগুলোতে

শীতকালীন পর্যটন আবাস হিসেবে যথেষ্ট সমাদৃত, এখন সাধারণ পর্যটকদের আহ্বান জানাচ্ছে। পুরোনো উইন্টার প্যালেস হোটেলে, যেখানে মোটা-সোটা নিখোঁ পরিচারকগুলো সাদা গাউন পরে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাকে বলল যে, ওরা আমাকে সেই ঘরটা দিচ্ছে, যেটা আগা খানকে দেওয়া হত। ঘরটা বিশাল, পুরোনো স্টাইলে চোখ জুড়ানো, কিন্তু অতিরিক্ত আসবাব ঠাসা। ঘরটায় একটা বারান্দা আছে, সেখান থেকে নীল নদের আর নদের ওপারের নিচু নিচু মরুপাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়।

ওই পাহাড়গুলোতেই সমাধিস্থলগুলো রয়েছে। সবই রাজাদের নয়, বা সবই পবিত্র নয়। প্রাচীন শিল্পী, সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনকে ধরে রাখবার জন্যে, কখনও কখনও সেই জীবনের আনন্দগুলোকে, সুখগুলোকে মুক্ত হাতে ধরে রেখেছেন, নদীবক্ষের আনন্দ, মাছ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন, নকশায় ঐকে মহিমাশিত্ব করেছেন। এই সব জিনিস যাঁরা করেছেন, তাঁরা বিশেষ দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ, যাঁরা অন্য কোনো ভূমি জানতেন না, আর ওঁদের যা ছিল, তাকেই অত্যন্ত মহার্ঘ ও সম্পূর্ণরূপে জেনেছিলেন। কর্দমাক্ত নীল নদীর জল, চিত্রে প্রতিভাত হয়েছে শুধু জল হিসেবে, একটা নীল-সবুজ ভি-আকারের ফিতে, চেনা যায়, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে, একটা পরীর দেশের নদী।

সমাধিস্থলগুলোর ভিতরে খুব গরম হতে পারে। গাইড লোকটা, যে আবার মাঝে মাঝে রক্ষীর কাজও করে, ঝুঁকে আরবি ভাষায় বকবক করে যাচ্ছে, ওর কাগজের মুদ্রা প্যাসপোর্টে কামাচ্ছে, দেবী হাথোর-এর প্রত্যেকটা প্রতীক চিহ্ন দেখাচ্ছে, ওর নোংরা আঙুলটা ছবির ওপর ঘষছে যে ছবিটা ওর সুরক্ষা করা দরকার। বাইরে, অন্ধকার এবং অতীতের উজ্জল দৃশ্যাবলীর পর, শুধু ধু ধু ধু করা সাদা বালি ছড়িয়ে আছে, সূর্যালোক খর্ব হয়ে আছে আর কখনো কখনো জোববা পরা ভিথিরি ছেঁচগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

আমার কাছে এই ছেঁচগুলো, যখনই কোনো লোক আসছে, সঙ্গে সঙ্গে পাথর আর বালির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে, এক ধরনের বালির জন্তু। কিন্তু আমার ড্রাইভার ওদের মধ্যে কয়েকজনকে নাম ধরে চেনে; ও যখন ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন ওর ভঙ্গীটা ছিল কেমন অলস, ঢিলাঢালা আর সেই ভঙ্গীর মধ্যে যেন হাত নাড়িয়ে আহ্বানও ছিল। এই ড্রাইভারটি এই মরুভূমিরই ছোকরা আর সন্দেহ নেই, অতীতে কখনও ও-ও ওদের মতো জোববা পরা ছেঁচ ছিল। কিন্তু ও বেড়ে উঠেছে অন্যভাবে। ও ট্রাউজার্স পরে, জামা পরে, আর নিজের সুন্দর চেহারা সম্বন্ধে সচেতন। ও বিশ্বস্ত, সঠিক, মরুভূমির অন্যান্য গাইডের মতো উন্মাদনা ওর নেই। এই মরুভূমিতে ও কোনোভাবে একঘেয়েমির বিরক্তির শিকার হয়েছে। ও কায়রোর কথা আর একটা ভালো চাকরির কথা ভাবে। এই সব পুরাতত্ত্ব, পর্যটক এবং ভ্রমণ-সৃষ্টি ঘেঁটে ঘেঁটে ও বিরক্ত হয়ে গেছে।

আমি সেদিন সারাটা দিন মরুভূমিতে কাটাছিলাম আর তখন দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ছিল উইন্টার প্যালেস হোটেলের লাঞ্চ-

বাক্স, আর আমি মরুভূমিতে কোথাও যেন নতুন সরকারি অতিথি-নিবাসটা দেখেছিলাম, যেখানে পর্যটকরা টেবিল-চেয়ারে বসে নিজেদের আনা স্যান্ডউইচ আর ওখান থেকে কেনা কফি খেতে পারেন। ভেবেছিলাম, ড্রাইভার বুঝি আমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা একটা অপরিচিত পথ ধরে একটা ছোট মরুদ্যানের গিয়ে হাজির হলাম, যেখানে পামগাছ আর একটা বড় শুকনো কাঠের তৈরি কুটির রয়েছে। আশপাশে, কোনো মোটর গাড়ি, মিনিবাস, পর্যটক, কিছু নেই, শুধু মোটা জামাকাপড় পরা ইজিপ্শিয়ান খাদ্য পরিবেশনকারীরা উদ্ভিন্ন মুখে ঘোরাফেরা করছে। আমি ওখানে থাকতে চাইলাম না। ড্রাইভার একটু তর্ক করল, কিন্তু ও-ও বিরক্ত বোধ করছিল। ও নতুন অতিথি নিবাসে গাড়ি চালিয়ে চলে এল, আমাকে নামিয়ে দিল, আর বলল যে, ও পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

অতিথি-নিবাসে ভীড় ছিল। রোদ-চশমা পরা পর্যটকরা, তাদের কার্ডবোর্ড বাক্সে ভরা লাঞ্চ-প্যাকেট ঘাঁটছে আর নানরকম ইউরোপিয়ান ভাষায় কথাবার্তা বলছে। আমি দুজন অল্পবয়েসি, জার্মান এর সঙ্গে চতুরে একটা টেবিলে বসলাম। একজন চটপটে মধ্যবয়েসি ইজিপ্শিয়ান আরবদের পোষাক পরে টেবিলে টেবিলে ঘুরে কফি পরিবেশন করছিল। ওর কোমরে গাঁজা ছিল উটকে মারার একটা চাবুক, আর আমি দেখলাম, খুব ধীরে ধীরেই দেখলাম যে, অতিথি-নিবাসের চারপাশে বালির টিবিগুলো ছোট ছোট মরুভূমির শিশুদের ভীড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মরুভূমি পরিচ্ছন্ন, বাতাসও খুব পরিষ্কার; এই শিশুগুলো কিন্তু অত্যন্ত নোংরা।

অতিথি-নিবাস ওদের নাগালের বাইরে। যখন ওরা একটা স্যান্ডউইচ বা একটা আপেলের লোভে কাছাকাছি আসছে, উটের চাবুক-ওয়ালা লোকটা একটা প্রচণ্ড ভয়-পাওয়ানো চিৎকার করছে। কখনও বা দৌড়ে ওদের কাছে চলে যাচ্ছে, ওর চাবুকটা দিয়ে বালির ওপর মারছে আর বাচ্চাগুলো ছিটকে পালাচ্ছে, ওদের দোলায়মান জোব্বার তলায় ওদের ছোট ছোট বালি-মাখা রোগা পাগুলো ভীত, সন্ত্রস্ত। যে পর্যটক খাবারটা দিতে গিয়েছিল, তাকে কিন্তু কিছু বলা বা তিরস্কার করা হচ্ছে না; এটা একটা ইজিপ্শিয়ান নিয়মে ইজিপ্শিয়ান খেলা।

এতে কিন্তু বিশেষ কোনো গুণগোল হচ্ছে না। আমার টেবিলের ছোকরা জার্মান দুটো এদিকে মনই দিচ্ছে না। অতিথি-নিবাসের ভেতরে, কাচের ওপাশে, ইংরেজ ছাত্রগুলো কার্টার ও লর্ড কার্নারডন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতামূলক কথাবার্তা বলছে। কিন্তু চতুরে বসা মধ্যবয়েসি ইটালিয়ানদের দলটা, ওরা নিয়মটাকে নিজেরা যেমন ভেবেছে, তেমনিভাবে খেলা শুরু করল। ওরা আপেল ছুড়ে ছুড়ে ফেলল আর বাচ্চাগুলোকে অনেক দূরে দৌড়ে যেতে হল। পরীক্ষা করার জন্যে, ওরা স্যান্ডউইচগুলোকে ছিঁড়ে টুকরোগুলো বালির ওপর ছুড়ে ফেলতে লাগল। আর এমনভাবে ফেলল, যাতে বাচ্চাগুলো খুব কাছে চলে আসতে বাধ্য হয়। খুব শিগগিরই ইটালিয়ানদের চারপাশেই খেল শুরু হয়ে গেল, আর উটের চাবুক-ওয়ালা লোকটা, ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে ওকে কী করতে হবে, খুব তেজের সঙ্গে চতুরের

শেষ প্রান্তে টহল দিতে লাগল, চিৎকার করে, বালির ওপর চাবুক হাঁকড়ে ও-ও কিছু কাগজের প্যাসত্রে কামিয়ে নিতে লাগল।

হাল্কা উজ্জল লাল জার্সি পরা একজন লম্বা ইটালিয়ান দাঁড়িয়ে উঠে ক্যামেরা বার করল। ও চতুরের ঠিক নিচে খাবার সাজিয়ে রাখল, আর বাচ্চাগুলো দৌড়ে এল। আর ঠিক এই সময়েই, যেন ক্যামেরায় ছবিতোলাটা বাস্তবানুগ হয়, উট-মারার চাবুকটা বালির ওপর না পড়ে সরাসরি ওদের পিঠের ওপর পড়ল, তার সঙ্গে আরো জোরে, আরো দ্রুত উটকে ভয়-খাওয়ানো চিৎকার। অথচ তা সত্ত্বেও, অতিথি নিবাসের পর্যটকদের মধ্যে কিংবা গাড়ি, মিনিবাস ইত্যাদির পাশে দাঁড়ানো ইজিপ্শিয়ান ড্রাইভারদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু চাবুক-হাঁকড়ানো লোকটা আর বালির মধ্যে হাতড়ানো বাচ্চাগুলোই থচও হুড়োহুড়ি করছে। ইটালিয়ানরা একদম চুপচাপ, শান্ত। লাল জার্সি পরা লোকটা আরেকটা স্যান্ডউইচের প্যাকেট খুলছে। একটা বেঁটে আর বয়স্ক সাদা স্যুট-পরা লোক দাঁড়িয়ে উঠে নিজের ক্যামেরাটা ঠিক করতে লাগল। আরো খাবার বাইরে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে; উটের চাবুক ক্রমাগত পিঠে পড়ছে; চাবুকওয়ালার চিৎকার এখন ঘোঁত ঘোঁতের অনুরনন তুলছে।

তবু, আমার টেবিলের জার্মানদের হুঁশ নেই; ভেতরের ছাত্রগুলো কথা বলেই চলেছে। আমি দেখলাম, আমার হাত কাঁপছে। স্যান্ডউইচটা খেতে খেতে টেবিলের ওপর রাখলাম; এটা আমার শেষ সিদ্ধান্ত। আমি যখন চাবুক-ওয়ালার লোকটার প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছি তখন আমার স্বচ্ছ চেতনা আর উদ্বেগ, দুটোই ফিরে এল। আমি চিৎকার করছিলাম। আমি ওর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে বালির ওপর ছুড়ে ফেললাম। ও অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটু অব্যাহতিও যেন পেল। আমি বললাম, “আমি কায়রো-তে এই ব্যাপারটা জানাব।” ও ভয় পেয়ে গেল; আরবি ভাষায় আমার কাছে অনুন্নয় করতে লাগল। বাচ্চাগুলো হতভম্ব হয়ে গেছে; ওরা দৌড়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। জার্সি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগল, কী হয়। ইটালিয়ান দুজন, ক্যামেরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওদের রোদ চশমার আড়ালে বেশ শান্তশিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দলের স্ত্রীলোকগুলো নিজেদের চেয়ারে হেলান দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল।

আমার নিজেকে কেমন যেন ব্যর্থ, ধরা পড়ে যাওয়ার মতো মনে হল আর নিজের টেবিলে ফিরে যেতে চাইলাম। টেবিলে ফিরে এসে, আমার স্যান্ডউইচ তুলে নিলাম। ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটে গেল, আর কোথাও কোনো গণ্ডগোলও হয়নি। জার্মান দুজন বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি এখন ওদের সম্পর্কে উদাসীন, যেমন উদাসীন ওই রক্তলাল জার্সি-পরা ইটালিয়ানটার সম্পর্কেও। ইটালিয়ান স্ত্রীলোকগুলো উঠে দাঁড়াল, দলটা চলে যাচ্ছে; লাল জার্সি জাঁক করে লাঞ্চ-বাক্স ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্যান্ডউইচ-জড়ানো কাগজগুলো বালির ওপর ফেলছে।

বাচ্চাগুলো যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। যার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়েছিলাম, সেই লোকটা আমার জন্যে কফি নিয়ে এল আর আবার আরবি ও ইংরেজি ভাষায় অনুনয় বিনয় করতে লাগল কফির জন্যে পয়সা দিতে হবে না, ওটা ওর আমাকে উপহার। কিন্তু যতক্ষণ ও আমার সঙ্গে কথা বলছে, বাচ্চাগুলো আবার কাছে আসতে শুরু করল। শিগগিরই ওরা আরো কাছে চলে আসবে আর বালি ঘেঁটে ঘেঁটে ইটালিয়ানরা কী ছুড়ে ফেলল, খুঁজতে থাকবে।

ওটা আমি দেখতে চাই না। ড্রাইভার অপেক্ষা করছে, গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি। যা কিছু ঘটে গেল, ও সব দেখেছে। মরুভূমির একটা শৃঙ্খলমুক্ত ছেলে, ট্রাউজার, বেন্ট আর খেলোয়াড়ি জামা-পরা, কায়রো সম্বন্ধে আগ্রহী, তার কাছ থেকে আমি কোনো ভঙ্গী, কোনো অনুমোদন-সুলভ সঙ্কেত আশা করছিলাম। ও আমার দিকে চেয়ে ওর চওড়া মুখের দুই কোণায়, ওর সরু চোখের তারায়, হাসল। ও বালির ওপর ওর সিগারেটটা ফেলে ঘসে নিভিয়ে দিয়ে আশু আশু ঠোট ফাঁক করে ধোঁয়া ছাড়ল; তারপর শ্বাস ফেলল। ওটাই ওর ধূমপানের কায়দা। ও কী ভাবছে, আমি বুঝতে পারলাম না। ও আগের মতোই সঠিক আর আগের মতোই একঘেয়েমির বিরক্তি ওর মুখে-চোখে।

সেদিন বিকেলে আমি যেখানে যেখানে গেলাম, ওই ইটালিয়ান দলটার শূটিং-সবুজ তত্ত্বাওয়াগন মিনিবাসটা চোখে পড়ল। সর্বত্রই আমি ওই রক্ত-লাল জার্সিপরা লোকটাকে দেখলাম। ওর লটর-পটর করে মাতালের মতো, ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটা, ওর চুল-কমে-আসা মাথা, আর হাঁটার সময় ওর হাতের ছোট, শক্ত, ঝাঁকুনি, সব আমার চেনা হয়ে গেল। ফেরিঘাটে এসে ভাবলাম, ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল, কিন্তু মিনিবাসটা ঠিক এসে গেল, ইটালিয়ানরা বেরিয়ে এল। ভাবলাম লাক্সর-এর পাড়ে নিশ্চয়ই আলাদা হয়ে যাব, কিন্তু নয়! ওরাও উইন্টার প্যালেস হোটেলেই উঠেছে। রক্ত-লাল জার্সি আত্মবিশ্বাসের সাথে লবিতে ঝুঁকে অভিবাদন-করা পরিচারকদের মধ্যে দিয়ে, বারের মধ্যে দিয়ে, তাজা ফুল আর জটিলভাবে ভাঁজ করা ন্যাপকিন দিয়ে সাজানো সুন্দর খাবার ঘরের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। ইজিপ্টে সে বছর শুধু কাগজের টাকা।

লাক্সর-এর পাড়ে আরও এক কি দুদিন থাকলাম। কর্তব্যের খাতিরে আমি চাঁদের আলোয় কার্নাক দেখলাম। আবার যখন মরুভূমিতে ফিরে গেলাম, অতিথি নিবাসটা এড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ড্রাইভার বুঝতে পারল। যখন সময় হল ও আমাকে সেই পাম গাছ ঘেরা কাঠের বাড়িটায় নিয়ে গেল, ওর যে জিং হয়েছে, সেটা বুঝতে দিল না। সেদিন ওদের ব্যবসা ভালো চলছিল। চারটে কি পাঁচটা মিনিবাস দাঁড় করানো ছিল। ভেতরে, বাড়িটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলো টেবিল একসাথে লাগানো হয়েছে আর এই বিশাল খাবার টেবিলে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন চিনা, পুরুষ এবং মহিলা বসে মৃদু স্বরে কথাবার্তা বলছে। মিলান-এ যে সার্কাস আমি দেখেছিলাম, এরা সেই দলেরই একটা অংশ।

লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে বয়স্ক চিনা দুজন বসেছিল। পাশে বসেছিল একজন ছোটখাটো সুন্দরী মহিলা, একজন দক্ষ খেলোয়াড়োচিত চেহারা, কিন্তু বয়েসটা বেশি। মিলানের ভীড়ে আমি একে লক্ষ করিনি। আবার, দাম মিটিয়ে দেবার সময় সেই মোটা মানিব্যাগ-ওয়ালা বয়স্ক লোকটি কেমন যেন অপটু, আনাড়িভাবে হাত নাড়াচ্ছিল। মহিলাটি ইজিপ্তীয়ান ওয়েটারকে কিছু বলল। ওয়েটার অন্য ওয়েটারদের ডাকল আর সবাই মিলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। প্রত্যেক ওয়েটারের জন্যে মহিলার ছিল একটি করমর্দন, আর উপহার, টাকা, খামের মধ্যে? একটা কিছু, একটা পদক। জীর্ণ পোশাক পরা ওয়েটারগুলো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, গম্ভীর মুখগুলো ঘোরানো, যেন সৈন্যদের পদক ভূষিত করা হচ্ছে। তারপর সমস্ত চিনারা উঠে দাঁড়াল আর কিচিরমিচির করতে করতে, কোমল হাসিমুখে, ওদের টিলাঢালা, একটু ছড়ানো পদক্ষেপে কুটিরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল। ওরা আমার দিকে তাকাল না, কুটিরটাও মনে হল, লক্ষ করেনি। ওরা মিলানের বৃষ্টির মধ্যেও যেমন ছিল, এখানকার মরুভূমিতেও, তেমনি ঠাণ্ডা, সুন্দর বেশবাস, পুরুষেরা সুট পরা আর মেয়েরা স্ল্যাক্স পরা। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, এমন সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান, কেমন পারস্পরিক সম্পর্কে নীরব সন্তুষ্টি; ওদেরকে পর্যটক, দর্শনকারী হিসাবে ভাবা কষ্টকর।

ওয়েটার, তার নোংরা, ডোরাকাটা জোব্বার ওপরে পদকটা ঝুলিয়ে রেখে দেখাচ্ছে; ওর মুখটা তখনও আনন্দে উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। পদকটা এমন একটা ছাঁচে ঢালাই হয়েছে, যার ধারগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের ছাপটা ঠিকমতো না উঠলেও বোঝা যাচ্ছে যে, ওটা একজন্ম চিনার মুখ আর সন্দেহ নেই, সেই মুখটা নেতার। খামের মধ্যে রয়েছে চিনা পিয়োনিদের সুন্দর সুন্দর রঙিন পোস্টকার্ড ছবি।

পিওনিজ, চায়না। কত রাজ্য এখানে এসেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়, রয়েছে সেই স্মৃতিসৌধ মূর্তি, যার হাঁটুর নিচে সম্রাট হাড্রিয়ান, তাঁর এখানে আসার নিদর্শন হিসাবে, নিজেরই স্মৃতি-পূর্ণ গাথা খোদাই করিয়েছিলেন। নদীর অন্য পারে, উইন্টার প্যালেস হোটেলের কাছেই একটা প্রস্তর খন্ড রয়েছে, যার ওপর বিশিষ্ট রোমান হরফে সাম্রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করা রয়েছে, পালিয়ে যাবার এলাকা হিসাবে নির্দেশিত। এখন আরেকটা, আরো দূরের একটা সাম্রাজ্য নিজেকে ঘোষণা করছে। একটা পদক, একটা পোস্টকার্ড; আর পরিবর্তে যা চাওয়া হচ্ছে তা হল ক্রোধ আর অবিচারের বোধ।

বোধহয় সেটাই ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ সময়, শুরুতে, যখন প্রাচীন শিল্পী, আর কোনো রাজ্যের কথা জানত না, নিজের রাজ্যকেই জানত আর তাকেই সম্পূর্ণরূপে দেখেছিল। কিন্তু কায়রোতে ফিরে এসে, আমার বিদেশি চোখ দিয়ে এখানকার ভূমি

আর সেই ভূমিতে যারা কাজ করে, সেই মানুষদের দেখে, ধুলো-ভরা শহর আর রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে উত্তেজিত কৃষকদের ভীড় দেখে, এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন যে, এখানে এত সরলতা কখনও ছিল। বোধহয় ভূমি সম্বন্ধে সেই দর্শন, যাতে নীল নদ কেবল জল বলে প্রতীয়মান হয়, একটা নীল সবুজ ফিতের মতো, সেটা আসলে সব সময়েই মনগড়া ছিল, একটা আকুল আকাংখার কারণ ছিল, একটা সমাধিস্থলের জন্যেই ছিল।

ট্রেনের কামরার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ঠিকমতো কাজ করছিল না; এর কারণ হতে পারে, দু'জন নিম্নো পরিচারক, এখনও গ্রাম্য অভ্যাস ছাড়তে পারেনি, দরজা খুলে রেখে গল্প করছিল। সারাদিন ধরে বালি আর ধুলো কামরায় ঢুকল। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত অত্যন্ত গরম আর লাল আকাশের পটভূমিতে সব কিছুই কালো মনে হচ্ছিল। কায়রো স্টেশনের মৃদু আলো জ্বলা প্রতীক্ষালয়ে সিনাই থেকে আসা আরও সৈন্য শূয়েছিল, ভারী পশমের পোশাকপরা সব চাষি, ছুটিতে নিজেদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। সতেরো মাস পরে এই লোকেরা, বা এদের মতো লোকেরা মরুভূমিতে সম্পূর্ণ পরাজিত হবে এবং খুব নিচু দিয়ে ওড়া হেলিকপ্টার থেকে তোলা সংবাদ চিত্রে দেখা যাবে, এরা মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার জন্য হেঁটে চলেছে, বালির ওপর ওদের দীর্ঘ ছায়া ফেলে।

আগস্ট ১৯৬৯-অক্টোবর ১৯৭০